জ্যোতিঃপথ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

[পরমার্থতত্ত্বের বিচার ও সাধনপ্রণালী।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

[মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের ঠিকানা।

৫২ নং চক্রবেড় রোড নর্থ ভবানীপুর,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধি
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলি

নিবেদন।

নানা কারণ বশতঃ স্থানে স্থানে, যে দোষ দৃষ্ট হইবে, উহা সুহৃদ্ পাঠকগণ পরিহার করিয়া, ইহার সারভাব গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

মঙ্গল প্রার্থনা।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর! আপনাকে বারংবার প্রণামকরতঃ, আপনারই কৃপা-প্রার্থী হইয়া, আপনার দ্বারে উপস্থিত। আপনি দয়া করিয়া প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আপনার প্রদত্ত প্রার্থনা, আপনার চরণে উপস্থিত করিতে পারি। মাতা-পিতা! আপনাকে ভালবাসিলে জগতের হিত ও আনন্দ। কিন্তু সে ভালবাসার ভাণ্ডার আপনি। আপনার অতিরিক্ত কোথায় কি পাইব, যাহা, আপনার নিকট করিয়া ভাল-বাসা চরিতার্থ হইবে? অথবা হে আত্মা! তোমায় কেমন করিয়া ভালবাসিব? কিংবা কেই বা না, তোমাকে ভালবাসে। তোমাকে ভাল না বাসিলে, ভালবাসার পাত্র ও প্রেমিক কোথায় দাঁড়াইয়া থাকিবে? হে আত্মা! তুমি একমাত্র আছ। তুমি আছ বলিয়াই সকলে আছি ও থাকিব। তুমি দর্শন, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, তথাপি তোমাকে দেখিবার জন্য,লোকে লালায়িত, এবং তোমারই বিরহে কাতর। হে আত্মা, তোমাকে দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না, পাইয়াও পাই না, ভালবাসিতে ইচ্ছা করিলেও ভাল-বাসিতে পারি না এবং ভালবাসিলেই,অপরকেই ভালবাসিয়া থাকি, তথাপি, কেন তোমাকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ? জীবনে কেন তোমাকেই অভাব বোধ হয়? মরণে কেনই বা তোমার আশ্রয়ের অভিলাষী? জগতে কত বন্ধুবান্ধব, কত ঐশ্বর্য্য, কত সুখাস্বাদ, কত মাধুর্য্য, তথাপি, কে ইহাদিগকে চক্ষের আড়াল করাইয়া,

তোমার অভাব জাগাইয়া রাখে? কেমনই বা হতাশ হৃদয়, শূন্য আকাশের দিকে চাহিয়া, আশা বারি সংগ্রহের চেষ্টা পায়? এ সকলই তোমার অনির্ব্বচনীয় মহাশক্তির পরিচয়; এবং তুমি ভালবাস বলিয়াই, আমরা তোমাকে ভালবাসিবার বিষয়ে, সম্পূর্ণ বিরত থাকিতে অক্ষম। তুমি আমাদের বলিয়াই, আমরা তোমার না হইয়া সুখী, হইতে পারি না। তাই তোমাকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেও, ভুলিতে অসমর্থ। তোমাকে নিষ্প্রয়োজন ভাবিতে গিয়া, প্রয়োজনের মূলে আনিয়া ফেলি। তোমাকে নাস্তি ভাবিবার চেষ্টায় একমাত্র অস্তিত্ব বলিয়া বুঝিয়া লই। হে তপন! তোমার তাপই সর্ব্বপ্রকার আস্বাদ, এজন্য, ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদের মধ্যে, তোমাকেই উঁকি পাড়িতে দেখি। তুমিই ভাবময় বলিয়া সর্ব্বভাবই তোমাকে ভাবনা করিতে বলে। হে আত্মা! কি ইচ্ছায়, কি অনিচ্ছায়, তোমাকেই ভালবাসি। চাই বুঝি আর না বুঝি, চাই তোমাকেই। তোমাকে আপনার মনে করিলেও আপন, আর পর মনে করিলেও আপন হইয়াই আছ। তুমি ত্যাগ গ্রহণের বাহিরে থাকিয়া, আপন হইতেও আপনার। এবং সকলকেই গ্রহণ করিয়া, সকলেরই গ্রহণীয়রূপে বিরাজমান। হে আত্মা, তোমাকে কখন মাতা, কখন পিতা, কখন গুরু, আর কখন বন্ধু, বান্ধব, প্রিয়জন বলি। যখন যাহা বলি, তখন তুমি আমাদের নিকট তাহাই সাজিয়া থাক। হাতে গড়া পুতুলের মতন, তুমিও যেমন আমাদিগকে সাজাইয়াছ, আমরাও তোমাকে সেই সেই ভাবে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছি। হে আত্মা! তুমিও যেমন আমাদের ছাড়িয়া একাকী থাকিতে অসমর্থ, তেমনি আম-রাও তোমাকে ছাড়িলে, আর থাকি না। তুমি যেমন আমাদের,

জন্য, আমরাও তোমারই জন্য। হে আত্মা! যখন তোমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তবে কেন তুমি লুকাইয়া থাক। হে লীলাময়! তোমার লীলা অদ্ভুত, তোমার রূপ মায়াময়। তোমায় কিরূপে চিনিব? যাহার নির্দ্দেশ নাস্তি, তাহারই লাভের প্রয়াস! ইহাই ত অতি অদ্ভুত। তুমি আছ বলিয়াই সকলেরই শোভা, এবং তোমাতেই সর্ব্ব শোভা বিবর্জ্জিত হইয়া মায়ার পরিহার হয়। তুমি আছ বলিয়াই সকলই সম্ভব। তোমাকে বার বার প্রণাম ও নমস্কার।

মাতাপিতা পাছে তোমার স্নেহ দয়া দেখিতে পাইলে, সহ্য করিতে অক্ষম হই, পাছে তোমার প্রদত্ত বিষয়-বৈভব সুখের ছায়া মাত্র বোধে, প্রত্যাখ্যান করি, পাছে, আপনাদের ভুলিয়া গিয়া, তোমাতেই মজিয়া যাই, পাছে তোমার বিচিত্র জগৎ-সংসারে আগুন লাগে, তাই কি তুমি আড়ালে থাকিয়া ভালবাস, মুখস পরিয়া কোলে লও, অন্ধকারে বসিয়া আহার দাও? হে মাতাপিতা! এ ব্যবহার কি চিরকালই থাকিবে। আর কত কাল জীব পিতৃমাতৃহীন সন্তানের ন্যায় অবিচারে ইচ্ছামত, পিতামাতা ভাবিয়া স্নেহ-লালসায় লাঞ্ছিত ও হতাশ্বাস হইয়া, কাঁদিয়া তোমার পবিত্র ভাবের কলঙ্ক রটাইবে? হে মাতাপিতা! তুমিই যখন একমাত্র আমাদের মাতাপিতা, তখন আমাদের নিকট প্রকাশ থাকিলে তোমার ক্ষতি কি? তোমার কোন্ শক্তির অভাব আছে, যাহার জন্য, তোমাকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে? তুমি ইচ্ছা করিলে জীবের সকল বাসনাই পূরণ করিতে পার, তাহাতেও তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, এবং না করিলেই বা কে তোমায় বাধ্য করিতে সক্ষম? অথবা তোমার যে সর্ব্বশক্তিরূপ বিষয়, তাহা কাহার জন্য পুঁজি করিয়া রাখিবেন। তাই বলি মাতাপিতা! তোমার সম্পত্তি,

তোমারই সন্তানগণের ভোগ্য হউক। তুমি মুক্ত হস্তে, তোমার সন্তানগণকে সর্ব্বশক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া দাও। সকলেই আপন আপন রুচি অনুসারে, ভোগ করিয়াও তোমার পবিত্র আস্বাদের চির অধিকারী থাকুক। মাতাপিতা! জীব যে দরিদ্রের সন্তান নহে, তাহারা যে সর্ব্বশক্তিমান্ আনন্দময় রাজরাজেশ্বর রাজরাজেশ্বরীর সন্তান, ইহা জ্ঞাত হইয়া, তাহাদের দরিদ্রতা ভাব দূর হউক। তোমার স্নেহ আস্বাদ, তুচ্ছ আসক্তিকে চক্ষের আড়াল করুক। হে মাতাপিতা! লোকে পবিত্র হইবার কথা বলে; কিন্তু আগে পবিত্র হইয়া, পরে তোমার কোলে উঠিতে হইলে, আমরা কোন কালেই পবিত্র হইয়া কোলে উঠিতে পাইব না। কারণ তুমি যেমন পবিত্রময়, আমরাও তেমনি অপবিত্রতার মূর্ত্তি। তুমি কোলে লইলেই আমাদের সমস্ত অপবিত্রতা ঘুচিয়া যাইবে, নচেৎ পবিত্রতা অসম্ভব।

হে আত্মা! তুমি যদি শুধু প্রিয় হইতে, তাহা হইলে, কেহই তোমাকে চাহিত না। তুমি অপ্রিয়ও বটে। সেইজন্য তোমার মিষ্ট আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা রাখি বলিয়াই তোমাকে চাহি। তোমার বহু ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশে, তুমিই স্বপ্রকাশ, সেইজন্যই তোমার নিকট একভাবের প্রকাশই, প্রার্থনীয়। হে মাতাপিতা! তোমাতে স্নেহ দয়া যেমন দেখি, সেইরূপ তোমাতেই, মহাকালেরও আস্বাদ রহিয়াছে, তাই তোমাকে মনের মত করিয়া, দেখিবার জন্য, দেখিতে ইচ্ছা। মাতাপিতা! তুমি যাহা আছ, তোমার রূপ, গুণ শক্তি ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তোমাকে চাহিতে পারি না, সেইজন্য তোমাকে পাই না। হে মাতাপিতা! সকলেই তোমাকে আনন্দময় বলে, তবে কেন নিরানন্দই প্রকাশমান? মাতাপিতা! তুমি

একমাত্র আছ, ইহা সত্য। তোমাকেই সকলে শুনেন, তোমাকেই সকলে দেখেন, তোমার আস্বাদই সকলে লন, কেননা তুমি ভিন্ন অপর কেহ নাই। কিন্তু তোমার ব্যক্তিভাবের আস্বাদ জগতে অপ্রাপ্ত রহিয়াছে। বরং তোমার এক ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তে, বহু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বেরই আস্বাদ সুলভ। কাজেই জীব মহাসমুদ্রের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। তাই তোমাকে না দেখিয়া, অপরকেই দেখি, আবার অপর দেখিয়া ভয় পাইয়া তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই। হে আত্মা! তুমি দয়া করিয়া আমাদের মধ্যে, পূর্ণরূপ আনন্দভাবে প্রকাশ হও, তুমি নিজগুণে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে তোমার প্রকাশের সহিত এক করিয়া প্রকাশ থাক, তাহা হইলেই আমরা তোমাকে আনন্দরূপে পাইয়া, তোমার ভালবাসায় গলিয়া যাইব। নচেৎ আমাদের ভালবাসা, একের ত্যাগ, অপরকে গ্রহণ করিয়াই স্থিত। আমাদের জ্ঞান, অন্ধকারের বন্ধু, আমাদের আনন্দ দুঃখের সঙ্গী। তাই বলি, হে আত্মা! তোমার কৃপা ব্যতীত, আমাদের শান্তির উপায় নাই। তুমি আর, তোমাহীন তুমি ভাবে, লুকাইয়া থাকিও না। তোমার পূর্ণ মূর্ত্তি আমাদিগকে গ্রাস করিয়া, চির আনন্দরূপে প্রকাশ থাকুক। তোমার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও সর্ব্বাতীত, এবং কি ভিন্ন, কি অভিন্ন ব্যক্তি রূপ, গুণ, শক্তি ভাব আনন্দরসে ডুবিয়া থাকুক, তাহা হইলে আমরা জীবমাত্রই, তোমার হইয়া, তোমার সুখে, তোমার ভাবে, গলিয়া আনন্দরূপেই বর্ত্তমান থাকিবে। হে মাতাপিতা! আপনিই যখন সকলের মূল ও সর্ব্বরূপ, তখন আপনার সর্ব্ব অবস্থাই আনন্দময় হইলে, তবেই আনন্দের আশা, নচেৎ আনন্দ দুর্লভ।

আত্মা, তুমি বহুরূপী বটে, তবে তোমায় অপরিবর্ত্তনীয় কেন বলি? বাস্তবিকই কি তোমার রূপের কোন ঠিকানা নাই? নিশ্চয়ই আছে। নচেৎ লোকে তোমাকে কি করিয়া লাভ করিবে? অথবা তুমি বহুরূপী, তাহাই বা জানে কেমন করিয়া আসিল। হে আত্মা! রূপই ত, তোমাকে চিনিতে দেয় না। রূপই ত, তোমাকে চঞ্চল দেখাইয়া, আমাদিগকেও চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। রূপই ত মজাইবার প্রধান কারণ। এ আবরণ উঠাইয়া, ঐই রূপে, যদি তোমাকে একবার পাই, তাহা হইলে তুমি আর কোথায় লুকাইবে। তুমি যে ব্যক্তি, তাহা চিরস্থির অপরিবর্ত্তনীয়। তোমাকে পাইলেই তোমার সমস্তই পাইব। কেন না তোমা ছাড়া, তোমার আর কি অপর আছে, যাহা তোমাকে প্রাপ্ত হইবার পর অবশিষ্ট থাকিবে। হে আত্মা এই যে তুমি, এ তোমাকে না চিনিবার কারণ, তুমি ব্যক্তিকেই ধরিতে অক্ষম।

আমাদের ধরাবাঁধা, সকলই ইন্দ্রিয়ের ভাব। আমরা মন-বুদ্ধি দিয়াও, ভাল করিয়া কিছুই ধরিতে পারি না। তোমার ব্যক্তিত্বকে কেমন করিয়া ধরিব। তাই তোমাকে না দেখিয়া, অপর সকল দেখি। তাই তুমি ছাড়া, আর সব প্রাপ্তব্য বলিয়া বুঝিতেছে। হায় যেমন হাতী দিয়াই হাতী ধরা যায়, সেইরূপ ব্যক্তিত্ব দ্বারাই তুমি ব্যক্তি, ব্যক্ত হও। যেমন অচেতন পদার্থাদি, জীব জন্তু আছে কি নাই এ ভাবও ভাবিতে পারে না, সেই রূপ যে, নিজ ব্যক্তিত্ব না বুঝে, অথবা আপনার দ্বারা, আপনাকে না ধরিতে চায়, সে কখন আপনাকে দেখিতে পায় না।

হে আত্মা! তুমি যেমন তোমার, সেইরূপ তুমিই ত আমাদের

সর্ব্বস্ব। যাহা পাইব বা না পাইব, তাহাও তোমারই নিকট হইতে। তবে কার কাছে তোমাকে পাইবার জন্য ভিক্ষা করি। ভিক্ষা করিতেই বা কে শিখাইবে? হে মাতাপিতা আত্মা গুরো! আপনি নিজগুণে সর্ব্বতোভাবে আনন্দরূপে প্রকাশ হইয়া, সর্ব্ব ব্যক্তিতে এক অবিচ্ছিন্ন আনন্দ প্রতিষ্ঠা করুন। তাহাহইতে, আমরা ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের ন্যায়, ব্যক্তিভাবের দ্বারা, আপনার ব্যক্তি ভাবের দর্শন পাইয়া, কৃতার্থ হই। হে মাতাপিতা আত্মা! তুমি একবার মুখ তুলিয়া চাহ। তাহা হইলে, আমরা আর কিছুই চাহিব না। তুমি, সেই কথাটী বলিয়া যাও, যে কথা শুনিলে আমরা বোবা হইয়া পড়ি। তুমি একবার তোমাতেই ঘুম পাড়াও, তাহা হইলে আর কখন ঘুমাইবার জন্য কাঁদিব না। তুমি, তোমার বাঁধিনে বাঁধিয়া রাখ, তাহা হইলে, আমাদের সর্ব্ব বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা! তুমি কি যথার্থই আমাদের মা বাপ! অথবা পাতান মাতাপিতা! যদি যথার্থ মা বাপ হও আর তোমাতেই সর্ব্ব শক্তি, সত্য সত্যই থাকে, তাহা হইলে তোমার কৃপায়, মুহূর্ত্তে, সর্ব্ব জীবের মঙ্গল আশা, না করিব কেন? জীবশরীরে, যে মাতৃস্নেহ, আপন সন্তান রক্ষার জন্য, অগ্নিতে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। যে মাতৃভাব, মরণ কালেও সন্তানকে বুক হইতে নামাইতে নারাজ, যে মাতৃভাব, মৃত পুত্রকেও জীবিত বলিয়া দেখে, যে মাতৃভাব, সন্তানের জন্য, আপনার সর্ব্ব সুখ অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়া থাকে, যদি তুমি আমাদের সেই মা হও, তাহা হইলে কেন জগৎ স্থির পরমানন্দে, আনন্দ রূপে না ভাসিবে। হে মাতাপিতা! এ কথা সত্য, যে, আমরা মুখে তোমাকে

মাতাপিতা বলিলেও, মাতাপিতার যথার্থভাব, অন্তরে রাখি না। সর্ব্ব শক্তিযুক্ত বলি বটে, কিন্তু কোন শক্তি তোমার আছে বলিয়া, নিশ্চিতরূপে ধারণায় নাই। কিন্তু ইহাতে যদি দোষ হয়, তাহা কাহার? তুমি যে, এক ব্যক্তি আছ, অথবা তুমি সর্ব্বশক্তির মালিক, ইহা যদি, তুমি নিজে, আমাদের না দেখাও, তাহা হইলে, আমরা কেমন করিয়া দেখিব বা জানিব? হে মাতাপিতা! দোষ যাহার হউক, কিন্তু আমাদের কষ্টের সীমা নাই। দোষগুণের প্রতি, লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া, এখন আমাদের প্রতি, তুমি দয়া করিয়া উদ্ধার কর বা শান্তি দাও। নচেৎ আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। হে মাতাপিতা! ব্যক্তিগত কোন কোন প্রার্থনা পুর্ণ করিলে, একের প্রতি দয়া, অপরের প্রতি অত্যাচার সম্ভব। কিন্তু যে প্রার্থনা, জীব মাত্রেরই শান্তির জন্য, তাহাও যদি তোমার প্রসাদের উপযুক্ত না হয়, বা সচরাচর দেখা যায় না বলিয়া, উহা, প্রত্যাখ্যাত হইলে, প্রার্থনার প্রয়োজন আছে কিনা, তাহাতেই সন্দেহ। অথবা তোমার যে দয়া স্নেহের কণা মাত্র লাভ করিয়া, মহাত্মাগণ জীবের দুঃখে কাতর, সেই তুমি যদি পাষাণ হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার অস্তিত্ব অঙ্গীকার, অজ্ঞানজনিত ভয় ভিন্ন, লোকে আর কি মনে করিতে পারে? হে মাতাপিতা! তুমি যাহা জীবের সাধ্যে রাখিয়াছ, উহা পাইবার জন্য, তোমার নিকট প্রার্থনা না করিলেও চলিতেছে। কিন্তু, যাহা, জীবের সাধ্যাতীত, তাহা কোথায় পাইবে? জীব বহু চেষ্টা করিলে, কতক অংশে, শরীর পবিত্র রাখিতে পারে বটে, কিন্তু একবিন্দু বিষ, মুহূর্ত্তে জীবননাশে সমর্থ। সুদৃঢ় অট্টালিকাও ভূমিকম্পে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে। সুখের নিদ্রা আর ভঙ্গ হইল না, ইহাও ঘটা সম্ভব। এমত অবস্থায়

আপনার কৃপা ভিন্ন, আমাদের কোন্ উপায় আছে, যাহা আপনার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়াও আমরা করিতে পারি। হে মাতা-পিতা! জগতের দুঃখ কি তোমার চক্ষের আড়ালে রহিয়াছে! তবে কেন জগৎ, সর্ব্বমঙ্গল লাভে বঞ্চিত।

হে মাতাপিতা! যদি বাস্তবিক তুমি জীবের মাতাপিতা ও সর্ব্বশক্তিমান্ হও, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তোমার কৃপালাভের অধিকারী। তুমি কোন না কোন একদিন, এই যন্ত্রণাময় জগতে, দুঃখের মৃদু গন্ধ মাত্র রাখিয়া, সর্ব্বসুখের আগার করিয়া দিবে। একদিন নিশ্চয়ই তোমার মত মাতাপিতার স্নেহ, দয়ার আস্বাদ, জীবমাত্রই ভোগ করিয়া পরমানন্দে থাকিবে। সেদিন যে কবে আসিবে, তাহা তুমিই জান। কিন্তু উপস্থিত জগতে, এখন অন্ততঃ ইহাই করুন, যেন জীব অন্ততঃ,মৃত্যুকালেও তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া তোমার মাতৃপিতৃভাবের আস্বাদের সহিত, তোমারই কোলে উঠিতে পারে। ইহাই আমার বিশেষ প্রার্থনা। জীবকে এইরূপ দয়া লাভের উপযুক্ত করিবার জন্য, যাহা প্রয়োজন, তাহা আপনি গড়িয়া লউন। হে মাতাপিতা! তুমি শরীর মনের সহিত প্রার্থনা-প্রবৃত্তি দিয়াছেন বলিয়াই, তোমার নিকট প্রার্থনা উপস্থিত। হে মহান, তোমার দয়া জীব হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হউক। তোমার স্নেহ, জীবের কুটীলতা, হিংসা, দ্বেষ, পক্ষপাতকে কর্পূরের ন্যায় অদৃশ্য করুক। তুমিই সকলের মধ্যে এক ও অনন্তরূপে সর্ব্ব ভোগাভোগ করিয়াও মুক্ত থাক। তোমার আনন্দমূর্ত্তি যেন, কোনকালে কোন অবস্থায়, কোন ব্যক্তিতে ম্লান না হয়। তোমাকেই বারংবার পূর্ণরূপে প্রণাম নমস্কার দণ্ডবৎ করি। তুমি যে চিরকালই সকলের প্রিয়, সে

পরিচয় অহরহ সর্ব্বসমক্ষে প্রত্যক্ষ হউক। আমরা যেন, তোমা ছাড়া অপর না দেখি। তোমাতেই, সত্য আস্বাদের সহিত, ভালবাসিয়া, ভালবাসাকে চরিতার্থ করিতে সক্ষম হই। জীবকুল, তোমাতে মাতাপিতার আস্বাদ লাভ করিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করুক এবং তুমি জীবকুলকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া চির আনন্দরূপে প্রকাশ থাক। হে আত্মা! তোমারই আত্মার সহিত, তোমারই সর্ব্বভাবাভাব, তোমাতেই নিবেদন করিয়া বারংবার প্রণাম নমস্কার করি। আপনি প্রসন্ন হইয়া সকলকে প্রসন্ন ও আনন্দময় করুন।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

জ্যোতিঃপথ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা।

যাহা আমি তাহারই আর একটি নাম আত্মা। যাহা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আমারই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অবস্থা তাহার নাম পরমাত্মা এবং আমার আপন ভাবকে, যখন বহুর অন্তর্গত ধরিয়া অপর হইতে ভিন্ন অথচ কতক বিষয়ে অপরের সহিত অভিন্নতা বোধ করি, এই অবস্থায় আমি জীবাত্মা নামে অভিহিত হই। কার্য্যের জন্য অবস্থা এবং অবস্থাই ভেদভাব প্রকাশ রাখে। এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা—ভাবে ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ এক। এই এক ভাবকে অবস্থা ধরিলে, ও যাহার এই এক, দুই, তিন ও চারি অবস্থা, তিনিই সর্ব্বাবস্থার অতীত যাহা, তাহাই। এই যৎ তৎকে ব্যবহারে আনিতে হইলেই, পূর্ব্বোক্ত কোন না কোন অবস্থার মধ্যে ফেলিতে হইবে, নচেৎ ব্যবহার অসম্ভব। উপাসনা একটি ব্যবহার। অবস্থাতীতের মধ্যে বা সহিত কোন ব্যবহার নাই। অতএব অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য যৎ তৎএর উপাসনা—ব্যক্ত নির্দ্দিষ্ট

কোন না কোন দৃশ্য অবস্থারই উপাসনা হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ উপাসনা—শব্দ গণ্ডীর মধ্যেই পড়িয়া থাকিবে। ব্যবহার বা উপাসনার জন্যই সর্ব্বপ্রকার বিচারের আবশ্যক। নচেৎ যে বিচার বা ব্যবহার, উপাসনার প্রবৃত্তিকে উদ্দীপন না করে, তাহা অবিচার বা জীবনের অপব্যবহার নামেই পরিচিত হইবার যোগ্য। রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাব ব্যতীত অবস্থা বা নামকরণ নাই। নাম ও অবস্থা সীমাকেই নির্দ্দেশ করে। নির্দ্দিষ্ট পদার্থ রূপ, গুণ, শক্তি—ভাবে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলেও বস্তুতঃ বৃহৎ হইতে ভিন্ন বা ক্ষুদ্র নহে, বৃহৎকেই ব্যবহারে আনিবার জন্য ক্ষুদ্রতারূপ অবস্থা কল্পনা বা জীবকর্ত্তৃক নাম নির্দ্দেশ। নির্দ্দেশ ব্যতীত মনুষ্যের পক্ষে ব্যবহার অসম্ভব বলিয়াই অনির্দ্দেশ্যকে নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যে নিত্য বস্তু সর্ব্বকালে রহিয়াছেন, তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিলেও তিনি যাহা তাহাই আর অনির্দ্দেশ্য বলিলেও তিনি যাহা আছেন, তাহাই আছেন ও থাকিবেন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই—কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ব্যবহার করিলে ভ্রমের উৎপত্তি বা জ্ঞানের প্রতিবন্ধক এবং অনির্দ্দেশ্য ভাবিয়া ব্যবহার ত্যাগ করিলে বস্তুর আস্বাদে বঞ্চিত হইতে হয়। এ কারণ সাধনার জন্য অনির্দ্দেশ্যই প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন, এইরূপ ধারণা রাখিয়া যে ভাবে তিনি যে আস্বাদরূপে বর্ত্তমান, সেই ভাবকে আশ্রয় করিয়া, সেই আস্বাদ গ্রহণ করাই জ্ঞানের পরিচয়। অন্যথা:অজ্ঞানই বৃদ্ধি পায়।

একই বৃহৎ—জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশমান। যাহা জীবে আছে, তাহাই জগতে এবং যাহা জগতে নাই, তাহা জীবে প্রকাশ থাকা অসম্ভব। কারণ জগতই জীবের সর্ব্বরূপ, গুণ, শক্তি বা

অবস্থার ভাণ্ডার। জীব সমস্তই জগৎ হইতে গ্রহণ করিয়া, লীলা অবসানে জগতেই রাখিয়া দেন। অপর দিকে জীবে যাহা প্রকাশ নাই, তাহা জীবের পক্ষে কল্পনা অসম্ভব। বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বুঝিতে হইলে, জীবেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সহিত মিলাইয়া বুঝা আবশ্যক।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি জন্ম ও মরণকে অবস্থা ধরিলে, জীবের পাঁচটি অবস্থা হয় এবং অনির্দ্দেশ্য অখণ্ড হইতে নির্দ্দিষ্ট খণ্ড ভাবে প্রকাশ হইবার যে শক্তি বা অবস্থা উহাও জীবেরই অবস্থা। একারণ জীবভাবকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে বিভক্ত করিলে ছয়টি প্রধান প্রধান অবস্থা ধরা যাইতে পারে। কিন্তু যেমন এই ছয় ভাগে জীব ভাবকে পৃথক্ পৃথক্ করিলেও, জীব পৃথক্ পৃথক্ ছয়টি হয় না, অথবা উহার কোন একটি অবস্থার দ্বারা জীব সীমাবিশিষ্ট নহেন, সেইরূপ ব্রহ্মে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ হইলেও কোন প্রকাশেই ব্রহ্ম ক্ষুদ্র বা বহু ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্ম হন না। যেমন জীবের এক অবস্থার মধ্যে অন্যান্য অবস্থাও অনির্দ্দেশ্য ভাবে থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের এক ভাবের প্রকাশে অন্যান্য ভাবও ওতপ্রোত রহিয়াছে। যেমন জীবের এক অবস্থার কার্য্য অন্য অবস্থায় পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মেরও এক অবস্থার ব্যবহার অপর অবস্থায় অপ্রাপ্তি থাকে।

জীবের জন্ম অবস্থার আস্বাদ—সুখ চেষ্টা, প্রকাশ—জড়ভাবাপন্ন জল ও উষ্ণতা। জাগ্রৎ—স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত সুখ দুঃখ আস্বাদময় ভোগাবস্থা, চেষ্টা—আপ্ত প্রকাশ বা চেতনভাব বিশিষ্ট অহঙ্কাররূপ। স্বপ্ন—সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত ভাবের আস্বাদ ভোগাবস্থা, দুঃখনিবারণে প্রবৃত্তি, অবসন্ন চেতনাভাবাপন্ন মলিন প্রকাশা-

বস্থা। সুষুপ্তি—কষ্টের বিরাম আস্বাদ। নির্ব্বিকার আনন্দ ভোগের চেষ্টা, প্রকাশ—অহং মাত্রে বর্ত্তমান। মৃত্যু—সর্ব্বভাবের অবসানরূপ নিবৃত্তির আস্বাদ। চেষ্টা—শান্তি। প্রকাশ—অনির্দ্দেশ্য বর্ণনাতীত যৎ তৎ।

জগতেও এই সকল ভাব প্রত্যক্ষ। স্থূলতত্ত্বের কোন এক ভাব হইতে অপর ভাব প্রকাশের পূর্ব্বে জলময় তেজের প্রয়োজন। ইহাই জন্ম ভাব।

পৃথক্ ভাববিশিষ্ট নামরূপ অবস্থাই জাগ্রৎ অবস্থা। এই অবস্থাই অপরের নিকট প্রকাশ থাকিবার জন্য অহংরূপ। স্থূলের সহিত মিশ্রিত হইয়া,সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ থাকিবার মূর্ত্তি—অগ্নিভাব।

বৃহৎ জগৎ ব্যাপারে দিবসরূপ। ক্ষুদ্রে তাপরূপ ইন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া প্রকাশ বা অহঙ্কার ভাবে সুখ দুঃখের ভোগ বা জাগ্রৎ ভাবাবস্থা, ইহা চেতনার ব্যবহারে বিশেষ প্রকাশ।

পূর্ণিমা—জাগতিক স্বপ্নাবস্থা; এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ তাপও প্রকাশের কার্য্য সকল ক্ষীণভাবে প্রকাশ থাকিয়া ভোগাভোগ ঘটে।

অমাবস্যা—অগ্নিভাবের তাপ ও প্রকাশের বিশ্রাম। এই অবস্থায় জাগতিক ক্রিয়ার শান্তরূপ।

প্রলয় বা মৃত অবস্থা—সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ অর্থাৎ ন্যূনাধিক্য প্রকাশ ও তাপের সমতাবস্থা। এই অবস্থায় পৃথক বোধ না থাকায় সর্ব্ব ক্রিয়া ও ভাবাভাবের নিরাকার বা একাকারাবস্থা।

যেমন মনুষ্যের জন্মাদি তাপ ও প্রকাশ অবস্থার সহিত জগৎ ভাবের উৎপত্তি, তাপ ও প্রকাশের সাদৃশ্য রহিয়াছে, সেইরূপ জীব চেতনার প্রকাশের সহিত চৈতন্য ভাবের মিলন সম্বন্ধ অনুসন্ধান

করিলে দেখা যাইবে যে, একই চেতন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। ভাবই ভিন্নতা ও অভিন্নতার রূপ। ব্রহ্মচেতনার সহিত জীব-চেতনার ও ভাবসম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সাদৃশ্য আছে। জীবচেতনার ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুসারেই ব্রহ্মচেতনার ভাবের ভিন্নতার কল্পনা মাত্র। এবং যেমন জীব-চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব থাকা সত্বেও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন না, সেই রূপ কার্য্যের জন্য ব্রহ্মচেতনার পৃথক পৃথক ভাব প্রকাশ থাকিলেও ব্রহ্ম-চেতনা বা ব্রহ্মব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বা বহু হন না। জীবাত্মার ন্যায় ব্রহ্ম একমাত্র সর্ব্ব ভাব লইয়া অখণ্ড চৈতন্যরূপেই প্রকাশ থাকেন।

আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়-চেতনা, বাহিরে উদ্ভিদ-চেতনা, রূপ—অগ্নি জ্যোতিঃ। শরীরে মনশ্চেতনা, স্বপ্নাবস্থা, বাহিরে জ্যোৎস্না প্রকাশ, রূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। আমাদের জীব-চেতনা জাগ্রদবস্থা, বাহিরে দিবা প্রকাশ, রূপ—সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ। আমাদের মধ্যে এই সকলপ্রকার চেতনা ভাবকে একমাত্র চেতনা প্রকাশ বলিয়া বুঝিতে অসমর্থ থাকায়,যেমন ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির কার্য্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুক্ত প্রকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টি প্রকাশ বা চেতনা বোধ করি, সেইরূপ বাহিরে চেতনা ভাবকে অখণ্ড বোধ করিতে অসমর্থ থাকায় তাহার কার্য্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে, ব্যষ্টি ও অচেতন অনুভব হয় এবং যেমন ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি, স্থানের দ্বারা সীমা বিশিষ্ট অনুভবে আইসে, সেই প্রকার জগতেও অগ্নি, চন্দ্রমা, ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্থান ও কালের দ্বারা সীমাবিশিষ্ট দেখায়। যেমন স্থূল শরীরের প্রতি লক্ষ্যবশতঃ আমি ভিন্ন ভিন্ন ও ব্যষ্টিরূপে অভিহিত হই। সেই প্রকার জগৎভাবের প্রতি লক্ষ্য বশতঃ অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়াভেদের জন্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ জীবচক্ষে ও অন্তঃকরণে

ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টি বলিয়া অনুভূত হন। যেমন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ক্রিয়া ভেদে জীবেরই ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ। সেই রূপ ব্রহ্মই ক্রিয়া রূপে প্রকাশ হইলে মনুষ্য তাঁহাকে, আত্মা পরমাত্মা জীবাত্মা নামে নির্দ্দেশ করে। শরীরে যেমন উত্তাপই সর্ব্ব ইন্দ্রিয়রূপ এবং আমি ভাবপ্রকাশের আধার, সেইরূপ বিরাটে অগ্নি ব্রহ্মই আত্মা রূপ বা জগৎ রূপে অবস্থিতি করিবার শক্তি। শরীরে মন যেমন জীবাত্মা ভাব জ্ঞাপন করে, সেইরূপ বিরাটে চন্দ্রমা জ্যোতিঃই ব্রহ্ম ও জগৎ ভাবের আস্বাদ দাতা ও গ্রহণকারিণী শক্তি এবং শরীরে বুদ্ধি যেমন সত্যাসত্যের ভাব লাভ করিয়া মনের নিয়ামক নাম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ মনই আপন উৎকৃষ্ট প্রকাশে উপস্থিত হইয়া, বুদ্ধি আখ্যা লন, সেইরূপ বিরাটে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ অর্থাৎ চন্দ্রমা ভাবের উৎকৃষ্ট প্রকাশ জগৎ রূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ বা সর্ব্ব প্রকার আস্বাদ বা ভাবকে নিয়মিত রাখিতেছেন—ইহাই পরমাত্মার রূপ। যেমন শরীরে উত্তাপ ভাবই সর্ব্বত্র অনুভূত হন, সেইরূপ অগ্নি ভাব বা তাপ জগতের সর্ব্বত্রই অনুভবে আইসেন। মন ও বুদ্ধির প্রকাশ যেমন সর্ব্বত্র বুঝা যায় না, স্থানে স্থানে আসা যাওয়া করিতেছে মনে হয়, সেই প্রকার চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ যে সর্ব্বরূপে প্রকাশ বা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা উপস্থিত রহিয়াছেন, তাহা অনুভূতি না হইয়া, সময়ে কিরণ প্রকাশ ও অস্ত প্রত্যক্ষ। যেমন সর্ব্ব শরীরে বেদনা হইলে, মন বুদ্ধির প্রকাশ সর্ব্বশরীরেই বুঝা যায়, সেইরূপ পরমাত্মার কৃপায়, জীব শরীরে তাপও মন বুদ্ধির প্রকাশের সহিত, জগতিক তাপ ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির প্রকাশ অখণ্ডভাবে প্রত্যক্ষ হইলে তবেই সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বরূপে অনুভব করা যায়।

তাপের সহিত অগ্নি চেতনার প্রকাশঅনুভবে—ক্রিয়ারূপ বা আত্মার ভাব। মনের সহিত চন্দ্রমা চেতনার প্রকাশে—একমাত্র আলোকেই সর্ব্বপ্রকার ভোগ ও ভোক্তা রূপ—জীবাত্মারভাব এবং শুদ্ধ আত্মার উপস্থিতি বা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশে একমাত্র চৈতন্য পুরুষ বিরাজ থাকেন, ইহাই পরমাত্মা-ভাব বলিয়া প্রকাশ হয়। এই পরমাত্মা-ভাব যখন অবিচলিত ভাবে বর্ত্তমান থাকেন তখন তাঁহারই নাম ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্ম। ভোগ ও ভোক্তা অর্থাৎ আস্বাদ ও চেতনার সংযোগভাবই সৃষ্টির কারণ ভাব এবং জাগতিক সুখ দুঃখে অবসন্ন হইয়া, আত্মজ্ঞানের চেষ্টা বা মুমুক্ষু ভাবই মৃত ভাব। ক্রিয়ার পার্থক্যতাই ভাবের ও নামের পার্থক্য, নচেৎ কি ক্রিয়া ভাবে, কি রূপ, গুণ, শক্তি প্রকাশে, সর্ব্বভাবেই এক মাত্র ব্রহ্মই আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন। ব্রহ্ম ব্যতীত কেহ আত্মা পরমাত্মা বা জীবাত্মা নাই। ব্রহ্ম প্রকাশকে আস্বাদ ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করিবার জন্যই এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দ্দেশ মাত্র।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চক্ষুঃ ও আলোক।

যাহা দ্বারা রূপ দর্শন হয়, তাহার নাম চক্ষুঃ। শাস্ত্রে এই চক্ষুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, স্থূলচক্ষুঃ, জ্ঞানচক্ষুঃ, আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ নামে অভিহিত করা হয়। এই তিন চক্ষুঃ কি? ইহাদের কার্য্য এবং ভিন্নতাও জাতিগত একতা কোথায়, ইহা বুঝিবার জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয়কে বিশেষ রূপে বিবিক্ত অর্থাৎ অন্য অন্য ইন্দ্রিয় হইতে, ভিন্ন করিয়া ইহার পদার্থ ভাব ও কার্য্য পর্য্যালোচনার

আবশ্যক। ইহা বুঝিতে পারিলে ত্রিনয়নের সাম্য যে ব্রহ্ম-ভাব, তাহার অনুসন্ধান লাভ হইবে। এ বিচার তাঁহারই ভাব উদ্‌ঘাটনের জন্য। নচেৎ ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র।

আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুঃ একটি মাত্র ইন্দ্রিয় বিশেষ। বস্তুভাবে সকল ইন্দ্রিয়ই এক। প্রকাশভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয় চেতনার রূপ, প্রকাশ বা উপস্থিতি। এবং ভাব গ্রহণ ও জ্ঞাপনকারী ভাব। অন্যান্য ইন্দ্রিয়, ভাব গ্রহণের জন্য চেতনার সহায় রূপ। যথা—শক্তি চক্ষুঃ একদিকে বাহির হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া, যেমন চেতনাতে সংলগ্ন করে, সেই প্রকার অপরদিকে, চেতনা প্রকাশ থাকিয়া ভাব গ্রহণ করিলেন, এই ভাব এবং গ্রহণ করিয়া চেতনার প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা ভাবও প্রকাশ রাখেন। আরও যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন ভাব গ্রহণ হউক না কেন, উহার লব্ধ বিষয়ের আস্বাদ চক্ষুরিন্দ্রিয়েও বিশেষ করিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রকাশ ও অবস্থার ভাবান্তর ঘটে এবং ভাব লাভের সঙ্গে সঙ্গেই চেতন ব্যক্তির ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, যেমন ইন্দ্রিয় ভাবে জাতিগত মিল আছে, সেই রূপ ব্যক্তির প্রকাশের সহিতও জাতিগত সম্বন্ধ রাখিয়াছে। কিন্তু অপরাপর ইন্দ্রিয় সকল পরস্পরের সহিত যত জাতিগত সম্বন্ধ রাখে, চেতন ব্যক্তি ভাবের সহিত জাতিগত পার্থক্য তত অধিক প্রকাশ করে। চক্ষু-রিন্দ্রিয় যত পরিমাণ ব্যক্তিগত ভাব ও স্বাধীনতা প্রকাশ রাখিবার প্রয়াসী, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তত পরিমাণ জড়তা ও পরাধীনতার ভাব রক্ষার আধার। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভাবের ভিন্নতা থাকা সত্বেও চক্ষুঃ—ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত। অথচ

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রকাশে চেতন ব্যক্তির উপস্থিতি অঙ্গীকার না করা অযুক্তি ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিবিরুদ্ধ। কারণ সকলেই দেখিতেছেন যে চক্ষের আলোক পদার্থের দর্শনে, চেতন ব্যক্তির দর্শন লাভ হইল বলিয়া ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ ও অন্তরে বিশ্বাস হয়। আরও চক্ষুরিন্দ্রিয় যে—রূপ, আলোকপদার্থ বা দৃষ্টিশক্তি, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে রহিয়াছে, এ অনুভূতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়, অপর ব্যক্তির কর্ণে যে শ্রবণশক্তি অথবা ঘ্রাণেন্দ্রিয় অপরের নাসায় যে ঘ্রাণশক্তি রহিয়াছে, তাহা জ্ঞাত হইতে সম্পূর্ণ অপারগ; ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে ইন্দ্রিয় ভাবের জাতিগত একতা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। জাতি এক, কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন, ইহারই উপর লক্ষ্য করিয়া এক দুই সংখ্যা গণনা; এই কারণ আমাদের মধ্যে পঞ্চ বা দশ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা। এখন বুঝা প্রয়োজন যে, কেবল মাত্র চেতনার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকরী শক্তি বা অনুভব গ্রহণের শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ত্রিনয়ন শব্দের উল্লেখ নহে; কারণ তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের দশ সংখ্যানুসারে দশ বা ততোধিক চক্ষুরই বর্ণনা থাকিত। এখন বিচারের বিষয় এই যে, কোন্ সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জ্ঞান ও আত্মাকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত জাতিগত ঐক্য করিবার জন্য জ্ঞানচক্ষু আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ শব্দে জ্ঞান ও আত্মাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভিন্নতা অভিন্নতা বস্তুভাবে নাই, প্রকাশ ভাবেই ভিন্নতার সহিত জাতিগত একতা। যে জাতীয় প্রকাশ বা শক্তি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান সে জাতীয় প্রকাশ বা শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখানে চক্ষুঃ শব্দের উল্লেখ যে নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখা হইয়াছে। এখন

বুঝা প্রয়োজন, কোন জাতীয় প্রকাশে, আত্মা, জ্ঞান ও স্থূল দৃশ্য, দৃষ্টিশক্তি বা রূপ পদার্থ স্থিত রহিয়াছে এবং কি কারণে আত্মা ও জ্ঞানকে দৃষ্টিশক্তির সহিত সমজাতি ভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইল, ইহা মীমাংসার পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানচক্ষুঃ কাহাকে বলে, তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন।

মনুষ্য যে শক্তির দ্বারা আত্মার অনির্দ্দেশ্য ও ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট ভাবের সহিত অপরিবর্ত্তনীয় অচ্ছেদ্য চৈতন্যজ্ঞান ও আনন্দময় ব্যক্তিভাব বুঝিতে সমর্থ হন তাহার নাম আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ। এই চক্ষুর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মা পরমাত্মা ভাব এক হইয়া সর্ব্ব ভাবাভাবের অতীত, অবস্থায় স্থিতি লাভ হয়। চৈতন্য আনন্দময় ব্রহ্মই একমাত্র বর্ত্তমান; ইহাই আধ্যাত্মিক চক্ষুর বিষয়, ইহা আত্মার প্রকাশ অবস্থা বা আত্মদর্শন শক্তির বিকাশ মাত্র। জ্ঞানচক্ষুঃ—জ্ঞাত হইবার বিষয় মাত্রেরই অনুভব গ্রহণ শক্তি, বিষয় ও বিষয়ী বস্তুভাবে এক হইলেও কার্য্যে ভিন্নতা আছে, এই বোধের সহিত ভিন্নতা রক্ষা পূর্ব্বক আমি জানিতেছি, এই রূপ আত্মাহঙ্কার যুক্ত যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার শক্তি, তাহার নাম জ্ঞানচক্ষু; এবং যে শক্তির দ্বারা সর্ব্ব প্রকার ভৌতিক পদার্থের ন্যূনাধিক সর্ব্বভাব প্রত্যক্ষ হয়, উহার নাম ভৌতিক স্থূলচক্ষু. অর্থাৎ যেখানে আত্মপ্রকাশেই দৃশ্য ও দ্রষ্টা, সেখানে আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ, যেখানে জ্ঞানেই দৃশ্য ও দ্রষ্টা, সেখানে জ্ঞানচক্ষু এবং যেখানে পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশেই দৃশ্য ও দ্রষ্টা ভাব, সেখানে রূপ বা প্রকাশের ভৌতিক চক্ষুঃ নাম দেওয়া হয়।

যে পদার্থ নিজে প্রকাশ হইয়া অপরকেও প্রকাশ করে, তাহার নাম আলোক। এই আলোক পদার্থই স্থূলতত্ত্বের সহিত মিশ্রিত

হইয়া, ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয় বা দৃষ্টিশক্তি নামে পরিচিত। স্থূলের স্বভাব জড়তা বা অজ্ঞানতা, একারণ দৃষ্টিশক্তি আলোক-পদার্থ হইলেও অন্ধকারে তাহার কার্য্যের প্রতিবন্ধক ঘটে। এবং এই অন্ধকার সম্পূর্ণরূপ আলোক পদার্থের বিপরীত কোন ভিন্ন পদার্থ নহে বলিয়াই, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকে এবং অন্ধকারকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারাই বিশেষরূপ অনুভব করি। অন্ধকার অপর কোন পদার্থ হইলে, উহা গ্রহণের জন্য অন্য কোন অন্ধকার পদার্থযুক্ত ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হইত। এই রূপ, প্রকাশ, বা বর্ণভেদ, জ্ঞানের দ্বারাই চেতনার অনুভূতি ঘটে। যেমন জীব চক্ষুর প্রকাশের সহিত পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার স্থাপনের জন্য অর্থাৎ রূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তৃতীয় রূপের বা আলোকের প্রকাশ থাকা বিশেষ প্রয়োজন বুঝা যায়, সেইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণের জন্য অনুপস্থিত সমজাতীয় তত্ত্বের প্রবল উপস্থিতির নূতন ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জ্ঞান ও চেতনার ভাব বুঝিবার জন্য প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও চেতনার প্রকাশের প্রয়োজন রহিয়াছে। যেমন দৃষ্টি শক্তি আলোক পদার্থ, সেইরূপ জ্ঞান ও আত্মা আলোকময় বলিয়াই জ্ঞান ও আত্মাকে চক্ষুর সহিত জাতিগত প্রকাশের ও ব্যক্তি ভাবের ঐক্য নির্দ্দেশের জন্য একই "চক্ষুঃ শব্দে অভিহিত করা। যেমন দৃষ্টিশক্তির প্রকাশ অপ্রকাশে, ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির চেষ্টা আছে, সেইরূপ জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির বিশেষরূপ চেষ্টা ও বলের প্রয়োজন হয় এবং ব্যক্তি ভাবের প্রাধান্য আছে। যেমন দৃষ্টি শক্তি নাস্তি অর্থাৎ অদৃশ্য হইতে পুনরায় অস্তি অর্থাৎ অপরের নিকট উপস্থিত হয়, সেই রূপ জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশ ও ব্যক্তিগত

ভাব অপ্রকাশ অনির্দ্দেশ্য ভাব হইতে ফুটিয়া উঠে। এবং প্রত্যক্ষ অবস্থাকে ত্যাগ করে। এ কারণ জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশ ও ব্যক্তিভাব, চক্ষুর প্রকাশের ও ব্যক্তিভাবের সহিত এক জাতীয় আলোক ও ব্যক্তিভাবাপন্ন প্রকাশ বলিয়া, জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশকে জ্ঞানচক্ষুঃ ও আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ বলিয়া চক্ষু শব্দের বিশেষত্বের পরিচয় করা হয়।

আলোকময় ব্যক্তি ভাবই এই তিন ভাবের ঐক্য ভাব; এই জন্য, এই আলোক পদার্থ ও ব্যক্তিভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তিন চক্ষুর উল্লেখ। চর্ম্মচক্ষু ও জ্ঞান চক্ষু, উভয়ই বিষয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়। একারণ এই দুই চক্ষুর অনুভূতি কখন সত্য, কখন মিথ্যা হইয়া যায়। অর্থাৎ এই দুই ভাবের অনুভূতিতে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ অপরকে অপেক্ষা না করিয়াই প্রকাশ পায়। সুতরাং ইহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা নাই। এজন্য আধ্যাত্মিক চক্ষুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্ষু বা তত্ত্বজ্ঞান নামে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

অনেকে ত্রিনেত্র সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া থাকেন যে, দুই চক্ষুঃ প্রত্যক্ষ রহিয়াছে এবং ভ্রূমধ্যে আর একটি চক্ষু আছে, উহা লইয়া তিনটি চক্ষুঃ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের যে প্রত্যক্ষ চর্ম্ম চক্ষুঃ, তাপ ও প্রকাশ একত্রে প্রকাশ থাকিয়া স্থূল পদার্থ দর্শন করি ইহা চর্ম্ম চক্ষু। বাহিরে ইহাই অগ্নিরূপ। মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধে যথায় সর্ব্বপ্রকার স্থূল ইন্দ্রিয়শক্তি লয় পায়, সেই স্থানে মনরূপা শক্তির সহিত একত্র হইয়া ভ্রূমধ্যস্থিত বুদ্ধি শক্তি প্রকাশ হয়, ইহাই জ্ঞান চক্ষু, ইহা বাহিরে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের মিলন রূপ। এবং মন বুদ্ধি ভাব লয় হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে

সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির সহিত অভেদে চৈতন্য মাত্রে প্রকাশ থাকার নাম আধ্যাত্মিক চক্ষুর উন্মেষ। অর্থাৎ আত্মায় পরমাত্মায়, অভেদে পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকার নাম আধ্যাত্মিক চক্ষু। ইহার রূপ, সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিশ্চৈতন্য মাত্র। এই তিন ভাবের প্রকাশে, চেতনা, আলোক বা ব্যক্তি ভাব আছে বলিয়াই, এই তিনি অবস্থার নাম চক্ষু রাখা হইয়াছে, এবং একমাত্র চক্ষে, যেমন রূপ দর্শন ব্যতীত, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আস্বাদও পাওয়া যায়, সেই প্রকার মন, বুদ্ধি ও আত্মার প্রকাশে, সর্ব্বপ্রকার আস্বাদ লাভ হয়, ইহা বুঝাইবার জন্যই, জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশকেও চক্ষু শব্দে, অভিহিত করা হয়। এবং চক্ষে দর্শন করিলে, যেমন সন্দেহ নিবারণ হয়, এবং চক্ষুর প্রকাশ দ্বারা, ব্যক্তির ভাব বুঝা যায়, সেইরূপ, জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশে, ভাবের উদয়েই অনুভব ঘটে, এবং চর্ম্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষা, অধিক নিশ্চিন্ত ও জীব চেতনার প্রকাশ, বিশিষ্ট ভাবে, জীব চেতনাতে অর্থাৎ মনুষ্যের অনুভব বা উপলব্ধি হয় বলিয়াই, স্থূল চক্ষু অপেক্ষা, জ্ঞান চক্ষের এবং জ্ঞান চক্ষু অপেক্ষা আধ্যাত্মিক চক্ষের মাহাত্ম্য অধিক। স্থূল চক্ষুর কার্য্য, স্থূলকে প্রত্যক্ষ করা ও স্থূল যুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষ হওয়া ; জ্ঞান চক্ষুর কার্য্য, একই সূক্ষ্ম জ্যোতিঃতে স্থূল সূক্ষ্মের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার আস্বাদ ও ভাব লাভ করা। আধ্যাত্মিক চক্ষু—একই জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্যময় সত্যের, সত্য, মিথ্যা, আস্বাদের সহিত, আপনাতেই আপনি বিদ্যমান আছি, এই ভাবে প্রকাশ থাকা। এই আধ্যাত্মিক চক্ষুলাভের জন্যই জীবাত্মার জন্ম, মরণ, যোগ, যাগ, তপস্যা, উপাসনা, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, বিচার, কর্ম্ম ও প্রার্থনা। যে জন্য; যোগ, বিচার, প্রার্থনাদি এই আধ্যাত্মিক চক্ষুলাভের সহায়,

তাহাই প্রকৃত জপ, ভক্তি, উপাসনা, বিচার ও প্রার্থনা, নচেৎ সমস্তই ব্যর্থ ও দুঃখেরই কারণ হয়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ৷৷

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান।

যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম জ্ঞান; যে জ্ঞান ভিন্নতার সহিত অভিন্নতা ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম বিজ্ঞান। এবং যে শক্তি সত্য বস্তুর অনুসন্ধান দেয়, তাহরি নাম তত্ত্বজ্ঞান। সাধারণতঃ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ইহাই অর্থ করা যায়। এবং বিশেষ বিচারে দেখা যাইবে, ইন্দ্রিয়ের নাম জ্ঞান, বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান; এবং আত্মাই তত্ত্বজ্ঞান রূপে প্রকাশমান।

অপ্রত্যক্ষ বিষয় সকল অনুভূবে না আসায়, তাহার সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না। উহা অস্তি নাস্তির বহির্ভূত। যাহা ধারণা করি, তাহা ইন্দ্রিয়ই প্রথমে গ্রহণ করে, এমন কি স্নেহ, দয়া প্রভৃতি যাহা মনের বিষয় বলিয়া উল্লেখ, তাহাও স্থূল ইন্দ্রিয়ই, প্রথমে আস্বাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হইলে পর, মন বুদ্ধি গ্রহণ করে বা বুঝিতে সক্ষম হয়। যেমন শিশু প্রথমে তাহার স্থূল শরীরে দোল খাইয়া চুম্বন পাইয়া, ব্যাকুল অবস্থায় কোলে আশ্রয়, মধুর স্বরে আতঙ্কের নিবৃত্তি প্রভৃতি স্পর্শানুভবের দ্বারা স্নেহ দয়া, প্রভৃতি গুণ এবং ঝাকি মারা, উগ্রস্বরের ব্যবহার, প্রভৃতি কার্য্যে রাগ, দ্বেষ, ভাবাদি ক্রমে অবগত হইবার পর, বুঝিতে পারে যে, ঐ সকল ব্যবহার প্রথমে মনে উদয় হইয়া, পরে কার্য্যে প্রকাশ হয়; সেইরূপ বুদ্ধি,

ভাবের আস্বাদ পাইবার পর, ভিন্নাভিন্নতাজ্ঞান, এবং আত্মার অনুভূতি হইলে, তবে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হয়। যেমন বাহিরের বিষয় সকল, শিশুর স্থূল ইন্দ্রিয় সকলকে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ লাভের উপযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ করে, সেই প্রকার ভাবের আস্বাদরূপ প্রকাশ পদার্থ, মনুষ্যের মন বুদ্ধিকে স্পন্দন করিয়া, ভিন্ন ও অভিন্ন রূপ বিজ্ঞানের প্রকাশ এবং আত্মা বা চেতনা বস্তু, প্রকাশ হইয়া অপরিবর্ত্তনীয় অখণ্ড শান্ত আনন্দরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়। যেমন স্থূল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সকল, বাহিরের বিষয় সাপেক্ষ, সেইরূপ বিজ্ঞান বুদ্ধির প্রসাদ এবং তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণমাত্রায়, ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করে। এই জন্য অপৌরুষেয় ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের জন্য, ব্রহ্মেরই উপাসনার প্রয়োজন। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান মূলে এক হইলেও, যেমন, জ্ঞান থাকিলেই বিজ্ঞানের পারদর্শী নহে, সেই রূপ বিজ্ঞান আয়ত্ত থাকিলেও, তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায় না। যেমন আত্মা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়, এক বস্তু হইলেও, ভাবের ভেদে আস্বাদের তারতম্য। সেই প্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান একই প্রকাশ পদার্থ হইলেও, রূপ বা বর্ণের তারতম্যে, অনুভব ও আস্বাদের পার্থক্যত্ত্ব বর্ত্তমান। প্রকাশ পদার্থের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন ভাবই পার্থক্যের মূল। প্রকাশ, অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় কারণ বা তত্ত্বজ্ঞানরূপ। এবং প্রকাশে অখণ্ডাকারকে রক্ষা করিয়া. ভাবে ভিন্ন হইলে সূক্ষ্ম বা বিজ্ঞান। এবং সূক্ষ্মের ভিন্নতার সহিত, ভিন্ন, ভিন্ন, স্থূলের অনুভব যুক্ত ক্রিয়ার প্রকাশ অবস্থায়, প্রকাশের নাম স্থূল বা জ্ঞান রূপ হয়।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও তত্ত্বজ্ঞান, এই তিনই, তিন জাতীয় চক্ষু, ও শরীর। যেমন স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়া, ইন্দ্রিয়রূপ জ্ঞান

শরীর বা চক্ষু, সেইরূপ প্রকাশ বা জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শরীর বা চক্ষু এবং চেতনা বা বিজ্ঞান শরীরকে অবলম্বন করিয়া, তত্ত্বশরীর বা আধ্যাত্মিক চক্ষু অবস্থিত। যেমন স্থূল শরীরে আমিত্ব প্রকাশ থাকিলে, স্থূলের জ্ঞান, সেই প্রকার সূক্ষ্ম শরীরে, প্রকাশ মাত্রে আমিত্ব বোধে, বিজ্ঞান এবং অ স্মামাত্রে একই আমিত্ব অনুভূতির সহিত, একই আত্মা বস্তুর উপস্থিতিতে, তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হয়। যে শরীরে আমিত্ব প্রকাশ থাকে, সেই শরীরেই জ্ঞান বা অনুভূতি ঘটে। আমিত্ব সকলের মূল বলিয়া, যে প্রকাশ আমিত্ব ভাব ও আমি বস্তুর যত নিকট,তাহার প্রকাশ,বা জ্ঞান ও ব্যাপকতা তত অধিক। এই জন্য, কারণের মধ্যে, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল। সূক্ষ্মের মধ্যে, সূক্ষ্ম ও স্থূল এবং স্থূলের মধ্যে, কেবল মাত্র স্থূল ভাব বা জ্ঞান, বিশেষ করিয়া প্রকাশ। স্থূলের প্রকাশে, হীনতা আছে বলিয়াই, স্থূলের সহিত সূক্ষ্মের, ভাবের মিল না হইলেও, সূক্ষ্মের সত্যতা এবং সূক্ষ্মের সহিত অনৈক্য হইলেও কারণের মর্য্যাদা রক্ষা স্বাভাবিক। যেমন জ্ঞানে অস্বাভাবিক হইলেও, বিজ্ঞানে, তাহা স্বাভাবিক। সেইরূপ বিজ্ঞানেও যাহা অস্বাভাবিক বোধ করি, তত্ত্বজ্ঞানে,তাহাও বিধি বদ্ধ বলিয়া অনুভূতি হয়। যেমন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ মিল না থাকিলে, বিজ্ঞান, মিথ্যা নহে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের বা জ্ঞানের ঐক্যতার অভাবে, তত্ত্বজ্ঞান, অপ্রমাণিত হয় না।

আরও বুঝা প্রয়োজন, যাহা বিজ্ঞান, তাহা জ্ঞানের অন্তর্গত হইলে, যেমন জ্ঞানের পর, বিজ্ঞান লাভের প্রয়াস, নিষ্প্রয়োজন, সেই রূপ বিজ্ঞানের দ্বারা, তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইবার সম্ভাবনা, থাকিলে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা ও উপাসনা ব্যর্থ হইত। কিন্তু

যেমন জ্ঞানই বিজ্ঞানের অনুসন্ধান দেয়, সেই প্রকার বিজ্ঞানই, তত্ত্বজ্ঞানের সংবাদ আনে। এখন বুঝা প্রয়োজন, যেমন বিজ্ঞানের বিষয় জ্ঞানে ধারণা না হইলেও অসম্ভব ব্যবস্থা নহে, সেই প্রকার বিজ্ঞানে যাহা অসম্ভব বোধ হয়, তত্ত্বজ্ঞানে তাহা, সম্ভবপর থাকা, কোন প্রকারে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেমন বিজ্ঞানের সহিত, জ্ঞানের সম্পূর্ণ মিল না থাকাই স্বাভাবিক। সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের সহিত, বিজ্ঞানেরও সম্পূর্ণ ঐক্যতার অভাবই, স্বাভাবিক নিয়ম।

এখন সামান্য মাত্র বিচারে বুঝা যাইতে পারে যে, কেন এক-মাত্র অস্তিত্বে, এক জন ব্রহ্ম দর্শন, অপরে জগৎ দর্শন করে। কেন একই বিষয়ে জীব শান্তি, অশান্তি, সুখ, দুঃখ, আনন্দে, নিরা-নন্দে, অভিভূত। কেন এক ব্যক্তি, যাঁহাকে অপারবর্ত্তনীয় এক রস স্বরূপ, নিত্য, প্রকাশ অনুভব করেন, অপরে, তাঁহাকেই নশ্বর ভিন্ন, ভিন্ন, বহু বোধ করিতেছেন। ইহার মূল কারণ, জীবের অবস্থা। যে জীব, যখন, যে অবস্থায় থাকে, তখন সেই অবস্থার প্রকাশ বা ভাবকে, সত্য বলিয়া অনুভব করেন। যেমন জাগ্রতে, জাগ্রতের বিষয় ও স্বপ্নে স্বপ্নের বিষয় সকল, সত্য বলিয়া অনুভূতি হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশে, সেই সেই অবস্থার বিষয় সকল, সত্য বলিয়া ধারণা ঘটে। যেমন মনুষ্য একই স্ত্রী ব্যক্তিতে, কেহ মাতৃ, কেহ কন্যা, কেহ জায়া, কেহ ভগিনী, কেহ মিত্র, কেহ শত্রু প্রভৃতি ভাব রক্ষা করে; এবং ঐ ভাব যেমন, ব্যক্তিগত ব্যবহারের ভিন্নতা জন্য হয়; সেই প্রকার জীব, একই সত্য বস্তুতে, কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরব্রহ্ম, কেহ প্রকৃতি, কেহ পুরুষ, কেহ জগৎ, কেহ বা চৈতন্য, কেহ বা জড় ভাব, লাভ করে। এইরূপ ভিন্নতা ভাব লাভের কারণও, জীবের ব্যক্তিগত

অবস্থা বা ব্যবহার ভেদ। যেমন বিজ্ঞানের সত্যভাব ও তাহার গতি বিধি, অজ্ঞানীর নিকট প্রমাণ দুঃসাধ্য, এবং বিজ্ঞানের সত্য প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বে, অজ্ঞানীকে কিছু কিছু জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারদর্শী করিতে হয়, সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিজ্ঞানীর বোধগম্য করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। এই তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি, প্রমাণ করিবার প্রয়াসের পূর্ব্বে, তত্ত্বজ্ঞান কি বস্তু এবং কি করিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, সে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

যেমন অগ্নি, নাড়া চাড়া পাইয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ বুদ্ধি নাড়া চাড়া পাইয়া প্রকাশ হয়। বুদ্ধির এই নাড়া চাড়ার নামই বিচার। যেমন অগ্নি, তাহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম তত্ত্ব বায়ুর আঘাতে বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকার আঘাতে নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ, বুদ্ধি, সত্যের আঘাতে প্রকাশ ও অসত্যের আঘাতে নষ্ট হয়। বুদ্ধির হ্রাস বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই, বিচার ও অবিচার শব্দের প্রয়োগ। যে ঝঙ্কার দ্বারা, বুদ্ধি সত্যের দিকে অগ্রসর হয়, তাহাই যথার্থ বিচার; এবং যাহাতে বুদ্ধিকে মিথ্যার অভিভূত হইতে হয়, উহারই নাম অবিচার। এ কারণ সত্য স্বরূপ পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচারের আবশ্যক।

যাহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তাহা তাঁহাতে, অনবরত সম্ভব রহিয়াছে। এই সম্ভব, অসম্ভব আমাদের শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া থাকি। কিন্তু যদি তাঁহার শক্তির প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলে অসম্ভবের অস্তিত্ব, তাঁহাতেই পর্য্যবসান করিতে হয়। নচেৎ অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই।

ইন্দ্রিয়াদির যেমন সীমা আছে, মন বুদ্ধিও সেইরূপ, ভাবের দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন। যেমন দুইটি অরূপ বিশিষ্ট পদার্থের সম্মিলনে,

রূপ বিশিষ্ট পদার্থ প্রকাশ হয়, ইহা, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করিতে এবং মন বুদ্ধি বিজ্ঞান, বিদ্যায় বা অনুভবে সক্ষম হয়, কিন্তু কেন এরূপ হয়, তাহা বিজ্ঞান বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইহা হয় এবং যাহার ইচ্ছা হয়, তিনি এই রূপ করিলেই, প্রত্যক্ষ করিবেন, বিজ্ঞান যেমন, এই মাত্র কৈফিয়ত দিতে পারে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল রূপে, প্রকাশমান। এবং এক মাত্র, ব্রহ্ম ব্যক্তিই, সর্ব্ব প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি রূপে জগৎ লীলা করিতেছেন, ইহা ব্রহ্ম প্রসাদেই অনুভব হয়, এবং ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই ইহা ঘটিতেছে, ব্রহ্মে আত্মসংযম করিলে, ইহার ব্যাপার অনুভূতি হইবে, তত্ত্বদর্শিগণকে এই মাত্র বলিয়াই নিবৃত্ত হইতে হইবে। কেন এরূপ হয় বা কেন জগৎ প্রকাশ, ইহার উত্তরে এক মাত্র ইহা বলাই সম্ভব, যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি আছে, তাঁহার ইচ্ছা অপ্রতিহত, তিনি অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান। যেমন স্বপ্নে মন, আপনাকে পর করিয়া ভোগ করে। কিন্তু মনের এ জ্ঞান থাকে না যে, সে আপনাকেই পর করিয়া ভোগ করিতেছে, সেই রূপব্রহ্মও আপনাকে জগৎ রূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মে অজ্ঞানতা না থাকায়, তিনি, আপনাকে পর ভাবেন না। এ কারণ সর্ব্ব প্রকার কার্য্য করিয়াও, তিনি নিষ্ক্রিয় এবং তাহার জীব ভাবই, পর দেখে বলিয়াই, সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার মূর্ত্তি। এবং আপনাকেই পর বলিয়া দেখিতেছেন, ও ভ্রমে পড়িয়া আছেন।

পরমাত্মার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভাবই জগৎ রূপ। ইহার প্রত্যেক ভাবের মধ্যেই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ব্যবহার আছে। স্থূলের জ্ঞানভাব—তেজ, বিজ্ঞানভাব, ভিন্ন ভিন্ন গতি, তত্ত্বজ্ঞান, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সূক্ষ্মের জ্ঞানভাব—এক মাত্র প্রকাশ,

বিজ্ঞান—ভাবের উদয়াস্ত, তত্ত্বজ্ঞান, চেতনার অর্দ্ধস্থিতি। কারণের জ্ঞান ভাব—চেতনা, বিজ্ঞানভাব, ব্যক্তিত্ব, তত্ত্বজ্ঞান, আনন্দ মাত্রের উপস্থিতি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও স্থূল তত্ত্বের সাহায্যে, যে, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, তাহা স্থূল জ্ঞানেরই অন্তর্গত। সেই প্রকার প্রকাশ ভাবদ্বারা, প্রকাশ ভাবে যে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বা তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বিজ্ঞানের মধ্যে, এবং আত্মার উপস্থিতি দ্বারা আত্মাতেই যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়,, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া বুঝা প্রয়োজন। যেমন, প্রথমে স্থূল শরীর লাভ করিয়া স্থূল পদার্থের স্পর্শ ঘটিলে, স্থূল পদার্থের অনুভূতি বা জ্ঞান হয়, সেই প্রকার, সূক্ষ্মপ্রকাশময় শরীর লাভ করিয়া, প্রকাশেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় অস্তে, সূক্ষ্মের জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান, এবং চেতনময় শরীর প্রকাশ পাইবার পর, চেতনায় ইচ্ছা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের সংস্পর্শে, চেতনার জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। যেমন স্থূল পদার্থ তেজোময় বলিয়া, উহা তেজোময় ইন্দ্রিয়েই অনুভূত হয়, সেইরূপ, সূক্ষ্ম, প্রকাশপদার্থ, ভাবময় বলিয়া, মন বুদ্ধির নিকট এবং কারণ প্রকাশ, চেতনময় বলিয়া, আত্মাতেই অনুভূত হয়। এ বিষয়ে, ইহাই সাধন পর্য্যায়ের রীতি বা ভগবানের নিয়ম! যেমন তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞানের এবং বিজ্ঞান জ্ঞানের অধিকৃত নহে। সেইরূপ কারণ জাতীয় তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞানের উপর, সূক্ষ্ম জাতীয় তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অধিকার এবং সূক্ষ্ম জাতীয় তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের প্রতি, স্থূল জাতীয় তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অধিকার নাই। এ কারণ, মূল তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য, ভগবৎ প্রসাদ আবশ্যক; নচেৎ উপাসনা নিষ্প্রয়োজন হইত। যেমন স্থূল বিজ্ঞান জানেন যে, এক মাত্র শক্তিই ভিন্ন

ভিন্ন, পদার্থ, রূপ, গুণে, প্রকাশ। কিন্তু জ্ঞান, এখানে অন্ধ, সেই প্রকার মূল তত্ত্বজ্ঞান, একমাত্র চৈতন্য পুরুষের আস্বাদ লাভে সমর্থ। এখানে স্থূল ও সূক্ষ্ম জাতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, বা তত্ত্বজ্ঞান, সত্যতত্ত্ব অনুভবে সম্পূর্ণ হতাশ। যেমন স্থূল বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান, অন্ধ হইলেও, বিজ্ঞান মিথ্যা হয় না; সেইরূপ জাগতিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ, মূল তত্ত্বজ্ঞানরূপের ধারণায় অসমর্থ হইলেও, ব্রহ্মজ্ঞান মিথ্যা বা কপোল কল্পিত হইয়া পড়ে না। বরং এখানে ইহাই বুঝা প্রয়োজন যে, যে অবস্থায় যে ভাব, সেই অবস্থা, লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার ভাব বুঝা অসম্ভব। ইহাই এই জগতের রীতি। এবং বুঝিবার প্রয়োজন হইলে, যে রীতি অনুসারে, যাহা বুঝা ভগবানের নিয়ম, তাহা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য, নচেৎ পণ্ডশ্রম হয় মাত্র।

স্থূল পদার্থ মাত্রই, ইন্দ্রিয়ের রূপ। একারণ যাহার যে ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, তিনি সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপ পদার্থকে, গ্রহণ করিতে সক্ষম। এইরূপে গ্রহণ করা ইন্দ্রিয়ের স্বভাব। এই স্বভাবের নামই জ্ঞান। ইন্দ্রিয় না থাকিলে, জ্ঞান প্রকাশ পায় না, ইহার কারণ ইন্দ্রিয়ই তেজোময় জ্ঞানরূপ। মন বুদ্ধি প্রকাশ পদার্থ; এ কারণ জ্ঞানের ভিন্নতা অনুভবে সক্ষম। একই, প্রকাশ, ভিন্ন, ভিন্ন, আস্বাদরূপে প্রকাশ হয়, ইহা মনস্তত্ত্বের স্বপ্নাবস্থার বিষয়, বিচারেও পাওয়া যায়। মন, বুদ্ধি প্রকাশতত্ত্ব। এই মন, বুদ্ধি, একত্রে প্রকাশরূপে বর্ত্তমান থাকিলে, মন ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়। এবং ঐ প্রকাশে, বুদ্ধি জ্ঞাতারূপে প্রকাশ মাত্রে বর্ত্তমান থাকে। এইজন্য মন বুদ্ধির একই প্রকাশ থাকিবার অবস্থার নাম, বিজ্ঞান। অথবা মন বুদ্ধি বিজ্ঞান বা আলক

পদার্থ। এবং আত্মাই সর্ব্ব প্রকার অনুভবের মূল। যেহেতু আত্মা না থাকিলে, কোন প্রকার অনুভূতির সম্ভাবনাও নাই। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয়, আত্মারই প্রকাশ, এ কারণ, আত্মার প্রকাশই, মূল তত্ত্ব জ্ঞান নামে অভিহিত। চেতনা ভাবই আত্মার প্রকাশ, এই এক মাত্র চেতনা পদার্থই, সর্ব্বরূপের প্রকাশ; ইনি অপরিবর্ত্তনীয় চৈতন্য পুরুষ জগৎরূপে পরিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রতীয়মান, এই জ্ঞান, চেতনা তত্ত্বে অনুভূত হয় বলিয়া—চেতনা বা আত্মাকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া বুঝা আবশ্যক। আত্মার অপরিচ্ছিন্নতা অবগত না হইলে, একই অপরিবর্ত্তনীয় পরমাত্মা পরিবর্ত্তনীয়ও বহু বলিয়া বোধ হইতেছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। অতএব আত্মা ভাবই তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান আত্মারই রূপ মাত্র। যেমন স্থূল পদার্থ স্থূল ইন্দ্রিয়কে জ্ঞান রূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ পরমাত্মার প্রকাশই, জীবাত্মাকে তত্ত্বজ্ঞানী রূপে প্রকাশ করেন। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান, কেবলমাত্র ব্রহ্মকৃপা সাপেক্ষ, দ্বিতীয় উপায় নাস্তি। শরণাগত হইয়া, আজ্ঞা পালন রূপ প্রার্থনা করাই, কৃপাপ্রার্থী মুমুক্ষুর পক্ষে, সত্য লাভের সহায় ও সম্বল।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

অনিত্যে নিত্য বিরাজ।

যাহা কখন পরিবর্ত্তন হয় না, তাহার নাম নিত্য। যাহার পরিবর্ত্তন ঘটে, উহা অনিত্য। এই ভাবে দেখিলে, যাহা কিছু আছে বলিয়া, জানা যায়, সমস্তই অনিত্য। এবং নিত্য কল্পনা,

অমূলক হইয়া উঠে। কারণ যে, মন বুদ্ধি বা জ্ঞানে ধারণা ঘটবে, সে মন, বুদ্ধি, জ্ঞানও অনিত্য। যে হেতু ইহাদের পরিবর্ত্তন, প্রত্যক্ষ। এমত অবস্থায় অনিত্যের দ্বারা নিত্য ধারণা অসম্ভব। এবং যে মন, বুদ্ধি, জ্ঞানাদি, ধারণার অধিপতি, তাহার কর্ত্তৃত্বের বহির্ভাগে, নিত্যানিত্যের ধারণা, কপোল কল্পিত হইয়া পড়ে। অতএব যদি নিত্য বলিয়া কিছু থাকে, তাহা অনিত্যেরই ভাবান্তর হইবে, নচেৎ নিত্যের কোন অস্তিত্বই নাই। বিচার করিলে দেখা যাইবে, ক্ষুদ্র ভাবের নাম অনিত্য এবং বৃহৎ বা সমষ্টির নাম নিত্য। বস্তু এক, ভাবে—ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

বুঝিবার সুবিধার জন্য, একটি উপমা কল্পনা করা হইল। ধরা যাউক, জল ব্যতীত অপর কোন পদার্থ নাই। এবং জল বস্তুতে, সর্ব্ব শক্তিই বর্ত্তমান আছে। ঐ জলে, বরফ, নানা মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইতেছে। কখন বা পরস্পরের ঘর্ষণ, কখন বা কোন একটি অপর কোন একটির উর্দ্ধে, কখন বা নিম্নে, কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ, কখন পূর্ব্ব, কখন পশ্চিম, প্রভৃতি চারিদিকে, বহু বরফ রহিয়াছে, কোনটি বা মনুষ্য, কোনটি বা পশু পক্ষী, কোনটি বা ভগ্ন হস্তপদ, কোনটি বা বলিষ্ঠ, কোনটি বা দুর্ব্বল ব্যক্তিভাবে, পরি-ভ্রমণ করিতেছে। আবার কোন স্থানে ব্যাঘ্রের মুখে মনুষ্য বা অন্য কোন পশুমূর্ত্তি পতিত, কোন স্থানে বা ব্যাঘ্রের শরীর মধ্যে, অন্য কোন জীব প্রবেশ করিতেছে, প্রভৃতি নানা ব্যাপার ঘটিতেছে। এখন বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন, এই যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এক একটি বরফের মূর্ত্তির গতিবিধি, যাহা, দেখা যাইতেছে উহা কি বাস্তব গতি? অথবা বাস্তবিক কি, ব্যাঘ্রের শরীরে অন্য জীবের প্রবেশ, সত্য ঘটনা? দ্বিতীয় রহিত যে জল বস্তু, তাহার গতি

কোথায় হইবে? অতএব অন্তরে জলের অদ্বিতীয়ভাব অবলম্বন রাখিয়া, গতিশীল বরফের বিচার আরম্ভ করা যাউক। যদিও একটি মাত্র বস্তুর মধ্যে স্থান কল্পনা নাই। তথাপি একই বস্তুতে, একের অধিক গুণ বা প্রকাশ কল্পিত হইলেই, স্থানের জ্ঞান পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ভাবই স্থান কল্পনার সহায়। অতএব জল বস্তুতে, স্থানের কল্পনা, প্রথমে ধরিয়া. পরে প্রতি স্থানে, বা জল পদার্থের প্রতি পরমাণুতে, সর্ব্বশক্তির চিন্তা রাখিয়া, বুঝা প্রয়োজন এই যে, কোন শক্তি বা গুণ অথবা নাম রূপ প্রকাশকে এক স্থান হইতে, প্রকাশ হইয়া অপর স্থানে আসিবার প্রয়োজন হয় কি না? অথবা এক স্থানের রূপ, গুণ, শক্তি বা প্রকাশ, অপর স্থানে, গমনাগমন করা সম্ভবপর কি নহে? প্রথমে দেখা যাইতেছে যে, এক স্থানের পরমাণুতে, যে যে, গুণ বর্ত্তমান, অপর স্থানের পরমাণুতেও সেই সেই গুণ আছে। এরূপ অবস্থায়, কোন গুণকে, অন্যত্র হইতে আসিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, জলের এক পরমাণুর গুণ, সেই পরমাণুকে নিগুর্ণ করিয়া, স্থানান্তরে গমন অসম্ভব, তৃতীয়তঃ জলের যে কোন পরমাণুতে বা স্থানে, যে যে, গুণের প্রকাশ প্রয়োজন, তাহা উক্ত স্থানে স্থিত পরমাণুতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় গতির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা, নিষ্ফল ও অসম্ভব। এবং অপর দিকে, জলে পরমাণু সকল, নিজ নিজ, রূপ, গুণে স্থির ভাবে প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও, গতি প্রভৃতি ভাব প্রতীয়মান হইতে পারে। জলের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইটি দিক কল্পনা করিয়া ধরা যাউক, পূর্ব্বদিক হইতে, একটী বরফ টুকরা পশ্চিম দিকে যাইতেছে। যেখানে জল ভিন্ন অপর পদার্থ নাই, সেখানে জলের মধ্যেই, এই

বরফ টুকরার গতি হইতেছে, মনে করা প্রয়োজন। বরফ, যাহা জল হইতে পৃথক্ বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, উহা জলেরই শক্তি মাত্র, বা জলেরই কোন না কোন রূপ, গুণ, শক্তির বিকাশ মাত্র বুঝা আবশ্যক। কারণ জল ভিন্ন, অপর পদার্থ নাই। তাহার পর যদি বুঝা যায় যে, জলের সর্ব্ব স্থানেই, বরফ রূপের প্রকাশ ও অস্ত শক্তি আছে, তাহা হইলে, ঐ বরফ শক্তির গতি, অপর কিছুই নহে, এক স্থানের জলে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকের জলে, বরফ শক্তির অস্ত ও পশ্চিম দিকের জলে, বরফ শক্তির প্রকাশ হইতেছে, ধরিলেই নিত্য স্থির রূপ জলের, বরফরূপ অনিত্য ভিন্নতা, ও গতি ভাব, ও প্রকাশাপ্রকাশরূপ, দর্শক, জলেরই, রূপ, গুণ, ব্যক্তি ভাবের প্রকাশে, ইহা বোধ হইতেছে বলিয়া বুঝিবার সংশয় থাকে না। অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এই রূপ মিলাইয়া লইলে, তবেই জল পদার্থ, এক অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাতেই যে বহু পরিবর্ত্তন বোধ হইতেছে, তাহা বুঝা যায়। পরমেশ্বর সম্বন্ধে, এই রূপ ধারণা করিতে পারিলেই, এক নিত্য স্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মাতেই, অনিত্য জগৎ, বা নাম, রূপ, গুণ, শক্তির বোধ, বুঝা যাইবে। প্রকাশ অপ্রকাশে, সত্যের কোন কালে কিছুই, অনিত্য হইবার নাই, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ, অপ্রকাশ, উদয়, অস্ত, জন্ম, মৃত্যু গতি আদি বোধ হওয়া সত্ত্বেও, কোন কালে কোন প্রকার গতি বা পরিবর্ত্তনাদি হইতেছে না। অথচ জগৎ ব্যাপারে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ও ভিন্ন ভিন্ন ভাব, নামরূপাদি, জীব-চক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা বুঝা যাইবে। এই ভাব বুঝিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হইবার জন্যই, নিত্যানিত্যের বিচার প্রয়োজন। বাস্তব পক্ষে অনিত্য

কিছুই নাই, একই নিত্য পরমাত্মাই, বহু, রূপ, গুণ, শক্তির সহিত প্রকাশমান আছেন। সর্ব্ব স্থানেই তাঁহার সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রকাশ রহিয়াছে। জীবশক্তিতে, যখন যে শক্তির লক্ষ্য পড়ে, তাহা জীবের নিকট প্রকাশ বোধ হয় বলিয়াই চির শান্ত ব্রহ্মে, অশান্ত জগতের সহিত, তাহার নানারূপ ও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক সমস্তই অচল ভাবে রহিয়াছে। যেমন একই মন পদার্থে, সর্ব্বশক্তি আছে বলিয়াই স্বপ্নে বহু ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সেইরূপ, একই সত্য পরমাত্মাতে, শক্তির প্রকাশ অস্ত ঘটিতেছে বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার. বা জগৎ বোধ করাইতে-ছেন বা ভাসাইতেছেন। এ'ভাবে ব্রহ্মভাব ধারণা করিতে পারিলে, সর্ব্বস্থানে একই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উপস্থিতি, পূর্ণরূপেই ধারণা হয়। তখন একেই সমস্ত ও সমস্তকে একই নিত্যতে তত্ত্বজ্ঞানী দর্শন করেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও ব্যক্তিভাব।

যে সকল বিষয়, ইন্দ্রিয়, অনুভবে সক্ষম, তাহার নাম স্থূল পদার্থ। যাহা মন বুদ্ধির গোচর, তাহাকে সূক্ষ্ম এবং যাঁহার অনু-সন্ধানে, মন, বুদ্ধি আত্মহারা হইয়া পড়ে, তাহারই নাম কারণ। কিন্তু যে ব্যক্তির স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভাব, তাঁহার সন্ধান এক দিকে যেমন দুর্ল্লভ, অপর দিকে তেমনই সুলভ। যেহেতু, তাঁহার লুকান যেমন সম্ভবে না, অপর পক্ষে, নূতন প্রকাশ হওয়াও, তেমনি অসম্ভব। কারণ তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। এমত অবস্থায়,

সহজেই মনে হওয়া সম্ভব, যে, যিনি পূর্ব্ব হইতেই ভগবান বা পরমাত্মাকে দেখিতেছেন, তিনি চিরকালই দেখিবেন। আর যিনি দেখেন নাই, তাহার কোন কালে দেখিবার সম্ভাবনাও নাই। যেহেতু যাহা আছে, তাহা একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় পরমাত্মাই আছেন, তাঁহার যখন পরিবর্ত্তন নাই, তখন দ্বিতীয় কে আছে, যাহার পরিবর্ত্তন হইয়া, অপ্রাপ্ত বিষয়, প্রাপ্তি হইবে। জীবের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হইলে, জীবকে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমেশ্বর দ্বিতীয়-রহিত, এক রস স্বরূপ, নিত্য, নিরঞ্জন। অর্থাৎ পরমাত্মা ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তাঁহার আস্বাদ ভিন্ন ভিন্ন নহে। তাঁহার উপস্থিতির কখন অভাব ছিল না বলিয়া তাঁহার উৎপত্তি নাই। এবং তিনি কোন বর্ণের দ্বারা, কোন ভাবের দ্বারা, অথবা কোন প্রকার বিশেষণ দ্বারা আবদ্ধ নহেন। এক দিকে প্রত্যক্ষ ব্যাপারে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই, অপর দিকে শাস্ত্র বা তত্ত্বজ্ঞান নিত্যনিরঞ্জনকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? ব্যক্তিত্বেই ইহার দাঁড়াইবার স্থান। কারণ ব্যক্তি, যে ভাবেই থাকুন না কেন, সেই এক অপরিবর্ত্তনীয় ব্যক্তিই থাকেন। ব্যক্তি, বিশেষণযুক্ত হইলে, বা বিশেষণবর্জ্জিত থাকিলেও ব্যক্তিত্বের কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। ব্যক্তি, অবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা অপরিচ্ছিন্ন হন না। ব্যক্তিতে সর্ব্বগুণ প্রকাশ থাকিলেও ব্যক্তি নির্গুণ, কারণ, কোন গুণ দ্বারা বা কোন গুণ থাকা না থাকায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। যেমন মনুষ্য জ্ঞানী হয়, মূর্খ হয়। মনুষ্যই জাগে, ঘুমায় বা স্বপ্ন দেখে। মনুষ্যই সুশ্রী, কুৎসিত দেখায়, কিন্তু ইহাতে যেমন

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বা ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন হয় না, একই মনুষ্য বা ব্যক্তি অপরিবর্ত্তনীয় থাকে, সেই রূপ একই পরমাত্মা বা ব্রহ্মব্যক্তি, স্বগুণে নির্গুণে, পরিবর্ত্তনে, অপরিবর্ত্তনে, প্রকাশে, অপ্রকাশে, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণে, সমভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়াই, ব্রহ্মব্যক্তি অপরিবর্ত্তনীয়, এক রস স্বরূপ নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, নিত্য স্বতঃপ্রকাশ। এ কারণ অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। এই একমাত্র ব্যক্তির মধ্যে, আপন ও পর এই দুই ভাব রহিয়াছে। কারণ, আপন ও পর এই দুই ভাব ব্যতীত ব্যক্তিভাবের প্রকাশ অসম্ভব। অতএব এই ব্যক্তিভাবই, ভিন্ন ভিন্ন, রূপ, গুণ, শক্তি, প্রভৃতির কারণ ভাব। পরমাত্মার এক রস ভাবই ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদের এবং তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থাই, সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনীয় অবস্থার কারণ। ব্যক্তির এই তিন জাতীয় কারণ অবস্থাই, প্রকাশে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ নামে অভিহিত হয়। যথা চৈতন্য বা প্রকাশ ভাব—কারণ রূপাবস্থা। ভাব ও আস্বাদময়—সূক্ষ্মাবস্থা। ক্রিয়া বা পদার্থ—স্থূলাবস্থা। এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভাব নিজ নিজ কারণে স্থিত হইলেই, ব্রহ্মে স্থিত হয়। যেহেতু ইহাদের কারণ অবস্থা ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বের সহিত অভিন্ন।

যেমন প্রত্যেক স্থূল পদার্থ, পৃথিবীতত্ত্বের অন্তর্গত, সেইরূপ সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব, এক ব্রহ্ম ব্যক্তিত্বেরই অন্তর্গত। আর যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ থাকিয়া, কোন স্থূলই পৃথিবীত্বের দাবী করিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ কোন ভিন্ন ভিন্ন জীব ব্যক্তিত্ব, ব্রহ্ম ব্যক্তিত্বের অধিকারী নহে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থূল প্রকাশকে, পৃথিবীত্ব লাভ করিতে হইলে, ভিন্নতা ত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মভাবে প্রকাশ হইতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব

পরিহার প্রয়োজন। যেমন কোন ফলমূলাদি দ্রব্য, পৃথিবীর সহিত পূর্ণ মাত্রায় মিশ্রিত না হইলে, উহার ভিন্ন আস্বাদ নষ্ট হয় না, পৃথিবীর সহিত সম আস্বাদে বৰ্জ্জিত থাকে, সেই প্রকার যাবৎ জীব; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিতে, ভিন্ন ভিন্ন সুখ দুঃখ, ভোগাভোগ করে, তাবৎ এক রস স্বরূপ ব্রহ্ম আস্বাদে বঞ্চিত থাকেন। এ কারণ, ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্ত, মুমুক্ষুর প্রতি, ইন্দ্রিয় ভোগে ও বাসনায় বিরত থাকিবার উপদেশ। এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রূপ অহঙ্কার, ব্রহ্ম ব্যক্তিত্বে উপশম করিবার জন্য, ভক্তি প্রীতি সহকারে এক রস স্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয় চৈতন্য ব্যক্তিরই যে, সর্ব্বভাবে উপস্থিতি, ইহা অনুভাবের প্রয়াস আবশ্যক। এই ব্যক্তি ভাবের ব্যবহার লাভ হইলে সর্ব্ব পরিবর্ত্তন, ও সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাব, প্রকাশ থাকা সত্বেও, সাধক পরমেশ্বরকে, এক মাত্র অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য প্রকাশমান দেখিবেন। এই ব্যক্তিভাবের আস্বাদ লাভের জন্যই, সর্ব্বপ্রকার সাধনা, যে সাধনা, এই এক মাত্র ব্যক্তির আস্বাদের অনুকূল নহে, উহা আত্মপ্রতারণারূপেই পরিণত হয়।

কল্প ও কল্পনা।

শাস্ত্রে ব্রহ্মার এক দিবসের নাম কল্প বলিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মার লীলা অবস্থা বা মন বুদ্ধির প্রকাশ অবস্থার নাম কল্প। এই কল্পকে বুঝিতে হইলে, ব্রহ্মা ও তাঁহার দিবস কাহাকে বলে, তাহা জানা আবশ্যক। নচেৎ কল্প নির্ণয় অসম্ভব।

ব্রহ্মের যে শক্তির দ্বারা, সৃষ্টি কার্য্য হয়, তাহার নাম ব্রহ্মা। এ জন্ম ব্রহ্মার আর একটী নাম প্রজাপতি। এই প্রজা-

পতি শব্দের দ্বারা, ব্রহ্মার কর্তৃত্ব আছে বলিয়া বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মা, পরব্রহ্মের জড় জাতীয় কেবল মাত্র সৃষ্টি করিবার শক্তি নহেন, জীব মাত্রেই তাঁহার অধীন, এবং তিনি জীবের নিয়ামক, ইহাও বুঝান হইয়াছে। আরও, ব্রহ্মা পরব্রহ্মের শক্তি হইলেও তিনি পুরুষ, প্রকৃতি নহেন, এরূপ বলিবার কারণ কি? বিচার করিলে বুঝা যাইবে, বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মা, ব্রহ্ম হইতে অপর কিছুই নহে, ব্রহ্মেরই জগৎ ভাবে, প্রকাশ হইবার প্রথম ক্রমনির্দ্দেশ মাত্র। অথবা ব্রহ্মভাবকে অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য স্বতঃপ্রকাশরূপে বজায় রাখিয়া, তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনকার্য্য হইতেছে, ইহাই বলিবার জন্য, ব্রহ্মা প্রভৃতি গুণদেবতার কল্পনা বা নামকরণ। এইজন্য সৃষ্টি: রূপ পরিবর্ত্তন অবস্থার নাম কল্প বা ব্রহ্মার দিবসকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এই কারণ সন্ধ্যা বন্দনায় (চন্দ্রসূর্য্যমসৌ ধাতা যথা-পূর্ব্বমকল্পয়ৎ) লিখা আছে, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় বিধাতা, চন্দ্রসূর্য্যকে কল্পনা করিলেন। এ কল্পনার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া অবোধ মনুষ্য, জগত মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা পরমাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইতেছেন। ইহার যথার্থ ভাব, উদ্‌ঘাটনের জন্যই, কল্প ও কল্পনার বিচার। নচেৎ কল্প বিচার নিষ্প্রয়োজন।

কল্পনা একটী মনের ধর্ম্ম বা বিকাশ রূপ। এই কল্পনার মধ্যেই সংকল্প বিকল্প রহিয়াছে। কোন বিষয়ের ভাব, মনের সহিত সংলগ্ন হইবার জন্য, যে প্রকাশ বা প্রয়াস, তাহার নাম, সংকল্প, এবং কোন বিষয় হইতে, মনের বিযুক্ত হইবার যে নিবৃত্তি-ভাব, তাহার নাম বিকল্প। যথায় বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, তথায়

সংকল্প বিকল্প কিছুই নাই। এ কারণ বিষয় বিষয়ী অবস্থার নামই কল্প বলিয়া বুঝা আবশ্যক। এই কল্পই ব্রহ্মার দিবস-কাল বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা বুঝা প্রয়োজন যে, সৃষ্টি অবস্থাই ব্রহ্মার দিবস। ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার শক্তিকে ব্রহ্মা নামে অভিহিত করা হয়। নচেৎ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা নামে, অপর কোন ব্যক্তি সৃষ্টিকর্ত্তাবলিয়া নাই। স্রষ্টা ও সৃষ্টি রূপে প্রকাশ হইলেও ব্রহ্ম, অপরিবর্ত্তনীয়, অহঙ্কাররহিত, এক রস স্বরূপে বিরাজ করেন, ইহা বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির, ভিন্ন ভিন্ন অভিমান নির্দ্দেশরূপ, নামকরণ হইয়াছে মাত্র। এবং ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করিবার মূলে একই সৃষ্টিশক্তি আছে, এই মূল সৃষ্টিশক্তি, অন্যান্য সৃষ্টিশক্তির প্রবর্ত্তক বলিয়া উহাঁকে পুরুষ, অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মেরই কর্ত্তৃত্ব রূপ বলিয়া ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তির জাতি-গত ভেদ, ত্যাগ করিয়া, যে মূল সৃষ্টিশক্তি, তাহার নাম ব্রহ্মা এবং জাতিগত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হইবার বা করিবার যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, তাহার নাম ব্রাহ্মণী (মহাশক্তি) বলিয়া বুঝা আবশ্যক।

দিবস কাহাকে বলি। সূর্য্যনারায়ণের প্রকাশ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই দিবস শব্দের ব্যবহার। কিন্তু এই প্রকাশের সহিত, মনুষ্যের জাগ্রত অবস্থার প্রকাশের সহিতও সম্বন্ধ রাখিয়া বলা হয়। কারণ সূর্য্য উদয়ের সহিত মনুষ্যকুল, বহু ভিন্ন ভিন্ন জীব জাতির সহিত জাগ্রত হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং এই অবস্থা, মনুষ্যের নিজ প্রকাশ রক্ষা অর্থাৎ ক্রিয়াশীল থাকিবার উপযুক্ত সময় বলিয়াই, দিবস নাম দিই। দিবসই মনুষ্যের আত্ম-বিকাশের প্রকৃষ্ট অবস্থা। এমত অবস্থায় দিবসকে সূর্য্য-

নারায়ণের সহিত মনুষ্যের প্রকাশ বা ক্রিয়মাণ অবস্থা বুঝা প্রয়োজন। এই ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মার দিবসে, জগতের প্রকাশ এবং ব্রহ্মার রাত্রে জগতের প্রলয় হয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এবং এই দিবসরূপ সৃষ্টি অবস্থাই, ব্রহ্মার আত্মপ্রকাশ অবস্থা বুঝা আবশ্যক। এ অবস্থার আর একটী নাম ভূঃ-লোক। অর্থাৎ জগৎ অবস্থা। এই জগৎ অবস্থাই ব্রহ্মার দিবস। এই দিবসকে বিশেষ করিবার জন্য, রজনীর প্রয়োজন। ব্রহ্মার রজনীতে জগৎ লোপ হইলেও ব্রহ্মা লোপ হন না। এই সময় ব্রহ্মার অস্তিত্ব ধরিতে হইলে ব্রহ্মার স্বপ্ন বা সুষুপ্ত অবস্থার কল্পনা প্রয়োজন। যেমন মনুষ্যের স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়, সেই প্রকার সৃষ্টি লোপ হইলেও সৃষ্টির বীজ সূক্ষ্মভাবে থাকে, ঐ অবস্থাই ব্রহ্মার স্বপ্নাবস্থা বা ভুবঃ-লোক। এবং যে সময় ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিশক্তি, সম্পূর্ণ রূপ, মূল সৃষ্টিশক্তির সহিত, অভেদে বর্ত্তমান থাকে, তখন ব্রহ্মার সুষুপ্তি। ইহার নাম স্বর্লোক। আর যে অবস্থায়, মূল সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মবস্তুর সহিত একরূপ হয়, তখন ব্রহ্মার মৃত্যু বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় স্রষ্টা, সৃষ্টি বা সৃষ্ট কোন প্রকার ভেদাভিমান নাই। বস্তু যাহা তাহাই থাকেন। ব্রহ্মার এইরূপ উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, অবস্থা কল্পনায় প্রয়োজন, কেবল, ব্রহ্মের অপরিবর্ত্তনীয় ভাব নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া, তাঁহাতেই, সর্ব্ব পরিবর্ত্তন বোধ হইতেছে, ইহা বুঝাইবার জন্য। এবং যাহাতে একই ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম, কারণভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহা মনুষ্যগণ বুঝিয়া শান্তি লাভে সমর্থ হন, সেইজন্যাই এই সকল বিচারের আবশ্যক।

এখন ব্রহ্ম শব্দ, যদি কেবল মাত্র শব্দ না হন, তাহা হইলে

কোন পদার্থের নাম ব্রহ্মা তাহা বুঝা আবশ্যক। এই যে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ, দিবালোকরূপে প্রকাশ পাইয়া, জীবজন্তুর সহিত মনুষ্যগণকে জাগ্রত করিয়া ক্রিয়মাণ রাখিতেছেন, তেজশক্তির দ্বারা জীব ও উদ্ভিদের অভাব উৎপন্ন ও মোচন করিতেছেন, এবং অস্তাচলে অদৃশ্য হইয়া জগতের সহিত জীবাদিকে কার্য্যে নিবৃত্ত রাখিতেছেন, ইনিই সেই ব্রহ্ম, জগৎলীলায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ নামে অভিহিত। ইহার প্রকাশ ও তেজশক্তির নাম ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী, চৈতন্য ও প্রাণশক্তির নাম বিষ্ণু ও বৈষ্ণবী, জ্ঞান ও বিদ্যার নাম মহেশ্বর ও সরস্বতী। একারণ সন্ধ্যা বন্দনায় এই সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে বন্দিত হন। যেখানে ব্যক্তিভাবের প্রকাশ, সেইখানে পুরুষ চৈতন্য, যেখানে কেবল মাত্র ক্রিয়াভাবের প্রকাশ, তথায় প্রকৃতি বা জড়ভাব বুঝা আবশ্যক। বস্তু এক হইলেও ভাবের ভেদে কখন দেবতা, কখন দেবী নাম, একই ব্যক্তির প্রকাশশক্তিমাত্র বুঝা প্রয়োজন। মনুষ্য ইঁহাকে না, চিনিয়া তুচ্ছ সৃষ্ট পদার্থ মনে করেন, কিন্তু ইনিই এক মাত্র সৃষ্ট পদার্থের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তা পরম পুরুষ পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম। জগৎভাব প্রকাশের সহিত ইনিই জীবচক্ষে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণরূপে প্রত্যক্ষ হন, অর্থাৎ জগৎ প্রকাশের সহিত, পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ, ক্ষুদ্ররূপে দৃশ্য হইলে, মনুষ্য ব্রহ্মজ্যোতিকে, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ নামে অভিহিত করে, এবং অন্যান্য তত্ত্ব হইতে ভেদভাব রাখিয়া সীমাবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাত হয়। ইহাই জগৎ ভাবের বিধি বলিয়া বিধাতা কর্ত্তৃক চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের কল্পনা বা প্রকাশ বুঝা প্রয়োজন। কল্পনা মনের ধর্ম্ম বা প্রকাশ বা মন রূপ বা

স্বয়ং ব্যক্তি মননকারীর সহিত অভিন্ন একবস্তু, ইহা জানিয়া, যাহাতে মনুষ্য বিধাতা পুরুষই চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন বুঝিয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপাসনা দ্বারা মঙ্গল লাভ করেন, সেই জন্যই লিখা আছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মা জাগ্রত হইলে, যেমন তাঁহার মন বুদ্ধি প্রকাশ হইয়া কার্য্য হইয়াছিল, সেই প্রকার এবার ও ব্রহ্মা জাগ্রত অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণরূপ মন, বুদ্ধি, রূপে প্রকাশ হইয়া জগৎ, সৃষ্টি, পালন, ও লয় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণরূপ মন বুদ্ধির প্রকাশ অবস্থাই, ব্রহ্মার দিবস অবস্থা। এই প্রকাশরূপ, দিবাগমে সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশ পায়। তাপ ও প্রকাশের সমতা অবস্থায়, কেবলমাত্র চন্দ্রমা জ্যোতিঃ প্রকাশ থাকিলে, ব্রহ্মার রজনী রূপ সমস্ত স্থূল জগৎ লয় হইয়া যায়। জগৎরূপই ব্রহ্মার দিবস, নচেৎ ব্রহ্মার দিবস বলিয়া অপর কিছুই নাই। ব্রহ্মার প্রকাশ অবস্থা বা ব্রহ্মেরই সৃষ্টি ভাবের প্রকাশ মাত্র। যাহাতে প্রত্যক্ষ জ্যোতিকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যগণ, জ্যোতিতেই পূর্ণ ব্রহ্মের আস্বাদ লাভ করতঃ কৃতার্থ হন, এবং জ্যোতিকে ক্ষুদ্রভাবে অবলোকন করিয়াও জ্যোতিঃ ব্যক্তি এই টুকু বা সীমাবদ্ধ মনে না করেন; ইহা বুঝাইবার জন্য, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিকে কল্পরূপে প্রকাশ বলিয়া বলা হইয়াছে। নচেৎ এই জ্যোতিঃ কল্পাতীত ব্রহ্মই প্রকাশমান রহিয়াছেন।

কথিত আছে যে, কল্পারম্ভের পূর্ব্বে, প্রজাপতি পিতামহ মহার্ণবে চারিবেদকে মুখে লইয়া মৎস্যরূপে ভাসিতে থাকেন। পরে কল্প আরম্ভের সহিত বেদ প্রকাশ হয়। একারণ বেদ অনাদি অসৃষ্ট। ইহার যথার্থ ভাব:জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মা, ভাব বা আস্বাদ

রূপ মহার্ণবে, অস্তিত্ব, রূপ, ভিন্নতা ও অহঙ্কার এই চারি জ্ঞান বা প্রকাশরূপ বেদ, এক মাত্র তেজরূপ মুখে, ধারণ করিয়া মীনরূপ চৈতন্য জ্ঞান বা প্রাণরূপে ভাসিতে থাকেন, অর্থাৎ প্রকাশ মাত্রে বর্ত্তমান থাকেন। মীনরূপ বলিবার কারণ, মৎস্য যেমন স্রোতের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ জ্যোতিভাব ভিন্নতাভাবের বিপরীত দিকেই গতি ঘটায়। এই ভাবে বেদ বা জ্ঞান রূপ প্রকাশের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ নিশ্চেষ্ট থাকে। এই তিন গুণই বেদনামে উক্ত হয়, এ কারণ বেদের আর একটি নাম ত্রয়ী অর্থাৎ ত্রিগুণময় প্রকাশ। জ্ঞান থাকিলেই সূক্ষ্মভাবে অজ্ঞানতা অর্থাৎ ভিন্নতাও থাকে। এজন্য ব্রহ্মকে ত্রিগুণাতীত বলা হয়। এই সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণ ও ভিন্নতা জ্ঞান লইয়াই চারিবেদের প্রকাশ, বা ইহাই সৃষ্টি প্রকাশের সহিত চারিবেদ নামে অভিহিত হয়। এ কারণ ব্রহ্ম লাভের জন্য বেদেরও অতীত অর্থাৎ সূক্ষ্ম অজ্ঞানরূপ দ্বৈতভাব ত্যাগ করা আবশ্যক।

ব্রহ্ম-গায়ত্রী।

যে গীত, তিন ভাবে প্রকাশ পায়, বা যে গীত গায়ককে পরিত্রাণ করে, তাহার নাম গায়ত্রী। এই গীত শব্দের যথার্থ ভাব, সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে বুঝা প্রয়োজন। যেমন একই শব্দ, উচ্চারণের তারতম্যে বহু শব্দ, বাক্য, রাগ, রাগিণী তাল, মান, সুর প্রকাশ হইয়া গায়ক ও শ্রোতাকে বিমোহিত করে, সেই প্রকার জ্যোতিঃস্বরূপ একই ব্রহ্ম, তিন গুণে, (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) প্রকাশ হইয়া জীব ও জগৎ উভয় রূপে মায়া মোহ দ্বারা

পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। যেমন শব্দের মধ্যে ওঁকার শব্দই মূল, সেইপ্রকার প্রকাশের মধ্যে সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশই মূল প্রকাশ। যেমন একই ওঁকার শব্দের মধ্যে অ, উ, ম, কাল বা হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত আছে, সেইপ্রকার একই সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণ বা চেতনার প্রকাশ, আস্বাদ ও দাহিকা শক্তি রহিয়াছে। যেমন ওঁকার শব্দের মধ্যে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয় ভাব আছে (অ, উ, ম, ও ওঁ), সেই প্রকার একই সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশের মধ্যে, ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবের প্রকাশ (চৈতন্য প্রকাশ বা জ্ঞান, জড়তা ও পুরুষ চৈতন্য জ্যোতিঃ ব্যক্তি) আছেন। ওঁকার যেমন ত্রিপদের সমষ্টি, সেইরূপ জ্যোতিঃ ব্যক্তিই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নি ব্রহ্মের প্রকাশের সমষ্টি। এবং যিনি এই তিন জ্যোতিঃকে এক জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। এই জন্য জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশের নাম গায়ত্রী অর্থাৎ এইভাবে যিনি জ্যোতিঃকে জানেন, জ্যোতিঃ-পুরুষ তাহার ত্রাণকর্ত্তা হন। এজন্য জ্যোতিঃস্বরূপের নাম গায়ত্রী রাখা হইয়াছে। এবং জ্যোতিই ব্রহ্মব্যক্তি ও বস্তু বলিয়া, জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্যময়ের নাম ব্রহ্ম-গায়ত্রী। এই ব্রহ্ম-গায়ত্রীকে শব্দ দ্বারা বুঝিবার অনুকূল শব্দ সকলের নামও, ব্রহ্ম-গায়ত্রী বলিয়া প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চৈতন্য পুরুষ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম-গায়ত্রী। একারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দ গায়ত্রীর ভাব গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্ম উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গায়ত্রীর শব্দ সকল, সাধকের নিকট ফলহীন মৃত বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। ইহাই ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অভিসম্পাতগ্রস্তাবস্থা। যখন সাধক, একই পরমাত্মাকে, তিন জ্যোতিঃরূপে, তিন গুণ ও সপ্ততত্ত্ব

বা অষ্ট প্রকৃতিরূপে অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, ও তারাগণ বা জীব এই অষ্টভাবে একই ব্যক্তি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবেন, তখন গায়ত্রীদেবী আভরণরূপ অভিসম্পাতমুক্ত হইয়া সাধককে মুক্ত করেন। ইহাই ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অভিসম্পাত মোচন জানিবেন। নচেৎ বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার প্রতি এ অভিসম্পাত নহে, এবং দ্বিতীয় কেহ নাই যে তাঁহাকে অভিসম্পাত করিবে। এ অভিসম্পাত বা অজ্ঞানতার প্রকাশ, জীবেরই স্বাভাবিক অজ্ঞানতা বা বন্ধন-ভাব।

অগ্নিজ্যোতিঃ, চন্দ্রমাজ্যোতিঃ, ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ এই তিন জাতীয় প্রকাশই, তিন গুণ, তিন লোক, উদারা, মুদারা ও তারা, এই তিন শব্দ ভেদ, এবং হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই তিন প্রকার শব্দের গতি। এই তিন ভাব, একের অন্তর্গত হইতে হইলেই একটি গোলাকার অবস্থা ঘটে। স্বরের মধ্যে, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, না থাকিলে, যেমন অচ্ছেদ্য স্বরের গতি ঘটে না, সেই প্রকার প্রকাশের তিন ভাব না থাকিলে, অখণ্ড প্রকাশাপ্রকাশভাব রক্ষা করিয়া, প্রকাশের ধারণা ঘটে না। স্বরের মধ্যে যেমন মুদারা হ্রস্ব, তারা দীর্ঘ ও উদারা প্লুত, সেইরূপ প্রকাশের মধ্যে চন্দ্রমা প্রকাশ হ্রস্ব, সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ দীর্ঘ এবং অগ্নিজ্যোতিঃ প্লুত। ক্রিয়াভাবে, তাপভাব হ্রস্ব, প্রকাশভাব দীর্ঘ ও জীবন বা চেতনাভাব প্লুত। উদারা স্বর যেমন উদারা মুদারা ও তারা তিন স্বরের একতা ও ভিন্নতা প্রকাশ রাখে, সেইরূপ অগ্নিজ্যোতিঃ অর্থাৎ চেতন বা জ্ঞান অগ্নি, চন্দ্রমাও সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশের ভিন্নতা ও একতা রক্ষা করিতেছেন। যেমন উদারাই বেগবতী হইয়া মুদারা ও তারা

স্বরে প্রকাশ পায়, সেইরূপ চেতন ক্ষুধাগ্নি, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং বৈশ্বানর অগ্নি, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ পাইয়া, জগৎরূপ গীতরূপে, জীবকে মোহিত করিতেছেন। যেমন তিন স্বরের মধ্যেই সপ্তস্বর রহিয়াছে, সেই প্রকার, তিনজাতীয় প্রকাশের মধ্যে, সপ্ত তত্ত্ব বর্ত্তমান। যেমন গীত সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন গীত ও রাগরাগিণীময় ও সর্ব্বপ্রকার আস্বাদরূপ অথচ সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন গীত ও রাগরাগিণীর অতীত, এক রস-স্বরূপ। সেই প্রকার ব্রহ্মগায়ত্রী, সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ও আস্বাদরূপ দেব-দেবীময় হইয়াও একই অমৃত-রস-স্বরূপ চৈতন্যপ্রকাশ। ইনি এক মাত্র হইয়াও বহু ভিন্ন ভিন্ন, নাম, রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাবে, প্রকাশ বোধ হন বলিয়াই, ইহার নাম গায়ত্রী রাখা হইয়াছে। আকাশই সর্ব্বপ্রকার ভেদভাব রক্ষা ও প্রকাশ রাখিয়াছে। অসংখ্যপ্রকার শব্দ এই আকাশেই বর্ত্তমান। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আকাশকে গ্রহণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ও সুর লাভ হয়। মন ইহাতে গ্রহণ করিলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অনুভব, এবং বুদ্ধির গ্রহণে ব্যক্তিভেদ অনুভব হয়। এজন্য আকাশ পদার্থই, গায়করূপ চেতন-ভেদ, রাগ-রাগিণী-রূপ ভাব-ভেদ ও সুর ও শব্দভেদ-রূপ ক্রিয়া-ভেদ ভাবে, গীতরূপে প্রকাশ হইতে জগৎ নামে প্রকাশমান। ইনি বস্তু জ্যোতিঃ। ইঁহাকে ধারণা করিলে, জীব ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ পান বলিয়াই, ইঁহার নাম গায়ত্রী। অর্থাৎ জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ হইতে গীতকারী জীবরূপ গায়ক জ্যোতির প্রসাদে মুক্ত হয় বলিয়াই, জ্যোতির নাম ব্রহ্ম-গায়ত্রী। অর্থাৎ জ্যোতিঃরূপে ব্রহ্মই জীবগণকে ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার করেন। যিনি সর্ব্ব বিষয়ের সহিত বিষয়ীকে একই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া দেখেন, তিনিই

গায়ত্রীর জাপক। এই ভাবে জ্যোতিঃকে, প্রত্যক্ষ করাই, গায়ত্রী জপ করা। জ্যোতিঃই ব্রহ্ম-গায়ত্রী, ইঁহা ব্যতীত অপর কেহ নাই, যিনি জীবকে মুক্তি বা শান্তি দিবেন বা গায়ত্রী হইবেন। এবং ইনিই সর্ব্ব জ্ঞানের মূল ও সর্ব্ব-জ্ঞান-রূপ বলিয়াই, ইঁহার নাম বেদ বা বেদমাতা। ইঁহার ধারণায় সর্ব্ব বেদরূপ জ্ঞান লাভ হয়। এজন্য গায়ত্রীর ধারণা বা গায়ত্রী পাঠে, বেদের ধারণা বা সর্ব্ব বেদ পাঠ হয়। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য যাহাতে বেদমাতা-রূপ গায়ত্রী মাতার উপাসনা দ্বারা জ্ঞানরূপে মুক্তস্বরূপ পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করেন। ব্যর্থ শব্দজালে জড়িত হইয়া পণ্ডশ্রমে অমূল্য জীবন অতিবাহিত করা অজ্ঞানেরই কার্য্য।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

গায়ত্রী-শাপোদ্ধার।

গায়ত্রী দেবীর প্রতি ব্রহ্মার, বশিষ্ঠের ও বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাত আছে এবং ঐ অভিসম্পাত মোচন না হইলে, গায়ত্রী দেবী সাধককে, উদ্ধার করিতে অপারক থাকেন। এইরূপ শাস্ত্রে লিখা আছে। ইহার যথার্থ ভাব এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক জগৎ-লীলা-রূপ গায়ত্রীকে, একই ব্রহ্মের, ত্রিগুণরূপে প্রকাশ বলিয়া না বুঝেন, ততক্ষণ জীবাত্মাতে ব্রহ্ম আস্বাদ লাভ হয় না। এবং যখন জীব একই পরমাত্মাকে কারণ, সূক্ষ্ম স্থূল বা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মক রূপে প্রকাশমান দেখিবেন, তখন ভক্তের অন্তরে ব্রহ্ম-আস্বাদ লাভ হইয়া, জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদে পূর্ণরূপে যাঁহা

তাহাই থাকেন। ইহাই সাধককে উদ্ধার করিবার সম্বন্ধে, গায়ত্রীর পক্ষে অক্ষমতা ও সক্ষমতা জানিবেন।

একই জ্যোতিঃ চেতনা, চন্দ্রমারূপে সংকল্প বিকল্প শক্তি দ্বারা জগৎ কল্পনা বা প্রকাশ বোধ করাইতেছেন। জগৎ চন্দ্রমারই প্রকাশ, অপর কিছুই নহে, এবং এই চন্দ্রমা-প্রকাশরূপে পরমাত্মাই প্রকাশ রহিয়াছেন, এই জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্মা অর্থাৎ উৎপত্তি-কারিণী রজঃ-শক্তি দ্বারা, জীবাত্মার যে বিমোহিত ভাব, তাহার পরিহার হয়। ইহাই গায়ত্রীর ব্রহ্মশাপ মোচনের প্রথা।

পরমাত্মা বিশিষ্ট অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টভাবে সূর্য্যনারায়ণরূপে প্রকাশ হইয়া, জীব-চক্ষে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইঁহারই নাম বশিষ্ঠ। ইনিই জীবাত্মা-রূপ রামচন্দ্রের গুরু। ইঁহার কৃপায় অহঙ্কাররূপ রাবণের বিনাশ হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ইঁহাকে চিনিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণময় চৈতন্য আনন্দভাব লাভে বঞ্চিত থাকেন। জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদে একই পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অগ্নিরূপে প্রকাশ থাকায় জগৎ গীত চলি-তেছে, ইহা জ্ঞাত হওয়াই বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক গায়ত্রীর শাপোদ্ধার। একই চৈতন্য জ্যোতির্ম্ময় সত্তাই জগৎরূপে, বহু ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমাত্মা বা সাধক স্বয়ংই একমাত্র আছেন, দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই, এই জ্ঞানই জীবের চিরমুক্তি। জীবাত্মাই আপনাকে ও জগৎকে ভিন্ন ভিন্ন বা বিশেষ বিশেষ করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন জীব আপনাকে বিশিষ্ট অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বোধ করেন, সেইরূপ জগৎ প্রেত্যেককেও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিতেছেন। এই ভিন্ন বোধই জীবাত্মার বন্ধনভাব। জীবাত্মার এই বন্ধন

সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির সহিত অভেদ অবস্থায় মোচন হয়। এই-রূপ অভেদাবস্থায়, জীবাত্মার বন্ধন মোচনই ব্রহ্মগায়ত্রীরূপ ব্রহ্ম-প্রকাশের প্রতি হইতে বশিষ্ঠের অভিসম্পাত মোচন।

পরমাত্মার তাপ ও রূপময় ভাবাপন্ন অগ্নিপ্রকাশই বিশ্বামিত্র। অর্থাৎ জাগতিক সর্ব্বপ্রকার রূপ অগ্নিব্রহ্মের। এবং অগ্নিব্রহ্মই তাপ ও রূপ-শক্তি দ্বারা সকল প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল রূপে চেতনা বস্তুকে, প্রকাশ বোধ ঘটাইতেছেন। এবং ইনিই জীবশরীরে ইন্দ্রিয় ও তাপরূপে সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুভব করিতেছেন। ইনিই জগৎভাব রক্ষা করিবার উপায় বলিয়াই, ইঁহার নাম বিশ্বামিত্র অর্থাৎ বিশ্বভাবের শত্রু ও বন্ধু। সমস্ত জগৎই এই অগ্নিব্রহ্মের রূপ, ইহা জ্ঞাত হওয়াই বিশ্বামিত্র-রূপ অগ্নিব্রহ্ম কর্ত্তৃক চেতনা-ভাবের আভরণ উদ্‌ঘাটন-রূপ অভিসম্পাতের মোচন।

জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই তিন ভাবের প্রকাশকে, ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎ রূপ গায়ত্রী, অভি-সম্পাতগ্রস্তরূপ, পরমাত্মা হইতে পৃথক ভাষেন বলিয়া সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। যাহাতে সাধক সর্ব্বরূপে, পরমাত্মাকেই দর্শন, মনন, ধ্যান, ধারণা করিয়া, একই পরমাত্মার বা আপনার উপস্থিতি অনুভবে সমর্থ হন, এবং ব্রহ্ম আছেন কি নাই বলিয়া না বুঝার জন্য নিরাশ হইয়া না পড়েন, সেইজন্য কৌশলে গায়ত্রীর অভিসম্পাত ও তাহার মোচন ভাবের বর্ণনা। বাস্তবিক পক্ষে গায়ত্রীর প্রতি অভিসম্পাত নহে। জীবাত্মারূপ গায়কের প্রতিই এই অজ্ঞানরূপ অভিসম্পাত রহিয়াছে। ভিন্ন জ্ঞানই অজ্ঞানের মূল। এই ভিন্ন ভাব পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র পরমাত্মার উপস্থিতি-

অনুভব করিতে পারিলেই, অজ্ঞান অভিসম্পাত মোচন হইয়া জীবাত্মা অভেদে পরমানন্দ থাকিবেন। ইহা বুঝাইবার জন্য অভিসম্পাতের বর্ণনা।

রঞ্জিত ও নিরঞ্জন।

যাহাতে কোন প্রকার চিহ্ন বা দাগ নাই অর্থাৎ যে বস্তুতে, একের অধিক ভাব প্রকাশ পায় না, তাহার নাম নিরঞ্জন। অর্থাৎ অঞ্জনরহিত বস্তু। এই নিরঞ্জন শব্দ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের প্রতিই ব্যবহার হইয়া থাকে। বিচারে দেখা যায় যে, এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সর্ব্বদা অসংখ্য চিত্রে চিত্রিত, তাহা নিরঞ্জন পরমেশ্বরেই নিত্য বর্ত্তমান। তথাপি পরমাত্মা নিরঞ্জন। এই নিরঞ্জন ভাব বুঝিতে হইলে, ইহাই বুঝা আবশ্যক যে, এক অখণ্ড ভাবে সর্ব্ব ভিন্ন, ভিন্ন, নাম, রূপ, গুণ, শক্তিতে, একমাত্র পরমাত্মাই নিত্য বিরাজমান। যে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ, গুণ, শক্তি বা ভাবের প্রতি লক্ষ্য হউক না কেন, উহা বাস্তব পক্ষে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন নাম, রূপ, গুণ, শক্তি, বা ভাব নহে। জীবে স্থান ও কালের ভেদ-কল্পনা আছে বলিয়াই, এইরূপ ভিন্নতা, ধারণায় হয়। জীবের ব্যষ্টি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ভাবই, এই স্থান ও কাল ধারণার মূল কারণ। এইজন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবে ক্ষুদ্র ভাব অর্থাৎ পৃথক্ আমিত্ব অহঙ্কার বর্ত্তমান, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরঞ্জন ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষ থাকেন। যাহা কিছু সময়ে ও স্থানে প্রকাশ অপ্রকাশ হইতেছে বলিয়া ধারণা করি, যদি উহা সর্ব্ব-কালে, সর্ব্বস্থানেই প্রকাশ আছে বলিয়া ধারণা হয়, অথবা সর্ব্ব-স্থানে সর্ব্বকালে আপন উপস্থিতি অনুভব করিয়া, স্থান-কালের

ভাব আপনাতেই অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে আপনাকেই সর্ব্ব রঙে রঞ্জিত অথচ নিরঞ্জন বলিয়াই বুঝিবেন।

এই যে বিশ্ব, যাহা ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদরূপে প্রকাশ, ইহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়াই ব্রহ্ম নিরঞ্জন। নচেৎ রঞ্জিত জগৎ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু বা প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিলে, ব্রহ্ম কখন নিরঞ্জন হইতে পারিতেন না। যেমন মনুষ্যের চক্ষে, অপর পদার্থই অঞ্জনরূপে শোভা পায়, সেইরূপ জগৎ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইলে, ইহা ব্রহ্মপ্রকাশকে ভিত্তি করতঃ প্রকাশ থাকিয়া, ব্রহ্মেরই অঞ্জন নামে অভিহিত হইত। এবং এমত অবস্থায় ব্রহ্মের নিরঞ্জন হওয়া অসম্ভব থাকিত। অতএব এই যে জগৎ, নানা নাম, রূপ, সংজ্ঞা, ইহা কি বস্তুতঃ কি নাম, রূপ, গুণ, শক্তি, ও ভাবে, ব্রহ্ম-বস্তুই বিরাজমান রহিয়াছেন, বলিয়াই ব্রহ্ম নিরঞ্জন। জীবের ক্ষুদ্র ভাবই স্থান, কাল, পাত্র, ভেদকে প্রকাশ রাখে বলিয়াই নিরঞ্জনেই, অঞ্জন-রূপ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, রূপ, গুণ, শক্তি, ও ভাবের আস্বাদ লাভ ঘটে। এ কারণ, এক-রস-স্বরূপ, নিরঞ্জন ভাবের উপলব্ধির জন্য, সাধকের পক্ষে স্থান, কাল, পাত্র ভেদ ত্যাগ করিয়া, একমাত্র ব্রহ্মের উপস্থিতি ধ্যান° ধারণার পদ্ধতি। এই স্থান, কাল, পাত্র ভেদ, ত্যাগ করিলেই সাধক, একমাত্র আপনিই অদ্বিতীয় যৎতৎ ভাবে বিরাজ থাকিবেন। সর্ব্বপ্রকার প্রকাশ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহ বা কিছুই নাই। এই ভাব বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মকে নিরঞ্জন বলিবার প্রয়োজন। নচেৎ ব্রহ্ম নাই, বা অনন্ত-শক্তি, রূপ গুণ, অপর পদার্থের বা অপর ব্যক্তিরই, ইহা বলিবার জন্য, পরমেশ্বরকে নিরঞ্জন বলা হয় নাই।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

পরমেশ্বর ও জীবের ব্যক্তিভাব।

ব্যক্তিভাব কল্পনার মধ্যে, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশধারণা অনিবার্য্য। যথায় ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ অভাব ধারণা, তথায় ব্যক্তিত্বের স্বীকার নাই। ক্রিয়াহীন ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব, বিচারে স্থান পায় না। এ কারণ কার্য্যই ইচ্ছার সহিত, ইচ্ছুক ব্যক্তির নির্দ্দেশক। যেখানে ক্রিয়া ও কর্ত্তাভাবের উপর লক্ষ্য হয়, সেইখানেই ব্যক্তির ধারণা ঘটে। এবং কর্ম্ম ক্রিয়ারই রূপ বলিয়া, কর্ত্তা বা ব্যক্তি ভাবেরও লক্ষ্যস্বরূপ। যেখানে ক্রিয়া বা কর্ম্ম নাই, সেখানে কর্ত্তা বা ব্যক্তি নাই। এজন্য যে ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয়-রহিত কেবল মাত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, সেভাবে, ব্যক্তির ইচ্ছা বা কর্ম্মভাব নাই। ইহা ব্রহ্মের যৎতৎ ভাব বা অবস্থা। যেখানে জীব জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিন ভাবের প্রতি লক্ষ্য আছে, সেইখানেই কি ব্রহ্মের কি জীবের ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও কর্ম্ম সমস্তই আছে বলিয়া ধরা প্রয়োজন। এইখানেই ব্রহ্মের পরমেশ্বর, পরমাত্মা প্রভৃতি ব্যক্তিভাব, কল্পনা করা হয়। এবং এই অবস্থায় ব্রহ্মের জীবগত ব্যক্তিভাব, পূর্ব্বেই স্বীকৃত বলিয়া বুঝা প্রয়োজন। কারণ জীব-ব্যক্তি, না থাকিলে, ব্রহ্মের ব্যক্তিভাব, কে কল্পনা করিবে। এখন দেখা যাইতেছে, ব্যক্তি-ভাবে, জীব ও ব্রহ্মের জাতিগত একতা সত্ত্বেও ক্রিয়াদির তারতম্য প্রত্যক্ষ। এখানে আর একটি বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝা প্রয়োজন যে, জীব অজ্ঞানতা বশতঃ আপনাকে, যেমন, কি অন্য জীব হইতে, কি ভগবান হইতে, পৃথক্ ব্যক্তিত্ব অঙ্গীকার করে, পরব্রহ্মও কি সেইরূপ অপর জীব হইতে আপনাকে পৃথক্ ব্যষ্টি

বলিয়া অনুভব করিতেছেন ? ইহা কথনই সম্ভব নহে। যিনি নিত্য এক রস-স্বরূপ নিরঞ্জন, চৈতন্যময়, তিনি কি প্রকারে নিজ স্বভাব বিস্মৃত হইবেন। জীবের ব্যক্তিত্ব, অপর জীব ও ব্রহ্মকে চক্ষের আড়াল করিয়া প্রকাশ। কিন্তু ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ যাহা কিছু আছে এবং যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিভাব প্রকাশ, সমস্তকে অন্তর্গত করিয়াই তাঁহার ব্যক্তিভাব বর্ত্তমান। যদিও ভক্তে পৃথক্ ব্যক্তি বোধ রাখিয়া (অর্থাৎ ভক্ত অন্তরে পার্থক্য রাখিয়া) তিনি ভক্তের নিকট পৃথক্ (অর্থাৎ ভক্ত ব্রহ্মকে, আপনা হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বোধ করিয়া থাকে) এইরূপ ভাবে প্রকাশ হন, কিন্তু তথাপি, তিনি আপনা হইতে ভক্তকে বাস্তব পক্ষে, কথন পর করিয়া দেন না, বা তাঁহার পক্ষে অপর বলিয়া কেহ ভিন্ন ব্যক্তিরও থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভক্তকে, ভক্তের অন্তরের ভাবের অনুযায়ী আস্বাদ দিবার জন্যই, এইরূপে পৃথক্ দর্শন দিয়া থাকেন। এজন্য তিনি পূর্ণরূপে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশ হইলে, ভক্ত আপনাকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপেই উপলব্ধি করেন। জীবের ব্যক্তিভাব অজ্ঞানময় বলিয়া, জীব, অপর বা অন্য ব্যক্তির কল্পনা রাখে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর জ্ঞানময়, একারণ, তাঁহাতে পৃথক্ ব্যক্তির কল্পনা অসম্ভব। এইজন্য গীতায় পাওয়া যায় যে, বিরাট্ ব্রহ্ম সকল লোক ও দেবদেবী, দৈত্যদানব, মনুষ্য, জীব, জন্তু, প্রভৃতিকে আপনার অন্তর্গত করিয়া অর্জ্জুনের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলেন। এবং আরও পাওয়া যায় যে, ভগবান একমাত্র পূর্ণ হইলেও অজ্ঞানবশতঃ জীব ফলাসক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে। কিন্তু ঐ উপাসনা অবিধিপূর্ব্বক পরমাত্মারই উপাসনা এবং পরমা-

আহ ঐ সকল উপাসকদিগকে ফল দান করেন। এখানে বুঝা প্রয়োজন যে, যদি ভগবান হইতে পৃথক্ দেবদেবী থাকিত বা ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বের অতিরিক্ত দেবদেবীর ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মের স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে, অপর দেবদেবীর পূজায় অবিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মের পূজা হইত না। এবং ঐ পূজার ফলাফলদাতা, অপর দেবদেবী না হইয়া, ব্রহ্মই ফলদাতা বলিয়া উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন হইত। ইহার যথার্থ ভাব এই যে, জীব অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দেবদেবী ও তাহাদের ক্ষমতা অঙ্গীকার করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষায় দেবদেবীর উপাসনা বা পূজা করিতেছেন, বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতীত অপর দেবদেবী পৃথক্ না থাকায়, উহা অবিধি-পূর্ব্বক ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়; এবং ফলাফল প্রকাশ হইলে, উহা পরমাত্মাই দয়া করিয়া ফল দান করিলেন, ইহাই বুঝা আবশ্যক। এবং দেবদেবীর বিষয় এইরূপ বুঝা আবশ্যক যে, ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকরী শক্তির নাম দেবী, এবং শক্তির সহিত তাঁহার চেতনাভাবের উপস্থিতি-ভাবের নাম দেবতা। ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব, জীবের ব্যক্তিত্বের ন্যায়, অজ্ঞানপূর্ণ ব্যষ্টিভাবাপন্ন হইলে, অপর দেবদেবী বা জীবের কর্ত্তৃত্ব বা তাহাদের পূজায়, কি বিধি-পূর্ব্বক, কি অবিধিপূর্ব্বক, কোন প্রকারেরই, ব্রহ্মের পূজা হইত না, বা কাহারও কার্য্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব থাকিত না। জীবের কর্ত্তৃ-ত্বের ও ভাবের ন্যায়, ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব বা ভাব, ক্ষুদ্র হইয়া পড়িত। অতএব জীবের ব্যক্তিত্ব ও ব্রহ্মের ব্যক্তিত্বের ঐক্যতা—জ্ঞানে সংস্থিত। অর্থাৎ ভগবান যে, জ্ঞানময়, সর্ব্বজ্ঞ, ইচ্ছাশক্তিযুক্ত, ইহা, কেবলমাত্র মনুষ্যকে বুঝাইবার জন্যই, ব্রহ্মব্যক্তিত্বের কথন। নচেৎ তিনি বিশেষণরহিত যাহা, তাহাই। তাঁহাতেই সর্ব্ব

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ আছে অথচ তিনি ব্যক্তিভাবেরও অতীত যৎতৎ।

সূর্য্যমণ্ডলে সর্ব্বলোকের ধ্যেয় দেবদেবীর অবস্থিতি, বর্ণনায় আছে। বিচার করিলে বুঝা যায়, উহার অর্থ একই পুরুষ পরমাত্মার, ভিন্ন ভিন্ন, রূপ, গুণ, শক্তির নাম দেবদেবী। এবং সূর্য্যনারায়ণই একমাত্র জ্যোতিঃপুরুষ পরমাত্মা বলিয়া, ইনি, সর্ব্বশক্তিমান বা সর্ব্বদেবদেবীময়। এই কারণেই সর্ব্বদেবদেবীর শরীর জ্যোতিঃপদার্থে ঘটিত বলিয়া উল্লেখ। এবং দেবদেবীরূপ সমস্ত শক্তি, পরমাত্মার বলিয়াই, সকলে পরমাত্মারই দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন কোন দেবদেবী নাই, যাহারা পরমাত্মার অধীনে কার্য্য করিবে বা পরমাত্মা যাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবেন। এবং পরমাত্মাও এরূপ অক্ষম নহেন, যে জন্য, তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আনন্দ আস্বাদের জন্য জীবের দৃষ্টিতে, ব্রহ্মব্যক্তিত্ব পৃথক্ রাখেন মাত্র বা বোধ হয়। নচেৎ ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব জীবের ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া পড়িলে, তাঁহার কর্তৃত্ব অপ্রতিহত থাকিত না। অতএব ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব, জীবের ব্যক্তিত্বের ন্যায় কাহাকেও পর রাখিয়া বর্ত্তমান নহেন। তাঁহাতে ব্যক্তিভাবও আছে, কেবল মাত্র তিনি অব্যক্ত বাক্য প্রকাশের অতীত, নহেন, তিনি সর্ব্বভাবেই ব্যক্ত, বাচ্য বা প্রকাশ রহিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তি, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও ক্রিয়া।

চেতনার ব্যক্ত বা মনযুক্ত অস্তিভাবের নাম, ব্যক্তিত্ব। সে প্রাপ্তি মনেই অবস্থান করে, তাহার নাম ইচ্ছাশক্তি। যে শক্তি মন হইতে প্রাপ্য পদার্থ বা ব্যক্তিকে ভিন্ন ভাবে রাখিয়া আকর্ষণ বিকর্ষণ রূপে প্রকাশ, তাহার নাম আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তি ও পদার্থের রূপ, গুণ, শক্তির পূর্ণ বিকাশ অবস্থা, অর্থাৎ কর্ত্তা ও কর্ম্মের পূর্ণ সম্মিলনাবস্থার নাম ক্রিয়া। ক্রিয়ার সহিত আকর্ষণ বিকর্ষণ রূপ গতিই চেষ্টাশক্তি। এই সকল শক্তি, ভাবে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, একমাত্র প্রকাশ পদার্থের স্থায়িত্বের তারতম্যে, ভিন্ন ভিন্ন নাম-করণ।

প্রকাশ-শক্তি, ব্যক্তি বা বস্তু-বোধক, অথবা ব্যক্তিরই ব্যক্ত অবস্থা। ভিন্নতা বা প্রকাশ অপ্রকাশ ব্যতীত, প্রকাশের অবস্থান, সম্ভবে না। অতএব ব্যক্তিত্বতে, বস্তুর, প্রকাশ অপ্রকাশ ও ভিন্নাভিন্ন উভয় ভাবই স্থিত আছে। এই ভিন্নাভিন্ন ভাবই আকাশ পদার্থ। অতএব আকাশই ব্যক্তির রূপ।

প্রাণ বা জ্ঞান-শক্তিই, প্রকাশকে জ্ঞাত হয়, এবং জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সূক্ষ্ম গতিভাবাপন্ন প্রকাশই, প্রাণ বা বায়ু-রূপ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, উভয়ে প্রকাশ থাকিয়া, সম্বন্ধে আসিলেই গতিভাব প্রকাশ হয়। গতি না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের ভিন্নতা জ্ঞান বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই ভাবের ভিন্নাস্থিত্য বোধ, হইত না। অতএব গতিরূপ প্রাণ বা বায়ুই ইচ্ছাশক্তি। যে প্রকাশ, অপর প্রকাশকে, আপনার সহিত অভেদ করিবার উপযুক্ত রূপে প্রকাশ হয়, তাহার নাম আকাঙ্ক্ষা। তাপ ও প্রকাশময়

অদ্বৈতভাব-রূপ অগ্নিব্রহ্মই, ইহার রূপ। কারণ তাপ স্থূলকে এবং অদ্বৈতপ্রকাশ সর্ব্বপ্রকার ভাবকে, আপনার সহিত অভেদ করিবার শক্তি।

আস্বাদ ব্যতীত, ত্যাগ, গ্রহণ, বা ভিন্নাভিন্নতা ভাব নাই। জল পদার্থই আস্বাদময়। অতএব আস্বাদ-রূপ জল পদার্থই আকাঙ্ক্ষা শক্তি। কারণ আকাঙ্ক্ষাই, ত্যাগ, গ্রহণ ও ভিন্নতা আস্বাদকে ভিত্তি করিয়াই প্রকাশ।

সত্তা ব্যতীত, শক্তির অস্তিত্ব নাই; এবং সত্তাভাব, স্থিরতাকেই নির্দ্দেশ করে। পৃথিবীই, সর্ব্বপ্রকার প্রকাশের স্থির শক্তি বা অবস্থা; এবং ক্রিয়া বা কর্ম্ম, প্রকাশের প্রকৃষ্ট স্থিরতা বা সমাপ্তি-কেই লক্ষ্য করায়। পৃথিবী-শক্তিই, অস্তিভাবের লক্ষ্যদাত্রী। অতএব পৃথিবী-শক্তিই ক্রিয়া বা কর্ম্মরূপা প্রকাশ।

চেতনাময় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাই একমাত্র আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন। এই এক ভাবের অবস্থানে, কোন প্রকার ধারণাই নাই; তাহার নামকরণ, কেমন করিয়া হইবে? জীব বিরাট-শক্তি হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব লাভ করিয়া, ঐ সকল ভাবের সূক্ষ্ম, স্থূল ভাব, সংক্রামণ করিবার জন্য, বাক্যে প্রকাশ করেন। বাক্য বা ভাষা, ভাবেরই নাম বা রূপ। যে বাক্য, ভাবের বিশেষ আস্বাদ দানে বিরত, উহা ভাষা বা বাক্য নামের অযোগ্য। বরং উহাকে আকাশের গুণস্বরূপ, শব্দমাত্র, বলা যাইতে পারে। অত-এব ভাষা বা বাক্যের দ্বারা, ভাবলাভের চেষ্টারই প্রয়োজন, নচেৎ শব্দ শিক্ষায়, বিশেষ কোন ফল নাই। যেমন একই শব্দ, কাহার নিকট শব্দমাত্র এবং কাহার নিকট ভাবরূপে প্রকাশ হয়, সেই প্রকার একই জ্যোতিঃব্রহ্ম ব্যবহারে আসিলে সাকার এবং

ব্যবহারাতীত থাকিলে নিরাকার সংজ্ঞাযুক্ত হয়। আর যখন জীবের প্রয়োজনানুসারে, তাঁহার ব্যবহারের ক্রম ধরিবার বা এক ভাবের গ্রহণ ও অপর ভাবের ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহার রূপ গুণকে, তাঁহার নিত্য ভাব হইতে, সরাইয়া নানাপ্রকার নাম নির্দ্দেশ করিতে হয় মাত্র।

অনেকের ধারণা যে, অনেক গুণ আছে, যাহা পঞ্চতত্ত্বের অতীত চেতন বস্তুর গুণ। ইহাদের সহিত যেন তত্ত্ব সকলের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু তাহা নহে। সর্ব্বপ্রকার রূপ, গুণ, শক্তিই, তত্ত্ব সকলের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, কোন না কোন অবস্থার মিশ্রণের তারতম্যে প্রকাশ হয়। নচেৎ তত্ত্বাতীত যৎতৎভাবে কিছুই বলিবার, শুনিবার, করিবার, করাইবার, হওয়া বা না হওয়া, প্রভৃতি কিছুই নাই। যাঁহারা তত্ত্বসকলকে বস্তু হইতে পৃথক্ অস্তিত্বযুক্ত মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষেই, বস্তুর ও তত্ত্বের, জড় ও চেতনার, সম্পর্করহিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, শক্তি, ভাব, ধরিবার প্রয়োজন হয়। নচেৎ একমাত্র যিনি আছেন, তাঁহাকেই, সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভব করা যায়, ইহা ধারণায় রাখিলে, কার্য্যের জন্য জড় চেতনার ভেদ রাখিয়াও জ্ঞানে সর্ব্বভেদের উপশম সম্ভব। এই ভাবে বুঝিতে পারিলে, অনির্দ্দেশ্য বস্তু হইতে, বস্তুর নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ারূপ জগৎভাবের প্রকাশেও যে, একই মাত্র ব্রহ্ম ব্যক্তির প্রকাশ বা উপস্থিতি রহিয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। একই ব্যক্তি কি অনির্দ্দেশ্য, কি নির্দ্দিষ্ট স্থূলাদপি স্থূল ভাবে আছেন, বলিয়াই, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও অনির্দ্দেশ্য ভাবের কথন; এবং চেতনময়ই জড়ভাবে প্রতীয়মান বলিয়াই, ভিন্ন ভিন্নতত্ত্ব, ব্যক্তি ও ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তির ভেদ বর্ণন। নচেৎ

নিত্য ভেদের, বর্ণনার কোন সম্ভাবনা বা প্রয়োজনও থাকিত না। যাহাতে মনুষ্য ভেদভাবকে অবলম্বন করিয়া, অভেদে স্থিত হইতে পারেন, তাহার জন্যই ভেদ-নির্ণয়ের ব্যবস্থা।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ব্রহ্মপ্রকাশ।

যিনি ব্যতীত অপর কেহই নাই, কে, কি হইয়া, তাঁহাকে কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে? যিনি স্থান-কাল-পাত্র-বর্জ্জিত, তাঁহার নির্ণয় কোথায়? তাঁহাতে অনির্দ্দেশ্য শব্দও, সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দেশকেই বুঝাইয়া দেয়। নিরঞ্জনের মধ্যেই, সর্ব্ব বর্ণ রহিয়াছে। অতীত বলিলেই, মধ্যগত বলাও স্থির। অব্যক্ত শব্দও, বাক্যের অন্তর্গত। নির্গুণেও গুণ, ও অসীমেও সীমা বর্ত্তমান। সর্ব্ব ভাব, সর্ব্ব বাক্য, সর্ব্ব জ্ঞান, এক কথায় সর্ব্বই তাঁহার নির্দ্দেশ, অথচ তিনি সর্ব্বাতীত, এবং সর্ব্বাতীতও নহেন, যাহা তাহাই।

সাধনার জন্যই, বর্ণনা ও নিষেধের প্রয়োজন। তাহাই তিনি, যাহাতে, আছে নাই প্রশ্নোত্তর বিশ্রাম লাভ করে। তিনি তাহাই, যাহাতে আপন পর নাই। তিনি তাহাতে, যাহাতে দেখা ন্যদেখা সমাপ্ত। তিনি তথায়, যথায় স্থান নাই। তিনি তথায়, যথায় সকলই আছে। তিনি বিচারের অন্তর্গত না হইলেও, তাঁহারই জন্য সর্ব্বপ্রকার বিচার।

বস্তু বিচারে দেখা যায় যে, বস্তু হইতে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রকাশ। একারণ বস্তুর ধারণায়, মন বুদ্ধি, জ্ঞান বিজ্ঞান, বস্তু-রূপে অবস্থান করিয়া আপন আপন শক্তি হারাইয়া ফেলে। অত-

এব বস্তু বা ব্রহ্ম, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞানের পরপারে, অবস্থিত। কিন্তু অপর দিক্ হইতে বিচার করিলে, দেখা যায় যে, কতকগুলি গুণের সহিত বস্তুকেই আমরা পদার্থ নামে অভিহিত করি। ব্রহ্ম শক্তিহীন, ইহা কাহারও অভিমত হওয়া সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে, বুঝা প্রয়োজন, শক্তিহীন ব্রহ্ম আছেন, ইহা কি প্রকারে জানিলেন। যদি ইহা শব্দ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বুঝা আবশ্যক যে, শব্দ আকাশ এবং ভাবার্থ জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জীবে জ্ঞান অস্তমিত হইলে, ভাবও থাকে না। অনুভূতি, শক্তিরই অন্তর্গত। এমন অবস্থায় শব্দ প্রামাণ্য হইলেও, জীব তাহার পূর্ব্বেই সপ্রমাণ হইবেন। জীব স্বগুণ। ভাবের ভিন্নতার জন্যই ভাষার প্রয়োগ। ভাব স্বয়ংই একটি গুণ। অতএব ভাবই শব্দ বা বাক্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। যে শব্দ ভাবকে জ্ঞাপন না করে, উহা কেবল মাত্র শব্দের আশ্রয়-স্থান আকাশ-পদার্থের নিদর্শক মাত্র হয়। আকাশ-পদার্থ সাকার। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যাইবে, আলোক-পদার্থই আকাশের রূপ। অপরিচ্ছিন্ন আলোকই মহাকাশ। এই মহাকাশই ভাবময় পদার্থ। এক আকাশই, শব্দ ও রূপের আধার অথবা শব্দ ও প্রকাশ-শক্তি, আকাশ-মূর্ত্তি। এ কারণ, ভাববর্জ্জিত শব্দের দ্বারা আকাশ-পদার্থই সপ্রমাণ হয়। ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ, আকাশকে নির্দ্দেশ করে না; বরং আকাশ হইতে ভিন্ন ভাবই জ্ঞাপন করে। অতএব, এই নাম বাচক শব্দ, শব্দের অধিকার না লইয়া, বরং ভাবের প্রতিই আধিপত্য করিতেছে। ভাব জীবের বিষয়। যে ভাব জীবে কখন প্রকাশ পায় না, উহার বিস্তার অসম্ভব। অতএব ব্রহ্ম ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দ, যাঁহার বাচ্য, তিনি কি প্রকারে ভাববর্জ্জিত হইবেন?

অতএব তিনি সর্ব্বপ্রকার বাচ্য হইয়াও বাক্যের দ্বারা শেষ হন না বলিয়াই বাক্যাতীত। সর্ব্বগুণ তাঁহার হইলেও গুণের নিরাকরণ অসম্ভব বলিয়াই নির্গুণ; এবং সকল আকারই তাঁহার বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট-আকার-রহিত, নিরাকার। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্।

কতকগুলি গুণ, একত্রে উপলব্ধি করিয়া, উহার নাম পদার্থ রাখা হইয়াছে। যথা—পৃথিবী, জল, অগ্নি ইত্যাদি। যদি ঐ সকল গুণ, ব্রহ্মের হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ থাকে না। আর যদি ঐ সকল গুণ পদার্থের হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের কোন একটি মাত্র গুণেরও প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। গুণ সকল, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির বিষয়। একত্রে কতকগুলি গুণ গ্রথিত হইলে, উহা কোন না কোন পদার্থরূপে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির গোচর হইবে নচেৎ গুণের অস্তিত্ব স্বীকার, এবং তাহার আধার ও আধেয়ের সহিত "খ"-পুষ্পের ন্যায় ব্যর্থ কল্পনা। এইরূপ কল্পনা বুদ্ধিকে কেবল মাত্র অন্ধ করে। অনস্তিত্বে, অস্তিত্বের ভাণ দেখায় মাত্র। অপর দিকে বিচার করিলে পাওয়া যাইবে যে, যে সকল গুণ পরব্রহ্মের বলিয়া ধারণা করা যায়, ঐ সকল গুণ, যে পদার্থ বা ব্যক্তি হইতে প্রকাশ পায়, উহা পরব্রহ্মেরই রূপ, ভাব বা অবস্থা অথবা পরব্রহ্মই স্বয়ং প্রকাশমান আছেন ধরিলে, জ্ঞানের কোন ব্যভিচার হয় না, বরং চরিতার্থতাই ঘটে। এইভাবে এইটি পরমাত্মা, ওটি পরমাত্মা নহেন ইহা বলিবার বা ভেদ-কল্পনার প্রয়োজন থাকে না এবং তাঁহার অনির্ব্বচনীয়ত্বের ভিত্তি, স্থির থাকিবার প্রতিবন্ধক তিরোহিত হয়।

যিনি অপরিবর্ত্তনীয় স্বতঃপ্রকাশ, তাঁহার পক্ষে, অপ্রকাশ

থাকা অসম্ভব। যথায় প্রকাশ অপ্রকাশ ও পরিবর্ত্তন অপরিবর্ত্তনীয় ভাব, সেখানে কেমন করিয়া নিত্যতা স্থান পাইবে? প্রকাশ স্থির নিত্য হইলেও, দ্রষ্টার শক্তির তারতম্যে, তাঁহাতে প্রকাশ অপ্রকাশ বোধ সম্ভবপর। অতএব পরমাত্মাকে, সর্ব্বশক্তিমান্ অপরিবর্ত্তনীয় স্বতঃপ্রকাশ জানিয়া সর্ব্ব ভাবাভাব, একমাত্র প্রকাশ-পদার্থের বা ব্রহ্মপ্রকাশের এইরূপ ধারণায়, সত্য ধারণা, প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ যাহা প্রকাশ নহে, উহার গুণ কল্পনা বা গুণকেও অপ্রকাশ ধারণা, ধারণাকারীর অন্তঃকরণের ব্যভিচার-প্রবৃত্তি মাত্র। অতএব যে ভাবেই পরমেশ্বরকে কেহ ধারণা করুন না কেন, ব্রহ্ম অপ্রকাশ অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন শক্তিহীন, ইহা কাহার অভিমত হইবে না। অপর পক্ষে, সর্ব্ব ভাব, রূপ, শক্তি, পদার্থ, সমস্তই প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান। এ কারণ কেবলমাত্র প্রকাশ-ভাবের ধারণায়, ব্রহ্ম-উপস্থিতিই ধারণা হয়। কারণ, প্রকাশের অভাব-চিন্তায় সর্ব্বপ্রকার ধারণাকেই, কেবল মাত্র নিষেধ করে; এবং নিষেধ-ভাব, ভাবের অভাব অনুধাবন করিতেও অক্ষম। ভাবই, অভাব ও ভাবের অনুভব দেয়। জ্ঞানহীন হইবার জন্য ব্রহ্মের উপাসনা নহে, বরং জ্ঞানময়ের সহিত, একই জ্ঞানরূপে প্রকাশ থাকিবার জন্যই, পরমাত্মার উপাসনা। পূর্ণ জ্ঞানই, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান বা অজ্ঞানের সংহরণকর্ত্তা; এবং প্রকাশেই সর্ব্ব জ্ঞান বর্ত্তমান। এই কারণেই ব্রহ্মকে স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া উপাসনার বিধি। বিধাতাই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য বলিয়াই, এ বিধিপালন প্রয়োজন।

শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম স্বতঃপ্রকাশ। সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, বা তাঁহার নিকট সূর্য্যের রশ্মি নাই;

চন্দ্রমা ও তারাগণের আলোকও নাই; বিদ্যুতের আলোক নাই, অগ্নির প্রকাশ তাঁহার নিকট, কি করিয়া থাকিবে বা প্রকাশ করিবে? বরং তাঁহারই প্রকাশে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে। এই বাক্যের যথার্থ ভাব অবগত না হইয়া, ভ্রান্ত মনুষ্য জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রকাশকে তুচ্ছ বোধে অবমাননা করিয়া পরমার্থভ্রষ্ট হইতেছেন। ইহার যথার্থ ভাব, ব্রহ্মই সর্ব্বভাবে প্রকাশ রহিয়াছেন। এই যে সমস্ত, প্রকাশ, ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অনুভূতি হয়, ইহারা বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ নহে; একই ব্রহ্মই প্রকাশমান আছেন। ইহাদের মধ্যে প্রকাশের যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা রূপ বলিয়া জীব বোধ করেন, এই ভিন্ন ভিন্ন ভাব, ব্রহ্মভাব নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মভাব এক এবং লোকে সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ তারা অগ্নি প্রভৃতি নাম দিয়া, যে প্রকাশাদি ভাবকে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা করে, উহাঁরা পরস্পরের সহিত অনৈক্য। এই অনৈক্যের কোন একটি মাত্র ভাব ব্রহ্মভাব হইলে, অপরভাব সকল, ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন, বস্তু ও ভাবযুক্ত হয়, এমন কি, উহা অব্রহ্ম হইয়া পড়ে; এবং কোন একটি অব্রহ্ম হইলে, ব্রহ্মও, অপূর্ণ হন। এইজন্য শাস্ত্রে ভিন্ন ভাব ত্যাগ করাইবার জন্য, বিরোধী ভাবের প্রকাশভাবকে ব্রহ্মভাব হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মভাব প্রকাশ হইলে, চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ তারা অগ্নি প্রভৃতি পৃথক্‌ভাবে থাকে না, অর্থাৎ সর্ব্বজাতীয় প্রকাশ, ব্রহ্মই প্রকাশ আছেন, এ অনুভূতি হয়; ইহা বুঝাইবার জন্য, ব্রহ্মপ্রকাশের নিকট, অপর কোন প্রকাশই উপস্থিত থাকে না, ইহাই বলা হইয়াছে। যেমন আমি আছি, এই ব্যক্তি-ভাবে, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি নাই, অথচ আমি ব্যক্তিই প্রকাশ হইয়া অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হই,

সেই প্রকার ব্রহ্মভাবে কিছুই নাই, অথচ ব্রহ্মই, সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ, অগ্নিরূপে প্রকাশ রহিয়াছেন। যেমন আত্মাই মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি রূপে প্রকাশ আছেন বলিয়াই অদ্বৈতজ্ঞান-প্রয়াসীর পক্ষে, আমি—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি নহি, এই ভাব ধারণার প্রয়োজন, সেইরূপ ব্রহ্মই চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিদ্যুৎ ও অগ্নিরূপে প্রকাশ থাকিয়া সকল প্রকার-কার্য্য করিতেছেন এবং ব্রহ্মপ্রকাশ, জীবের অনুভূতিতে এই সকল প্রকাশ হইতে যেন ভিন্ন আছে এইরূপ বোধ হইতেছে বলিয়াই, চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ ও অগ্নি জ্যোতিঃ বা প্রকাশ, ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না বা ইহা ব্রহ্ম নহেন, ইহা ব্রহ্ম নহেন, এরূপ বলিবার প্রয়োজন। নচেৎ প্রকাশ-পদার্থকে, ব্রহ্ম হইতে, ভিন্ন বা অতিরিক্ত বলিয়া ধারণা ঘটাইয়া প্রকাশের অবমাননা ও ব্রহ্মের সীমা নির্দ্ধারণের জন্য, এ উক্তি নহে। প্রকাশ-ভাব চেতনা এবং তাপ-ভাব জীবের ইন্দ্রিয় ও বিষয় রূপ। ইহাই লীলা-ক্ষেত্র, প্রকৃতি পুরুষ বা ভোগ্য ও ভোক্তা-রূপে প্রকাশ রহিয়াছেন। প্রকাশে, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ এই দুই ভাবই ব্রহ্মের রূপ। জ্যোতিঃর শরণাগত হইলে, জীবের শান্তি লাভ হয়। যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রকাশের অবমাননা, ততদিন পর্য্যন্ত জীবের নানাপ্রকার দুর্গতি। পরিত্রাণের জন্য, ব্রহ্মপ্রকাশের শরণাগত হইলে, ব্রহ্মেরই আশ্রয় লাভ ঘটে। নচেৎ অন্য উপায় নাই।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

———

ভাব ও পদার্থ।

যাহা মন বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, তাহার নাম ভাব, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলের স্থূল অংশকে পদার্থ বলিয়া বলা যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে বুঝা যাইবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশের এক একটী গুচ্ছের নাম পদার্থ এবং অখণ্ডের দিকে গতিযুক্ত ও অখণ্ডের দিকে বিস্তারমান, প্রকাশ বা বস্তুর তরঙ্গের নাম ভাব। একই বস্তু, বৃহৎ হইতে অংশের দিকে গতি বিশিষ্ট হইলে পদার্থ, এবং ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে গতি ঘটিলে ভাব নাম হয়।

যেমন আমাদের যে ইন্দ্রিয়, যে পদার্থে, বিশেষ করিয়া রঞ্জিত, সেই ইন্দ্রিয়, সেই পদার্থের ধারণায় সক্ষম হয়, সেইরূপ, জীব-ভাব ব্যষ্টি বলিয়াই, জীব, পূর্ণকে অপূর্ণ ভাবে আনিয়াই ধারণা করে। যেমন অগ্নির অন্তর্গত হইলে, অপর পদার্থও অগ্নিভাবে প্রকাশ হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্রভাবাপন্ন জীবে যাহা প্রকাশ হয়, তাহা ক্ষুদ্র বলিয়াই প্রতীতি ঘটে। যেমন আকাশ-পদার্থে, কোন পদার্থ আনিতে হইলে, তাহার বিস্তার হওয়াই স্বাভাবিক। সেইরূপ ব্যষ্টি জীব হইতে প্রকাশ পাইয়া বৃহৎ পরমাত্মার দিকে অন্তরের গতি হইলে, জীব একই অখণ্ডভাবময় হইয়া, ক্ষুদ্রত্ব হারাইয়া ফেলে।

বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমরা ক্ষুদ্র বলিয়াই, প্রকাশকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক এক বিভাগের ধারণার দ্বারা, বৃহৎ হইতে ভেদ-কল্পনার সহিত, পদার্থে ধারণা এবং মনের দ্বারা ভাবের বোধ বা বিভাগ অনুভূতি করি; নচেৎ আমাদের কোন অনুভূতি হয় না। অর্থাৎ যখন প্রকাশ-পদার্থ

বাহির হইতে মন, বুদ্ধিতে প্রকাশ হয়, তখন ঐ প্রকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবকে পদার্থ এবং তাহাকে আরও ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে আনিয়া, নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি বলি, এবং মন, বুদ্ধি হইতে, প্রকাশ হইয়া অহঙ্কার-রূপ ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে বিস্তার হইলে, তাহার নাম, ভাব বলিয়া বুঝিয়া থাকি। অখণ্ড প্রকাশে আমি ও অপর এই দুই তরঙ্গ থাকিলে, ভাব, এবং এই দুই তরঙ্গকে, মন, বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ করিলে, উহা পদার্থ ও নাম, রূপ, গুণে প্রকাশ পায়।

যে ভাব অপরের নিকট, আছি বলিয়া চেতনা ব্যক্ত করে, তাহার নাম ব্যক্তি-ভাব। এই ব্যক্তি-ভাবই সর্ব্ব ভাবের মূল। এই ব্যক্তি-ভাবই অপরকে অবলম্বন না করিয়া, আস্বাদময় ভাবে প্রকাশ হইলে, বস্তু বা চৈতন্য প্রকাশে, সূক্ষ্ম দ্বৈতজ্ঞানযুক্ত প্রকাশ ভাবরূপে অনুভূত হন; এবং কতকগুলি ভাব একত্রে ব্যক্তি-ভাবের সহিত উপস্থিত থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রতি লক্ষ্য হইবে; উহার এক এক ভাবের গুচ্ছ একই সময় একত্রে প্রতীয়-মান হইলে, কতক ভাব উজ্জ্বল প্রকাশ, আর কতকভাব মলিন ভাবে প্রকাশ, আর কতক অন্ধকারময় বোধ হয়। এই তিন ভাবের প্রকাশ একত্রে উপলব্ধি হইলে, ভাবযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পদার্থ নাম দেই।

অন্ধকারই অজ্ঞান। এজন্য যথায় অন্ধকার, তথায় মন প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। এই কারণ অন্ধত্ব নিবন্ধন, কেবল একমাত্র প্রকাশের প্রতি লক্ষ্যশূন্য হইয়া, একই প্রকাশ বা ভাবকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, ভাব, আস্বাদ ও পদার্থ প্রভৃতি বলিয়া মনে হয় মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রকাশই ভাব ও রূপ গুণ শক্তি ও পদার্থরূপে প্রতীয়মান। এই প্রকাশ কেবলমাত্র

অস্তিত্বের সহিত রূপগুণকে সীমাতে আনিলে পদার্থ এবং ভাব ও কর্তৃত্বাভিমানের দ্বারা বিচ্ছেদযুক্ত হইলে, চেতন-ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। একই প্রকাশ, ভাবেরভেদে, বহু প্রকাশ বলিয়া জীবের অন্তরে প্রতীয়মান হইতেছে। মূলে প্রকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নাই। যাহা আছে, একমাত্র প্রকাশই আছেন। ইহা দ্বৈতজ্ঞান-বর্জ্জিত হইলে, প্রকাশ বা অপ্রকাশ কিছুই বলিবার থাকে না। এই অবস্থা বা ভাব ব্রহ্ম বা বস্তু বলিয়া বর্ণিত হয়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ব্যবহার ও পরমার্থ।

বাহ্য জগৎ, অস্থির বলিয়া, জীবের স্থূল সূক্ষ্ম গতি বা তাহার জাগতিক কার্য্যের নাম, ব্যবহার এবং পরমাত্মা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে যে,ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সংযমাদি, তাহার নাম পরমার্থ বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমস্তই ব্যবহার বা পরমার্থই আছে। জীবের পক্ষে, যাহা কেবলমাত্র স্থূল শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ঘটে, তাহার নাম ব্যবহার এবং যাহা পরমেশ্বরকে বা স্বরূপ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া সাধিত হয়, তাহাই পরমার্থ। এই দুই প্রকার ভেদ ঘটে বলিয়াই, শরীরীতে তিন প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কেবলমাত্র ব্যবহার, দ্বিতীয় ব্যবহার ও পরমার্থ, তৃতীয় কেবলমাত্র পরমার্থ। যাঁহারা

কেবল মাত্র জড় জগতের বা স্বভাবের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে, কেবল মাত্র, ব্যবহার কার্য্যই আছে বলিয়া বোধ করেন। যাঁহারা জীব-চেতনার ন্যায়, জড়ের প্রতি, ব্রহ্ম-চেতনার আধিপত্য অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের ব্যবহার ও পরমার্থ; এবং যাঁহারা কেবল মাত্র ব্রহ্মেরই উপস্থিতি বুঝেন, তাঁহাদের পক্ষে, কেবল মাত্র পরমার্থই প্রত্যক্ষ হয়। যদিও এই পরমার্থকে, পরমার্থ বলিয়া পৃথক্‌ভাবে রাখিতে হয় না, কেবল অন্যের দৃষ্টিতে ও বাক্যে বলিবার জন্য, ঐ শব্দের প্রয়োগ। এই যে তিন প্রকার ভাব, ইহা স্বরূপতঃ ভেদরহিত, কিন্তু ভাবের মধ্যে, যথেষ্ট পার্থক্য এবং, ভাবই ক্রিয়ার উদ্বোধক বলিয়া, এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুক্ত শরীরীর দ্বারা, একই প্রকার কার্য্য প্রবাহিত হয় না। এইজন্যই একজন আত্মসুখ-চেষ্টায়, অপরের অহিত করিতে উন্মুখীন, আর এক জন অপরের কার্য্যে, আত্মবলিদানে সমর্থ হন। যদি ভাবের ভেদ সত্ত্বেও কার্য্যের বিভেদ না হইত, তাহা হইলে, জগতে সৎ শিক্ষার কোন প্রয়োজন থাকিত না। এই জন্য যে ভাষা, ব্যবহার, করিলে, জীবের অন্তরে সার্ব্বজনিক হিতাকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, তাহার জন্যই, সেইরূপ ভাষার ব্যবহার। এবং সত্যস্বরূপ একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, এই ভাব অন্তরে রাখিয়া কায়মনোবাক্যের ব্যবহারে, একমাত্র ব্রহ্ম উপস্থিতি ভাব, রক্ষা মঙ্গলপ্রদ। নচেৎ মঙ্গল-চেষ্টার ফলে, অমঙ্গল ঘটা অস্বাভাবিক নহে। পূর্ণরূপে ব্রহ্মের আস্বাদ লাভ না হইলেও, যদি কেহ সমস্তই ব্রহ্মই আছেন, এবং ব্রহ্মের সহিতই ব্যবহার করিতেছেন, যাঁহার ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে সৃষ্টি স্থিতি লয়, এবং যিনি ইচ্ছা করিলে সিদ্ধেরও সিদ্ধত্ব নিষ্ফল করিতে পারেন, এই জ্ঞান-ভাবাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা কদাচিৎ

জগতের অমঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য যাঁহাদের পক্ষে কেবল পরমাত্মাই বিরাজমান, তাঁহারাই কেবল মাত্র পরমার্থভাব ও ব্যবহারযুক্ত ব্যক্তি, ইহা বলিলেও ক্ষতি হয় না। আর যাঁহারা বাহ্য পদার্থের স্বীকারের সহিত, পরমাত্মাকে অধিষ্ঠাতা বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদ থাকে; এবং যাঁহারা কেবল মাত্র জড়ভাবাপন্ন জগতের অস্তিত্ব মাত্রই স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে কেবল মাত্র ব্যবহার কার্য্য হইতেছে। অতএব, জগতের মঙ্গল-লাভের সহায়-স্বরূপ প্রথমোক্ত অবস্থাপন্ন শরীরীর ভাব, আকাঙ্ক্ষণীয় ও শান্তি-বিস্তারের উপায় বলিলেও বলা যাইতে পারে। যাঁহাদের ইচ্ছা— জীবের হিত, তাঁহাদের পক্ষে, এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া বিচার পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যের ব্যবহার রক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে জগতের হিত হয়। নচেৎ জীবের অমঙ্গলের নিমিত্তক হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণ, কেবল মাত্র ব্রহ্মদৃষ্টিতে যাহা ঘটে, উহা পূর্ণ মাত্রায় পরমার্থ। উভয় দৃষ্টিতে উভয় এবং ব্যবহার দৃষ্টিতে বা পদার্থ রূপ গুণ শক্তি দৃষ্টিতে যাহা হয়, তাহা ব্যবহার মাত্র বুঝা প্রয়োজন। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

ব্রহ্ম-কৃপা।

অনিচ্ছায় দানপ্রাপ্তি, অত্যাচারের নিদর্শন। প্রার্থনীয় বিষয় লাভ, কৃপা-সাপেক্ষ। ব্রহ্মকৃপা সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝা আবশ্যক।

বাস্তবিক পক্ষে যাহা আমাদের দ্বারা কৃত হয়, তাহাও ব্রহ্মেরই কৃত কর্ম্ম। এই ভাবে ক্রিয়া ও কর্ম্মের উল্লেখ না করিলেও, ক্ষতি

নাই। যে ভাবে জীবের শক্তি পৃথক্ ভাবে ধরা হয়, সেই ভাবেই কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া ও শক্তির বর্ণনা। যে সকল শক্তি, জীব কর্তৃক অনায়াসে বা আয়াসের সহিত পরিচালিত হয়, তাহা জীবের শক্তি বলিয়াই উল্লেখ আছে। তাহার অতিরিক্ত শক্তি ব্রহ্মশক্তি নামে অভিহিত। এ কারণ যাহাতে জীব আপন সামর্থ্যের অকুলান দেখেন, তাহা ব্রহ্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। জীবের প্রার্থনীয় হইয়া, ঐ শক্তির প্রকাশ হইলে, উহা কৃপা সংজ্ঞা লাভ করে।

প্রাপ্তির ইচ্ছায়, অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার নাম প্রার্থনা। জীব সূক্ষ্ম, স্থূল বা ক্রিয়া-রূপে প্রকাশ। ইহাই বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়। এ কারণ প্রার্থনা পূর্ণ মাত্রায় করিতে হইলে, স্থূল সূক্ষ্ম উভয় ভাবেই কৃত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ প্রার্থনার নামই সাধনা। নচেৎ, অভীষ্ট লাভের শক্তি ব্যবহারের নাম সাধনা হইলে, সিদ্ধি—ব্রহ্ম-কৃপা-সাপেক্ষ, ইহা প্রকাশ রাখা নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা জীবের স্বাভাবিক লভ্য অবস্থার বহির্ভূত, যে প্রাপ্তি আদি, উহার জন্য যে ক্রিয়া, তাহা কার্য্য নির্ব্বাহের শক্তি নহে। উহা প্রার্থনারই অন্তর্গত। এই কারণ, কোন প্রকার আধ্যাত্মিক ক্রিয়াই, ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ নহে। ব্রহ্ম কৃপাই একমাত্র ব্রহ্ম প্রাপ্তির সহায় ও সম্বল। এ কারণ ব্রহ্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য, নিরহঙ্কার চিত্তে প্রীতি-ভক্তি-পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মের উপাসনাই প্রয়োজন। নচেৎ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল হয়।

এক দিকে, যাহাতে যে শক্তি ভগবান রাখেন নাই, তাহার ব্যবহার না হইলে, প্রার্থনার ত্রুটি নাই। অপর পক্ষে, যে শক্তি, জীবে বর্ত্তমান, উহা নিরস্ত রাখিলে, প্রার্থনার পূর্ণাবয়ব অপ্রাপ্তি

থাকে। এ কারণ ব্রহ্মলাভেচ্ছুক অন্ধের, স্থূল—রূপভাব ধারণা না হইলেও, প্রার্থনার খর্ব্বতা থাকে না। যথা—বধির, সদুপদেশ শ্রবণ ব্যতিরেকেও, ব্রহ্ম কৃপার অধিকারী হয়। ইন্দ্রিয়ই সকল প্রকার প্রার্থনার সহায়। যিনি যে ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, তাঁহার পক্ষে স্থূলে, সেই ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার না হইলেও, ভগবৎকৃপায়, সূক্ষ্মে সেই সকল ভাবের আস্বাদ, ব্রহ্ম আস্বাদের মধ্যে ক্ষুণ্ণতা নিবারণ করে। কারণ চেতনাই সর্ব্ব ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশমান এবং ভাবের সূক্ষ্ম অংশ বা আস্বাদ, সকলেরই মধ্যে একরূপ।

সূক্ষ্মে যাহা নাই, স্থূলে তাহার প্রকাশ অসম্ভব। প্রকাশ পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। এই প্রকাশই, তারতম্য-যুক্ত স্থূলের ভিন্নতা অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হন। এই স্থূলের ভেদত্যাগ করিলে, সূক্ষ্ম, সকলের মধ্যেই সমভাবে বর্ত্তমান। এই ভাবে, ভগবানই যে কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল বা চেতনা প্রকাশ, তেজো-রূপে অবস্থিতি করিতেছে ইহা সকলেই, বুঝিতে পারেন। চেতন প্রকাশ ব্যক্তিরূপ। জ্ঞান, ভাবময়। তেজ, ক্রিয়া-মূর্ত্তি। ব্যক্তিত্বের আস্বাদেই সাধকের তৃপ্তি। ব্যক্তিহীন অপর ভাবে, পদার্থাদি লাভের চরিতার্থতা এবং ক্রিয়া, স্থূলের পরিবর্ত্তন বা নামান্তর মাত্র। এই ব্যক্তি ভাব বা চেতনা, ভেদে বা অভেদে প্রকাশ পাইলেই কৃপার ও প্রার্থনার সার্থকতা। অন্তঃকরণই ইহার মূল উপকরণ। ইন্দ্রিয় তাহার ব্যবহার মাত্র। অতএব ব্রহ্মের আকাঙ্ক্ষায় মনবুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়ের যে ব্যবহার, তাহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত প্রার্থনা এবং এই প্রার্থনা পূরণ হওয়ার নাম ব্রহ্মকৃপা, বুঝা প্রয়োজন। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

দয়ায় নির্দ্দয়তা।

সাধারণতঃ লোকে মনে করিতে পারেন যে, পরমেশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্, এবং তিনি সকল জীবেরই হিতাকাঙ্ক্ষী, তখন যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিলেই ত সর্ব্ব জীব পরমানন্দে থাকিতে পারে, তবে কেন জীব পরমানন্দে বঞ্চিত ? কিন্তু বিচার করিলে বুঝা যায় যে, জীবের অভিপ্রেত ফলদান করা, তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। অথবা তোমামোদের সুখলাভের জন্য, দীর্ঘকালস্থায়ী প্রার্থনা বা কঠোর নিয়ম পালনান্তে, দয়া করিবারও প্রয়োজন নাই। তিনি নির্দ্দয় নহেন ; যাবৎ আমরা দয়া প্রাপ্তির উপযুক্ত না হই, তাবৎ তিনি দয়া করেন না বলিয়া অথবা প্রাপ্তির উপযুক্ত করিবার জন্য যে সময় ও যে ব্যবহারাদির আবশ্যক, তাহা ঘটাইয়া, পরে যথার্থ দয়া করেন বলিয়া, লোকে তাঁহার ভাব বুঝিতে অসমর্থ থাকায়, তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহ করিয়া থাকেন মাত্র। কিন্তু উহা গম্ভীর ও পক্ষপাতহীন বিচারে স্থান পায় না।

দুই একটি বিষয় বিচার করিলেই, ঈশ্বর ভাব অনেকাংশে বুঝা যাইবে। যদি একটি চিররুগ্ন লোক অমর হন, তবে অমরত্ব-দান তাঁহার পক্ষে, দয়ার পরিচায়ক, না নির্দ্দয়তার পরিচায়ক ? যদি রেলগাড়ীর পেষণে, এক ব্যক্তির সর্ব্ব শরীর চূর্ণ হইয়া যায়, আর তাহার প্রাণ, জ্ঞান ও ব্যক্তি চেতনার সহিত বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সে কি পরমেশ্বরের দয়া ভোগ করিবে, অথবা নির্দ্দয়তাই লাভ হইবে ? আর ও অনেক সময়, আমাদের ইচ্ছা হয়, ভবিষ্যৎ অবগত হই। কিন্তু যদি একবার ভাবিয়া দেখি যে, ভবিষ্যতে

যে সকল ঘটিবে, উহার সর্ব্ব বিষয় আমাদের রুচিকর না হইলে, যে কষ্ট পরে আসিবে, উহা জানিতে পারিলে কি, পূর্ব্ব হইতেই ঐ কষ্টের ভোগ আরম্ভ হইবে না? অথবা ভাবিয়া দেখুন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ই, স্বপ্নেও আপন স্ত্রী বা স্বামীর বিয়োগ বা ভার্য্যান্তর বা পত্যান্তর গ্রহণ দেখিতেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে ঐ ঘটনা হইবার থাকে, এবং উহা পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যক্ষের ন্যায় সত্য ধারণা হয়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে, উহা অবগত থাকা, সুখ কি দুঃখের বিষয়? অন্যান্য বিষয়ও যদি আমরা এই ভাবে বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলেও বুঝা যায় যে, এক সময় যাহাকে আমরা দয়া বলিয়া মনে করি, উহা সময়ান্তরে নির্দ্দয়তা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। দয়া চাহিবার সময়, সে বিষয়ের প্রাপ্তিতে, কৃতার্থ হইব মনে করিয়া থাকি বটে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চারিদিক্ বিশেষরূপে বিচার করিয়া দয়া প্রার্থনার প্রয়োজন; এবং প্রার্থিত দয়ালাভের উপযুক্ত হইতে হইলে শরীর ও মন বুদ্ধিকে দয়ালাভান্তে সহ্য হইবার উপযুক্ত করা আবশ্যক, যাহাতে দয়া লাভ করিয়া নির্দ্দয়তার ফলভোগ না ঘটে।

আমরা মনুষ্য। আমাদের বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, বিচারাদিও শরীরের ন্যায়, অতি ক্ষুদ্র। মহান্ অপেক্ষাও মহান্ যে পরমাত্মা, তাঁহার দয়ার সম্বন্ধে, কি করিয়া বুঝিতে সমর্থ হইব? তিনি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিলে তবেই বুঝা যায়। নচেৎ অসম্ভব। এ কারণ তাঁহাকে আপনাদিগের মাতা পিতা গুরু আত্মা বোধে, তাহার শরণাগত থাকিয়া, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই মুখাপেক্ষী হইয়া, তাহার প্রদত্ত অবস্থা ভক্তিপ্রীতিপূর্ব্বক অমৃত বোধে গ্রহণ

করিয়া, সর্ব্ব প্রকার দয়ার প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ দয়ার ব্যবহার, নির্দ্দয়তা বলিয়া ভোগ হইয়া থাকে। আরও দেখা যায় যে, অর্থলালসা, একজনের মধ্যে নিতান্ত প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। আবার স্থানান্তরে ঐ অর্থের অপব্যবহার হইতেছে মনে করিয়া দোষারোপও করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখেন যে, অর্থ প্রভৃতির ভোগ পূর্ণ মাত্রায় করিবার ইচ্ছায়, জীব সদসদ্ভাব ত্যাগ না করিয়া, কেবল মাত্র সদ্ব্যবহারে লাগাইলে, তাহার পক্ষে অর্থ ব্যবহারের কার্পণ্য থাকিয়া যায়। কারণ যে ব্যক্তি খরচ করিবার ইচ্ছায় অর্থআকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, তাহার পক্ষে সদসৎ সর্ব্ব প্রকারে খরচ করাই খরচ ভাবের ব্যবস্থা।' নচেৎ অর্থাদির সর্ব্ব প্রকার ব্যবহার হইল না; এবং কেবল মাত্র অর্থাদি রক্ষাও অর্থাদির ব্যবহার নহে। অথবা কতকগুলি রীতি অনুসারে অর্থের ব্যবহারেও অর্থের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। একারণ পূর্ণরূপে অর্থাদির ব্যবহার ইচ্ছার প্রতি দয়ার ব্যবহারেও নির্দ্দয়তা ফল লাভের আশঙ্কা অধিক। কারণ একই ব্যবহার স্থান কাল পাত্র ভেদেই সদসৎ ও সুখদুঃখকর হয়। নচেৎ কোন ব্যবহারই সৎ বা অসৎ নহে। অতএব সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই আশঙ্কা আছে বলিয়া নিরাসক্তভাবে পরমাত্মার শরণাগত হইবার বিধিই মঙ্গলপ্রদ

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

মূর্ত্তিপূজা।

সন্ধ্যা-বন্দনার মধ্যে মূর্ত্তিপূজার হতাদর নাই। বরং সূর্য্যমণ্ডলে ও মনুষ্য-শরীরের স্থানে স্থানে, মূর্ত্তি-কল্পনার নিয়ম রহিয়াছে। মূর্ত্তি—তত্ত্বকে আবশ্যক করে। আকাশ ও অগ্নিতত্ত্বের সাহায্য ব্যতীত, রূপ-কল্পনা অসম্ভব। তত্ত্বমাত্রেই, ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ভাব মনের, এবং চেতনা আত্মার অনুভূতি। এমত অবস্থায়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে লিপ্ত থাকিবার ব্যবহার, কি প্রকারে ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের উপাসনার সহায়তা করিবে? সাধারণতঃ, এরূপ মনে করা অযথা বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বিচার করিলে বুঝা যাইবে, মূর্ত্তি-কল্পনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নহে এবং তত্ত্বাতীত ভাবও ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। প্রকাশ ও আকারমাত্রেই আকাশতত্ত্ব এবং রূপ ও অবস্থান্তরভাবমাত্রেই, অগ্নিতত্ত্ব। দেবদেবীর কল্পনায়, আকার ও রূপ বর্ণিত। বিশেষ বিচার করিলে দেখা যায়, প্রথমতঃ ঐ রূপকেই চিন্ময় বলিয়া, বর্ণময়ভাবকে প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দেব দেবীর বহু আকার ধরিবার শক্তি আছে বলিয়া, শাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং কোন কোন শাস্ত্রে গুণ দেবতা বলিয়াও বর্ণিত। আরও পাওয়া যায় যে, নিরাকার ভাবে ইহাদের উপস্থিতি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। আবার অনেক শাস্ত্রে, দেবদেবী-দিগের পৃথক্ পৃথক্ স্থায়ী মূর্ত্তি ও স্থানের নির্দ্দিষ্টতার পোষকতার অভাব নাই। সে যাহাই হউক, সন্ধ্যাবন্দনার দেবদেবী, সূর্য্য-মণ্ডলে ও মনুষ্য-শরীরে অবস্থিত। সন্ধ্যাবন্দনাই বিশেষ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রহ্মোপাসনার বিধি। ব্রহ্ম অমূর্ত্ত হইলে, ইহাতে

মূর্ত্তির সহিত দেবদেবীর কল্পনার কি আবশ্যক, ইহাই বুঝিবার জন্য উপস্থিত বিচারের আবশ্যক।

প্রথমে বুঝা প্রয়োজন, যাহাকে জ্ঞানে পাওয়া যায় না, তাহার ধারণা কেমন করিয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ জীবশরীরে যে চেতনা পদার্থ আছে, তাহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করিতেছে বলিয়া ধারণা হয় না। মন, বুদ্ধি, আপনাকেই ভাবমাত্র বুঝিয়াই নিরস্ত। চিন্ময় বস্তুর গঠিত মূর্ত্তি কোথায় পাইবে? এই চিন্ময় বস্তুর ধারণার জন্যই, রূপ ও মূর্ত্তির কল্পনা। নচেৎ রূপ ও মূর্ত্তি ভাবের আশ্রয়ে, সত্য বস্তু বা ব্রহ্মের ধারণা হয় না।

মনুষ্য স্বভাবতঃ জীব-শরীরেই, চেতনার ভাব, উপলব্ধি করেন। যেখানে জীব-শরীর নাই, তথায় জড়ভাবই আধিপত্য করিতেছে। চেতনাই মূলবস্তু। ইহা ধারণায় আনিবার সহায়তার জন্যই, মূর্ত্তি ও ভাবের মধ্যে চিন্ময় ধারণার অভ্যাস; এবং প্রকাশ বা জ্যোতিঃপদার্থই চেতনা বলিয়া, সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে মহাশক্তি বা দেবীর বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার রীতি; এবং নিজ শরীরে শক্তিহীন দেবতা, যিনি প্রকাশে শক্তিরূপা, ইহা বুঝাইবার জন্যই দীপ্তি ধারণার নিয়ম। ইহার ফলে জ্যোতির দর্শন ও চেতনার ধারণা ঘটিবার আশা। এই আশার সফলতায় ব্রহ্ম বা আপন স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। এইজন্যই চিরঅভ্যস্ত মূর্ত্তিগত চেতনার ভাব চিন্তা করিবার বিধি। নচেৎ ব্রহ্ম বা সূর্য্য-নারায়ণ হইতে পৃথক্ দেবদেবীর অস্তিত্ব ও তাহাদের পশু বা খাদ্য হইবার জন্য, দেবদেবীর কল্পনা নহে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ, প্রাণরূপে শরীরে বিরাজ করিতেছেন; এবং ঐ প্রাণশক্তি, সৌর প্রকাশে, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে বর্ত্তমান। ইহা বুঝা অনায়াসসাধ্য

বলিয়াই, শিশু বুদ্ধির উপযুক্ত করিয়া, চৈতন্যময় জ্যোতির ধারণার উপায় এবং তেজ ও প্রকাশ শক্তি—জীবেরই রূপ বলিয়া, আত্ম-বোধের সম্পূর্ণ সহায়তা ঘটিবার আশায়, চক্ষে প্রকাশ দর্শনের বিধি। প্রকাশ বর্ণবর্জ্জিত ও বিস্তারগতীযুক্ত হইলেই ভাব, এবং বর্ণ ও সীমাকে অতিক্রম করিলেই, চেতনা ব্যক্তিরূপে বিরাজ করেন। এইজন্য প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে, আলোকময় ব্যক্তি চেতনার ধারণা অভ্যাস, শুদ্ধ চৈতন্যভাবে অবস্থিতি করিবার সহায় ও সম্বল। ব্রহ্ম পূর্ণ, অসীম বা যাহা তাহাই। তাঁহার ভাব মাত্র লাভে, জীবের চরিতার্থতা। সেই ভাবই সর্ব্বশান্তির আকর। এই আকরে মিশাইতে পারিলেই ত্রিতাপের নিবৃত্তি। এই ত্রিতাপ-নিবৃত্তির জন্যই, উপাসনা বা প্রার্থনা। সন্ধ্যাবন্দনায় যে মূর্ত্তির উপাসনা, ইহা মূর্ত্তির হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য। নচেৎ বারম্বার মূর্ত্তি ধরিয়া দুঃখভোগবুদ্ধির জন্য নহে।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

প্রতিমা উপাসনা।

জীবমাত্রের প্রতিমা, পরমেশ্বরেরই প্রতিমা। কারণ পরমাত্মা ব্যতীত অপর কেহ নাই। যাহারা শূদ্র অর্থাৎ বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারা নিজের ব্যবহারিক মঙ্গল করিতেও অক্ষম, অথচ পরমাত্মাতে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রীতিও হীন, এবং অন্তঃকরণ বিবেকশূন্য, লোভযুক্ত, তাহা-দের পক্ষে আকাঙ্ক্ষণীয় প্রভু, রাজা, বা রাজকর্ম্মচারী লাভ হইলে, তাঁহাদের দয়ায়, অজ্ঞান আলস্যপরায়ণ শূদ্রগণ সৎশিক্ষা ও সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলে, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে

এবং বুদ্ধিহীন, কুবুদ্ধির প্রশ্রয়ে জীবিতকালে যাহাতে কষ্ট না পায়, তাহা প্রভুগণ করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই শূদ্রগণের প্রতিমা উপাসনা, ব্রতপালনের মধ্যেই গণ্য। এবং ইহার ফল স্বর্গ বা সুখভোগ বলিয়া বর্ণিত। যাহারা পরমাত্মাকে বা জ্ঞান ও মুক্তিকে চাহে না, অথবা—জাগতিক জীবমাত্রের মঙ্গলের ইচ্ছা না রাখে, কেবল সুখভোগের প্রয়াসী, তাহাদের পক্ষে এ বিধি—নিতান্ত অবিধি নহে। কারণ পরমাত্মা, জীবরূপেই তাহাদিগকে, ঐ সকল সুখ, যথেষ্ট পরিমাণে দিতে পারেন। তবে প্রতিমা না গড়িয়া, প্রত্যক্ষ জীবন্ত জীবমূর্ত্তি বা রাজা, রাজকর্ম্মচারী বা প্রভুদিগকে পূজা, সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং তাঁহাদের উপদেশমত চলিলে সহস্র গুণ ফললাভের আশা অধিক থাকে।

ধাতুময় প্রতিমা বা বৃক্ষ লতা ঔষধিতে উপাসনায়, অপর একটি ফললাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। মনুষ্য, জীব ব্যতীত চেতনার ভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে সাধারণতঃ অক্ষম। স্থূল পদার্থে ব্যক্তির উপস্থিতি, এই ভাব ধারণা করিতে অভ্যাস করিবার চেষ্টায়, ক্রমে বিরাটে চেতনার ভাব জানিবার সম্ভাবনা আছে; এবং ক্রমে সর্ব্বরূপে একই চেতনা পদার্থের অস্তিত্ব ধারণার সুবিধা হইতে পারে। এজন্য জ্যোতিঃস্বরূপ চেতনময় পরমাত্মা হইতে বিমুখীন অজ্ঞান-ব্যক্তিদিগের পক্ষে, স্থূল পদার্থে চেতনাব্যক্তির উপস্থিতি ধারণার চেষ্টায়, সত্য ধারণার সম্বন্ধে কিছু সুবিধা হইবার আশা। কিন্তু এরূপ উপাসনার সহিত সত্য-বিষয়ক উপদেশ না থাকিলে, অচেতনভাবকেই চেতনভাব বলিয়া ধারণায় রাখিলে, চৈতন্যময় আত্মার জড়াবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, শাস্ত্রে প্রতিমায় চেতনার আবির্ভাব তিরোভাব হয় এবং প্রতিমাই যে

দেবদেবী নহেন, দেবদেবী সূর্য্যমণ্ডল হইতে আসিয়া পূজা গ্রহণান্তর প্রত্যাগমন করেন, এইরূপ ভাবের উপদেশ রক্ষা; এবং এই উপাসনা অধমাধম উপাসনা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। ইহার কারণ, যাহাতে অজ্ঞান-গণ, ইহাকেই প্রকৃত উপাসনা মনে করিয়া, শ্রেষ্ঠ উপাসনায় দোষারোপ করিয়া সত্যভ্রষ্ট না হয়, তাহার জন্যই উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব ভাব রক্ষা।

বিশেষ করিয়া বিচার করিলে, দেখিবেন, জ্যোতিঃপদার্থের অন্বেষণের জন্যই, প্রতিমার উপাসনা, নচেৎ প্রতিমা বা প্রতিমার স্থূল পদার্থের প্রতি অনুরক্ত হইয়া জড়ত্ব লাভের জন্য উপাসনা নহে। জ্যোতিঃই একমাত্র অনুরাগের পদার্থ। এজন্য প্রতিমা সকলকে চাক্‌চিক্য ও নানা ভাবের দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। এই চিক্কণতা না থাকিলে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনও, ইহাকে কখনই মৃত পদার্থ হইতে অধিক সম্মান দিত না। জ্যোতিঃ বা প্রকাশ পদার্থই চেতনা, এ কারণ যতক্ষণ জীব-শরীরে চাকচিক্য থাকে, ততক্ষণ জীব-শরীরে চেতন-ব্যক্তির উপস্থিতি জ্ঞাপন রাখায়, জীব-শরীরের সম্মান রাখিতে, জীব বাধ্য থাকে। এই চাক্‌চিক্যের অভাব ঘটিলেই, জীব-শরীরই মৃত শব এবং জীবের পরিত্যক্ত ও হতাদৃত হয়। এমত অবস্থায়, কেমন করিয়া মৃন্ময় বা ধাতব প্রতিমা আদি, বাস্তবিক পক্ষে চেতন ব্যক্তি বলিয়া জীবের আদরণীয় হইবে? আলোক বা প্রকাশ পদার্থই যে চেতনা এবং এই আলোকই যে সম্মানের বস্তু, ইহা বারংবার মৃত ও জীবিত ব্যক্তির শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিলেও, কিছু কিছু ভাব প্রত্যক্ষ হইবে। এই প্রকাশ পদার্থকে চিনিবার জন্য, হিন্দু শাস্ত্রে, শ্মশানে যোগ-সাধনার পদ্ধতি। যাহাতে মনুষ্য তেজ ও প্রকাশের ক্রিয়া ও উপস্থিতিভাব অবগত হইয়া, তেজোময় প্রকাশের শরণাগত হইয়া,

সর্ব্বসিদ্ধিরূপ পরমেশ্বরে উপস্থিত হন, ইহাই সর্ব্বপ্রকার উপাসনার মূল উদ্দেশ্য। অতএব হে মনুষ্যকুল, আঁপনারা নিরভিমান চিত্তে, আপনস্বরূপ যে প্রকাশ পদার্থ চেতনময়, ইঁহাকে চিনিয়া ইঁহার সংসর্গে, পরমাত্মারই আস্বাদ লাভের ইচ্ছা করুন। ব্যর্থ আড়ম্বর করিয়া আপন মাতাপিতার অবমাননাপূর্ব্বক হৃদয় ও জগতকে কলুষিত করিবেন না। এই প্রকাশই অবতার, ঋষি, মুনি, রাজা, বাদশাহ, শূরবীর, পণ্ডিত প্রভৃতি। ভাল করিয় বুঝিলেই দেখিবেন যে, আপনারা প্রকৃতপক্ষে, আলোক পদার্থকেই সম্মান করিতেছেন; অথচ ইহা না বুঝিয়া, আলোকের অবমাননার চেষ্টায় আপনা-দিগেরই অবমাননার প্রশ্রয় দিয়া আপনারাই ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে ম্রিয়মাণ রহিয়াছেন। যতক্ষণ নিজে আলোকরূপে শরীরে প্রকাশ আছেন, ততক্ষণ আলোক পদার্থকে চিনিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, শরীরে আলোকের অপ্রকাশে, কে আর কাহাকে চিনিয়া সম্মান রাখিয়া আনন্দভোগ করিবে?

উপাসনার বিষয় সকল, শান্তভাবে বিচারপূর্ব্বক কৃত হইলে, দুঃখের সম্ভাবনা অল্প। অতএব বিচার করিয়া দেখুন, স্থূল-মূর্ত্তি, স্থূলেই নির্ম্মিত; সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ভাবের দ্বারা গঠিত হয় এবং কারণ-মূর্ত্তি চেতনা বা ব্যক্তি আস্বাদমাত্র। যদি ভাব বা আস্বাদ লাভের জন্য মূর্ত্তি-কল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা জ্যোতিঃ বা চেতনা পদার্থের নির্ম্মিত মূর্ত্তিভাব চিন্তনের প্রয়োজন। কারণ চেতনা বা জীবন্তভাব-হীন মূর্ত্তি, মনবুদ্ধিকে জড়ত্ব ঘটাইয়াই থাকে; এবং জড়তা, আপ্ত প্রকাশের বিরোধী বলিয়া, ব্রহ্মলাভের প্রতি-বন্ধক হয়।

ব্রহ্ম পূর্ণ। যাহা কিছু আছে, ব্রহ্মই আছেন। কিন্তু ভাবের

দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভাব ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, সর্ব্বভাবই ব্রহ্মভাব নহে; এবং এই ব্রহ্মভাব লাভ না হইলে, সমস্ত ব্রহ্ম কি ব্রহ্ম নহেন, এ জ্ঞান বা অনুভূতি হয় না। অতএব যাহার দ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ হয়, তাহাই উপাসনার প্রশস্ত উপায়; এবং ইহার যাহা বিরোধী, তাহাই সত্যলাভের প্রতিবন্ধকের কারণ ও পরিত্যাজ্য। সর্ব্বজীবের স্থূল শরীরই পরমাত্মার শরীর; এবং জীবন্ত শরীরে, পরমাত্মার চেতনা বা জীবন্তভাব লাভেরও সহায়তা অধিক আছে। এমত অবস্থায় যাঁহাদের প্রতিমা উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি, তাঁহাদের পক্ষে, পরমাত্মা আপন ইচ্ছামত, যে জীবপ্রতিমারূপে প্রকাশ হইয়া, তাহাতে চেতনভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা উদ্দেশ্যে, তাঁহার ঐ জীবপ্রতিমার উপাসনা করা, ধাতু আদির নির্ম্মিত প্রতিমার উপাসনা করা অপেক্ষা, অধিক ফলদায়ী হয়; এবং কালক্রমে এই ভাবের উপাসনায়, চেতনার প্রতি নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া, শুদ্ধ চৈতন্য আনন্দময় পরমাত্মার উপাসনা করিবার শক্তি জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সমস্ত জীব-প্রতিমাই পরমেশ্বরের প্রতিমা; এবং যাহাতে পরমাত্মা জ্ঞানে, প্রত্যেকে প্রত্যেক জীবের মঙ্গল-চেষ্টায় ও সেবায় রত থাকেন, তাহারই জন্য, প্রতিমা উপাসনা বলিয়া নাম রাখা হইয়াছে; এবং চেতন জীবমাত্রের সেবা করাই, যথার্থতঃ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ চেতনাশক্তির অংশরূপ দেব-দেবীর প্রতিমার উপাসনা বুঝা আবশ্যক।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

গায়ত্রীত্যাগে সন্ন্যাস।

(২৬৬)

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর গায়ত্রীত্যাগের প্রথা শ্রুতি-গোচর হয়। এই গায়ত্রী-ত্যাগের যথার্থ ভাব অবগত না হইয়া, অহঙ্কার-পরবশ সাধক, মহাশক্তির অবমাননা করিয়া নিরন্তর কষ্টভোগ করিতেছেন। সত্য ভাব অবগত হইয়া, সত্যের সম্মানে শান্তির উদয় হয়। এজন্য এ বিষয়ের সত্যাসত্য, বিশেষরূপ বিচার্য্য।

প্রথমে বুঝা প্রয়োজন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রী পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি, কিম্বা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু? বস্তুর দ্বিতীয়ত্ব, অজ্ঞান ব্যতীত গ্রহণীয় নহে। কারণ, যাহা আছে মাত্র বলিবার বিষয়, অথবা যাহা মন-বাণীর অতীত বস্তু, তাহার সম্বন্ধে একের অধিক সংখ্যা কি প্রকারে অনুভব বা অনুমান হইবে, বা বিচারে পাওয়া যাইবে? অতএব ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রী বস্তুভাবে পৃথক্ নহেন। যদি ব্যক্তিভাবে ভিন্ন ভিন্ন হন, তাহা হইলে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রী উভয়ই ব্যষ্টি এবং ইঁহাদের রূপ গুণ, ক্রিয়া, শক্তি, পৃথক্ পৃথক্ হইবে। একের কার্য্যে, অপরের কোন অধিকার থাকিবে না। কারণ, উভয়কেই বস্তু হইতে স্বতঃপ্রকাশ ধরিতে হইবে। আর যদি ব্রহ্মগায়ত্রী ব্রহ্মেরই প্রকাশ হন, তাহা হইলে গায়ত্রীর ত্যাগে, ব্রহ্মকেই ত্যাগ করা হয় বা গায়ত্রীর অবমাননায় ব্রহ্মেরই অবমাননা। ব্যক্তিভাব, শক্তির অভিমানের উপরেই নির্ভর করে। কোন শক্তির অভিমান ব্রহ্মে, আর কোন শক্তির অভিমান, ব্রহ্মগায়ত্রীতে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া বলিতে হইবে। যদি সর্ব্বপ্রকার সৎশক্তি ব্রহ্মের, আর অসৎশক্তি গায়ত্রীর হয়, তাহা হইলে বুঝা প্রয়োজন যে, যেবস্তু

হইতে এই সদসতের অভিমানীর প্রকাশ, সেই বস্তু হইতেই জীবও প্রকাশ। কিন্তু ভাবে ভিন্ন হইলেও বস্তুভাবে সকলই এক। এই এক বস্তুতে সৎ অসৎ উভয়ই আছে। যাহা এক সময় সৎ বলিয়া প্রকাশ,—ইহা অপর সময় অসদ্‌ভাবে প্রকাশ না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি পরিবর্ত্তন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে জীবভাবই যখন সৎ অসৎ উভয়রূপ, তখন জীব নিজের এক অংশ কেমন করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাবান্তরে বর্ত্তমান থাকিবেন; এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রীর, ব্যক্তিগত ভেদ থাকায়, যদি ইঁহাদের কোন কালে পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে জীবও ইঁহাদের হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া জীবত্ব হইতে কেমন করিয়া, ব্রহ্মত্বে পরিবর্ত্তন ঘটিবে? এইরূপ বিচার দ্বারা দেখা যায় যে, গায়ত্রী ত্যাগ বাস্তবপক্ষে অভিমানমাত্র। কারণ: যিনি আছেন বলিয়াই সমস্ত রহিয়াছে বা যিনিই সমস্ত, তাঁহাকে কে, কি প্রকারে, ত্যাগ করিবে?

বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ব্রহ্মগায়ত্রী নাই। ব্রহ্মেরই জগৎভাবে প্রকাশ থাকার নাম ব্রহ্মগায়ত্রী। সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণই জগৎ বা ব্রহ্মের তিন জাতীয় শরীর; অর্থাৎ কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল ভাব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত, এই তিন ভাব, জীবে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ স্বরূপ বা এক রসাস্বাদরূপ অপরিবর্ত্তনীয় ভাব অপ্রকাশ থাকে। অতএব একমাত্র অমৃতরসস্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয় ভাব জীবে যতক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ ব্রহ্মভাব বা স্বরূপভাব প্রচ্ছন্ন থাকায়, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিই প্রকাশ হয়। এই কারণ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন জগৎনামক ভাব ত্যাগ করিয়া, এক ভাবে অবস্থান করিবার জন্যই গায়ত্রী অর্থাৎ গুণময় ভাব ত্যাগ

করিবার রীতি। বাস্তবিক গুণ বলিয়া বস্তু হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। বস্তুরই প্রকাশের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, রূপ, গুণ, ক্রিয়া, বোধ হয় মাত্র। এই ভিন্ন ভিন্ন বহু রূপ, গুণ, শক্তি, ক্রিয়ার, ভিন্ন অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ভাব মন হইতে ত্যাগ করাই গায়ত্রী ত্যাগ। নচেৎ গায়ত্রী ত্যাগ অসম্ভব; এবং গায়ত্রী ত্যাগের চেষ্টায় কষ্ট ও অশান্তির বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

দেহ রহিয়াছে, অথচ "দেহী নহি" এরূপ বলা আর না বলা, উভয়ই সমান। যতক্ষণ জীব দেহে রহিয়াছেন, ততক্ষণ দেহীর ভোগাভোগ ঘটিবে; এবং দেহী বলিলেও, দেহে ও দেহী না বলিলেও দেহেই অবস্থান করা স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে দেহী না হইলে, আমি দেহী নহি, ইহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? দেহী সংস্কার জীবাত্মারই ভাব এবং বিদেহ ভাবও জীবাত্মার। যতক্ষণ এই উভয় ভাব একত্রে জীবে প্রকাশ না থাকে, ততক্ষণ জীব আপনাকে দেহেই আবদ্ধ অনুভব করেন। এই বন্ধন নিবন্ধন, কষ্টকে অপসারিত করিবার জন্য, আমি দেহী বা আমি দেহী নহি এইরূপ ব্যর্থ চীৎকার। কষ্টের উপশমের জন্যই ব্রহ্মোপাসনায়, ব্রহ্মপ্রসাদে দেহী ও বিদেহীর ভাব অবগত হইয়া, বন্ধনমুক্তির পরপারে যাইয়া, এক সত্য ভাবে জাগরিত হইবার উদ্দেশ্য। দেহ, দেহী ও বিদেহ, বিদেহী ভাব, একই ব্রহ্মে উপশম করিবার জন্য গায়ত্রী-রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব ত্যাগ করিয়া, স্বয়ংই এক মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভাবে অবস্থান করিবার প্রয়াসে, গায়ত্রী ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। দেহী, বিদেহী ও দেহ ও দেহাতীত ভাব, গায়ত্রী ও ব্রহ্ম, পৃথক্ পৃথক্ বহু আছেন, এইরূপ নানা ভিন্ন ভাব, একই বস্তু ও ব্যক্তিরই উপস্থিতি মাত্র, এই জ্ঞানই, যথার্থ সন্ন্যাস অবস্থা।

কারণ এই জ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টিভাব-রূপ গায়ত্রীকে ত্যাগ করায়। নচেৎ মস্তক মুণ্ডন করিয়া গায়ত্রী উপাসনাদি বা সৎকার্য্য ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস হয় না। সর্ব্ব পদার্থ রূপ, গুণ, ক্রিয়া, একই অপরিবর্ত্তনীয় যাহা তাহাই, এই ভাব লাভ হইলে, সাধক আপনাকে অবিনাশী দেহবর্জ্জিত চিদানন্দস্বরূপ অনুভব করেন। ইহাই দেহাভিমান ত্যাগ বা প্রকৃত সন্ন্যাস অবস্থা।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

সন্ন্যাসীর অগ্নিত্যাগ।

অগ্নি-ব্রহ্মই, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিশেষ রূপ। এই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ত্যাগ করা অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভেদে প্রকাশ থাকাই অগ্নিত্যাগ। নচেৎ ব্যবহারীর অগ্নিকে ত্যাগ করিয়া, কখন কোন কার্য্য হইতে পারে না; এমন কি, সন্ন্যাসী, আপনাকেও সন্ন্যাসী বলিয়া, প্রকাশ বা অনুভব করিতেও অক্ষম হন।

ভগবান্ স্বভাবতঃ অগ্নিরূপে প্রকাশ হইয়া, একভাবের বিনাশ ও অপর ভাবের প্রকাশ করিতেছেন। অগ্নি-ব্রহ্মই স্থূল অন্নরূপ হইতে, শরীর ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ পান। তাপ ভাবই, ইন্দ্রিয়, এইজন্য মনুষ্যকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য, দেহে তাপের সঞ্চার করিবার চেষ্টা। এই তাপ শরীরে থাকিলে আত্মা, সহজে নির্ব্বাণ হইতে পারেন না। কিন্তু তাপ-রক্ষা-শক্তি, শরীরে না থাকিলে, বারংবার তাপ প্রয়োগ করিলেও, উহা দ্বারা তাপ রক্ষা না হইয়া কেবল আত্মার প্রতি কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র। কারণ

তাপকে স্থূল শরীর কখনই বন্ধন দিতে পারে না। তাপ-ধারণ-শক্তি, চেতনাতেই অবস্থিতি করে। এই তাপই প্রকাশ ও আত্মারূপে প্রকাশ হয়; এবং তাপকে খর্ব্ব করিয়া প্রকাশ থাকিতে পারিলে, চেতনার প্রকাশ, অনুভবে আইসে। এইজন্য, অগ্নি বা তাপকে কমাইলে, ইন্দ্রিয়ভাবের প্রকাশ শান্ত হইয়া, আত্মার প্রকাশ হয়, এইভাব বিকাশ করিবার চেষ্টার নামই অগ্নি-ত্যাগ। প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া দ্বারা, শরীরের তাপকে কমাইয়া আসক্তি বা ইন্দ্রিয়ভাবকে ত্যাগ করিলে, আপনাকে শরীরাতীত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। এই জন্যই সন্ন্যাসী অর্থাৎ শরীরাতীত ভাবাপন্ন হইবার জন্য, অগ্নিত্যাগের ব্যবস্থা। ইহা অভ্যাস রাখিলে শরীরত্যাগের সময়, ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ ঘটে বলিয়াই, এইরূপ অগ্নিত্যাগের ব্যবস্থা, সন্ন্যাসের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত।

বিরাট ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিরূপ চন্দ্রমা-জ্যোতিঃই, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও তাপরূপ ইন্দ্রিয়শক্তির রক্ষাকর্ত্তা; এবং দেহীর ইচ্ছাশক্তি, দেহী বা ইন্দ্রিয়রূপে পুনরায় প্রকাশ হইবার অর্থাৎ পুনর্জন্মের নিমিত্তক। এইজন্য একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, এইভাবে অবস্থান করিবার জন্য সন্ন্যাসরূপ ব্রহ্মভাব লাভের প্রয়াসে অগ্নি বা তাপরূপ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। নচেৎ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অগ্নিব্রহ্মের সহিত ব্যবহার ত্যাগ করিলে, অগ্নিত্যাগ হয় না। অগ্নিব্রহ্মই জগৎরূপ। বস্তু একই ব্রহ্ম আছেন। অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন করিয়া জগৎ বা অগ্নি আদির পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব ভাবনা। এই ভিন্ন ভাবনা ত্যাগ করিয়া, একমাত্র পরমাত্মাই আছেন,

এই জ্ঞান লাভই যথার্থ জগৎরূপ অগ্নিকে ত্যাগ করা বুঝা প্রয়োজন। নচেৎ ত্যাগী থাকিতে, অগ্নিত্যাগ অসম্ভব।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ

জ্যোতিঃস্বরূপে গ্রহণ।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃতে গ্রহণ ঘটে, ইহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু কেন গ্রহণ হয় এবং গ্রহণ লাগিবার যথার্থ ভাব কি, এ বিষয় ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীর মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন ধারণা। ইহার যথার্থ অনুসন্ধানে জীবের বিশেষ মঙ্গল আছে, এ কারণে এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

সকলেরই বুঝা প্রয়োজন যে, পরমেশ্বর নিষ্প্রয়োজনে কোন ব্যবস্থাই রাখেন নাই। আমরা জানি, আর নাই জানি, সমস্তই যে আমাদের মঙ্গলের জন্যই রহিয়াছে, ইহা বিচার করিলে কতক বুঝা যায়। জানা ও না জানার মধ্যে প্রভেদ এই যে, জানিলে উহা আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হয়, না জানা থাকায়, তাহার অভাব ঘটে।

সূর্য্যনারায়ণ-জ্যোতিঃ চেতন জ্ঞানময়; এবং চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ, চেতন আস্বাদময়। যেমন বুদ্ধি, নিশ্চয়াত্মিকা প্রকাশ বা জ্ঞান, এবং মন আস্বাদানুভবাত্মক প্রকাশ বা অজ্ঞান। যেমন মন ও বুদ্ধি উভয়ই, জ্ঞান বা প্রকাশ ভাবাপন্ন। কিন্তু যেমন ভ্রমজ্ঞান বা অজ্ঞান মনে এবং অভ্রান্ত ভাব বা বিজ্ঞান বুদ্ধিতে, প্রকাশ

পায়, সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশ, অভ্রান্তভাবাপন্ন, এবং চন্দ্রমা-প্রকাশ, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান বা ভ্রান্তি আস্বাদযুক্ত। ভ্রম ও অভ্রম দ্বারা একই প্রকাশ পদার্থকে আস্বাদ ও ভাবরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নচেৎ প্রকাশ উভয়ই এক। ক্রিয়াজগৎ ভ্রান্তিময় আস্বাদ রূপ, এই কারণ জাগতিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের জন্য, আস্বাদময় চন্দ্রমা-প্রকাশের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়; এবং আস্বাদের পরিবর্ত্তনের জন্য, ভাবেরও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য প্রয়োজন বলিয়া, ভাবময় সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশেরও পরিবর্ত্তন হয়। জাগতিক আস্বাদ ও ভাবের পরিবর্ত্তনের জন্যই, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের, গ্রহণ ও গ্রহণমুক্তি। যেমন ভোগেচ্ছার পরিবর্ত্তনে, জীবের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন এবং জ্ঞান বা অন্তঃকরণস্থিত ভাব অনুসারে, ভোগেচ্ছার পরিবর্ত্তন হয়, সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণ ভাবময়ের প্রকাশের তারতম্যে, চন্দ্রমা-প্রকাশের আস্বাদের তারতম্য এবং আস্বাদময় চন্দ্রমা-প্রকাশের তারতম্যে, ক্রিয়ারূপ জগৎ-স্রোতের তারতম্য হয়। এই জগৎস্রোতের পরিবর্ত্তনের জন্যই, চন্দ্রমা-সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশে, গ্রহণের ব্যবস্থা। যেমন বুদ্ধিতে, একটি ভাবের পরিবর্ত্তনে, বহু আস্বাদের ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়, সেই-রূপ সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের গ্রহণে, বহুবার চন্দ্রমা-প্রকাশের গ্রহণ, ও বহু জাগতিক ক্রিয়ার, পরিবর্ত্তন হয়; এবং যেমন বুদ্ধির একটী ধারণা, ক্রমে ক্রমে মনের বহু সংকল্প বিকল্প শক্তিকে পরিবর্ত্তন করে, সেই প্রকার, সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের একবার গ্রহণ রূপ ভাবের পরিবর্ত্তনশক্তির কার্য্য, ক্রমে ক্রমে চন্দ্রমা-প্রকাশে বহুবার গ্রহণ ঘটাইয়া, জাগতিক ক্রিয়ার ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। চেতনা, ব্যক্ত বা প্রকাশ হইলে, ব্যক্তিত্ব; এবং এই ব্যক্তিত্ব,

আস্বাদের দ্বারা সীমাবিশিষ্ট হইলে, ভাব। ঐভাব ক্রিয়া-গণ্ডীতে আসিলেই, রূপ নামে অভিহিত হয়। এ কারণ জগৎরূপ ক্রিয়া-ক্ষেত্রে, চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মপ্রকাশ, রূপ বা ক্রিয়াময় বলিয়াই প্রতীয়মান হন। যাবৎ জীব, চেতনময় পরমাত্মাকে না দেখেন, তাবৎ তাঁহার পক্ষে রূপেরই পরিবর্ত্তন দৃশ্য হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য সর্ব্বরূপের আশ্রয়, চন্দ্রমা-সূর্য্যনারায়ণের রূপে বা প্রকাশে গ্রহণ দৃষ্ট হয়। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির বা ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, এ জ্ঞান, জীবের নিকট অজ্ঞাত থাকে।

যেরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে, যতটা সত্য উপলব্ধি করা মঙ্গল-কর, তাহা, পরমাত্মা দিতে কুণ্ঠিত নহেন। এই জন্য ক্রিয়া-ভাবা-পন্ন জাগতিক বুদ্ধিতেও, সত্যের ছায়া প্রকাশ রাখিবার জন্য, বাহ্য-বিজ্ঞানে, চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ, সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের প্রতিবিম্ব এবং চন্দ্রকলার অপ্রকাশ বা গ্রহণ লাগা, সূর্য্যকিরণের অভাব চন্দ্র পদার্থে ঘটে বলিয়া এবং শাস্ত্রান্তরে বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট প্রত্যক্ষ অদ্বৈতভাবরূপ রাহুগ্রাস অর্থাৎ ভিন্নতা হরণ বশতঃ গ্রহণ হয় বলিয়া প্রকাশ রহিয়াছে। ইহার যথার্থ ভাব, ভোগ বা আস্বাদ, ইহাদের কারণরূপ ভাবে, ইহারা প্রত্যাহৃত হয়। ইহাই ভোগময় চন্দ্রমা-প্রকাশে গ্রহণ ও তিথি-পরিবর্ত্তন। একই কারণে পরিবর্ত্তন হইলে, তিথি, এবং বিশেষ কারণে পরিবর্ত্তন হইলে, গ্রহণ নাম দেওয়া হয়। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রমা-প্রকাশের, প্রকাশ অপ্রকাশ হইলে, গ্রহণ নাম দিবার কারণ এই যে, যে ক্রিয়া জগতে উপস্থিত চলিতেছিল, তাহার প্রবাহিত ক্রিয়ার ভাবাংশ পরিবর্ত্তিত হইল। অর্থাৎ পরমাত্মা পূর্ব্বক্রিয়ার ভাবাংশ গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত নূতন ক্রিয়ার ভাব, বা আস্বাদ জগতে ও জীবে সঞ্চার করিলেন।

সূর্য্যনারায়ণ-জ্যোতিঃ, ভাবময়। ভাব চেতনারই প্রকাশ, এজন্য, চেতনার বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তনের জন্যই, সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশে গ্রহণ লাগে, অর্থাৎ ভাবরূপ প্রকাশ, ব্যক্তিভাব হইতে গৃহীত হইয়া, নূতন ভাব ব্যক্তি চেতনায় প্রকাশ হয়। এই ভাবের প্রকাশ, ব্যক্তিভাবে স্থিতি রাখিবার জন্য আকস্মিক, ক্রিয়ারূপ স্থূলের আবরণ হয় বলিয়া জীব-চক্ষে বোধ হয়, গ্রহণ বিষয় জাগতিক বিজ্ঞান চক্ষে এই ভাবেই অনুভূতি ঘটাইতেছেন। ইহার যথার্থ ভাব এই যে, ভাবের পরিবর্ত্তনের জন্য, প্রকাশের সম্পূর্ণ সংহরণ প্রয়োজন হয় না। জীবের নিকট ক্রিয়ারূপ স্থূল পদার্থের আবরণ পড়ে মাত্র। অর্থাৎ প্রকাশই সর্ব্বভাবময় পদার্থ। ক্রিয়াযুক্ত হইলে, এই ভাব জীবে প্রকাশ পায় এবং ক্রিয়াই ভাবের প্রকাশ ও অভাব ঘটায়। জীবের ব্যষ্টি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লক্ষ্যই ক্রিয়ারূপ। নচেৎ চেতনা, প্রকাশ বা ভাব হইতে, ক্রিয়া, অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে; এবং যেমন জীবে, চেতনা দ্বারা ক্রিয়ারূপ ইন্দ্রিয়, পরিচালিত ও সেই ক্রিয়ারূপ বিষয় দ্বারা চেতনার আবরণ বা অজ্ঞান, সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ দ্বারা পরিচালিত ও উৎপন্ন গ্রহের দ্বারা জ্যোতির অপ্রকাশ-ভাব, মানব-বুদ্ধিতে প্রকাশ হওয়ার নাম, গ্রহণ রাখা হইয়াছে। ক্রিয়া-রূপ জড় ও উদ্ভিদ্-প্রকাশের পরিবর্ত্তনের জন্য, চন্দ্রমার গ্রহণ, এবং চেতনার ভাব পরিবর্ত্তনের জন্য সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের গ্রহণ হইয়া থাকে।

মনুষ্য-শরীরের বিষয়, বিচার করিলেও দেখা যায়, মনের পরি-বর্ত্তনে, কার্য্যের পরিবর্ত্তন; এবং বুদ্ধির পরিবর্ত্তনে ভাবের বা আস্বাদের পরিবর্ত্তন হয়। বিশেষ বিচারশীল ব্যক্তি, বুঝিতে

পারেন যে, যেমন পূর্ণিমায় চন্দ্রকিরণ পৃথিবী হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া চন্দ্রগ্রহণ হয়, সেইরূপ মনের প্রকাশ, ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আস্বাদের পরিবর্ত্তন হয়; এবং যেমন অমাবস্যায় চন্দ্র সূর্য্য একই রেখায় আসিয়া সূর্য্যগ্রহণ ঘটে, সেইরূপ মন ও বুদ্ধি একত্র প্রকাশ হইলে ইন্দ্রিয়জাতীয় ক্রিয়া-রূপ প্রকাশ অদৃশ্য হইয়া ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। জীব ক্রিয়াময় রূপে ও ভাবে আপনাকে দেখে বলিয়াই, রূপ মাত্রেরই প্রকাশ অপ্রকাশ দৃষ্ট হয়। ক্রিয়াময় ভাবে, ইহাই প্রত্যক্ষ করা, স্বাভাবিক। কারণ পরমাত্মাই, জীবের নিকট সাধারণতঃ এই ভাবে প্রকাশ রহিয়াছেন। তাঁহার দয়ায় সত্য লাভ ঘটে। নচেৎ লক্ষ চেষ্টায়ও, চেষ্টা দাতার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে জীব অসমর্থ।

প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তিগণ, এ বিষয় সহজে বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনার আশায়, এখানে দুই একটী বিষয় প্রকাশ করা হইল। যাঁহারা প্রাণায়াম দ্বারা অল্পসময়মধ্যে, মনকে ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যাহরণ করিতে পারেন, তাহারা বুঝিবেন যে, মনের বাসনা অনুসারে মনের প্রকাশ অপ্রকাশের সময় ক্রিয়া হইতে থাকে। স্বপ্নেও চরিত্র অনুসারে ভোগ হয়; এবং ভাবপ্রকাশের সময়, বুদ্ধি নিস্পন্দ বা স্তম্ভিত থাকে, তাহার পর, বুদ্ধির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বরূপ ও আস্বাদ ত্যাগ হইয়া, ভিন্নরূপ প্রকাশ ও আস্বাদযুক্ত ভাব প্রকাশ হয়। যেমন ভাবের পরিবর্ত্তনে, ক্রিয়ার স্থায়ী পরিবর্ত্তন হয়, সেইরূপ ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনেও চেতনাতেও, নূতন নূতন ভাব ফুটিতে থাকে।

কিন্তু ক্রিয়া স্থির থাকিলেও ভাবের চঞ্চলতার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভাবের স্থিরতা থাকিলে, বিশেষ কারণ ব্যতীত,

ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয় না। এ কারণ প্রার্থনা ও সাধনাদি ক্রিয়া: দ্বারা ভাবের উপলব্ধি হইলেও, যতক্ষণ ভাব স্থির না হয়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ শান্তিলাভে বঞ্চিত থাকে। ক্রিয়া দ্বারা যে ভাব লাভ হয়, উহার ভিত্তি ক্রিয়াময় জগৎ, একারণ জগতের চঞ্চলতা নিবন্ধন, ভাবেরও চঞ্চলতা হয়। চৈতন্যই নিত্য স্থির, এইজন্য পরমাত্মার দয়ায়, যে ভাব, চেতন জীবভাবে প্রকাশ হয়, উহা স্থির থাকে। অতএব, সত্যভাব স্থির রাখিবার জন্য, পরমাত্মারই কৃপার প্রয়োজন। মনভাব একেবারে নিরস্ত থাকিলে, বুদ্ধিভাব কেবলমাত্র ব্যক্তি বা চেতনাভাবেই বর্ত্তমান থাকে। এই ভাবই সূর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের গ্রহণ অর্থাৎ ক্রিয়াতীত ভাব। সূর্য্যগ্রহ-ণের সময় যেমন জগতে সূর্য্যকিরণের অভাব হয়, সেই প্রকার, এই ব্যক্তিভাব বা কেবলমাত্র চৈতন্যভাবে অবস্থানকালে, মন ও ইন্দ্রিয়াদির ভাব লোপ পায়; এবং যেমন চন্দ্রমা-গ্রহণে জগতে জ্যোৎস্না-কিরণের অভাব ঘটে, সেইরূপ মন, যত পরিমাণ আলোকরূপে বা জ্ঞানভাবে প্রকাশ হয়, তত পরিমাণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মে। যেমন সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বেই অমাবস্যা আবশ্যক, সেইরূপ বুদ্ধি, ব্যক্তিভাবে স্থিত হইবার পূর্ব্বেই, মনো-ভাব লয় হওয়া আবশ্যক; এবং যেমন পূর্ণিমা তিথি না হইলে, চন্দ্রের গ্রহণ হয় না, সেইরূপ কোন ক্রিয়ার, পূর্ণ আস্বাদ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, মনের সে ভাবের ভাবান্তর হয় না। গ্রহণকাল, ভাব ও আস্বাদের পরিবর্ত্তনকাল বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্রে এই সময় সৎকার্য্যের বিশেষ করিয়া বিধি রাখিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রতিপদে চন্দ্রগ্রহণ লাগিবার কারণ এই যে, মন সম্পূর্ণরূপে তাহার চেষ্টা বা কার্য্য সমাধা করিয়া হতাশ হইতে আরম্ভ হইবার

কালেই, তাহার ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক সময় এবং শুক্ল-প্রতিপদের আরম্ভে, সূর্য্যগ্রহণ হইবার কারণ যে, মন বুদ্ধি উভয়ই হতাশ হইয়া, অহঙ্কার নিবৃত্ত হইলে, তবেই চেতনাভাব হইতে লক্ষ্য বা ভাবের প্রকাশ, প্রথমে উপস্থিত হইয়া, পরে বুদ্ধি, সত্যাসত্যের ভাব স্থির সিদ্ধান্ত করে। এইজন্য শুক্লপ্রতিপদে সূর্য্য-গ্রহণ লাগিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ভাবের পরিবর্ত্তনের জন্যও, অহঙ্কারের খর্ব্বতা এবং ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের জন্য, আম্বাদের পরি-বর্ত্তন আবশ্যক। এই পরিবর্ত্তিত ক্রিয়াই, চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতির গ্রহণ বুঝা প্রয়োজন।

ওঁ

যুগোৎপত্তি।

ইহা সাধারণতঃ ধারণায় আসা স্বাভাবিক যে, যখন সত্য যুগে, লোক সকল সত্যপরায়ণ ছিলেন, তখন পাপময় কলি কেমন করিয়া আসিল? সত্যপালনের ফলে, পাপের আবির্ভাব, কিম্বা পাপের অন্য কোন হেতু আছে? যদি পুণ্যকার্য্য পাপকে ডাকিয়া আনিয়া থাকে, তাহা হইলে, সৎকার্য্যের ফলে জগতের মঙ্গল আশা করা নিষ্ফল। আর যদি অসৎ কার্য্যের ফল, দুর্দ্দশা-ভোগ হয়, তাহা হইলে অসৎ কোথা হইতে আসিল? ইহা স্থিরীকৃত হইলে দুরাচার পরিহারের পথপ্রাপ্তি, সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব যুগপ্রকাশের বিচারের পূর্ব্বে পাপ পুণ্য ও তাহার প্রতিবিধি অবগত হওয়া প্রয়োজন।

কোন ব্যক্তির কষ্টের বা কষ্টের কারণ উৎপন্ন করার নাম পাপ, পক্ষান্তরে ব্যক্তির সুখের সহায়তাই পুণ্য। এই পাপ পুণ্য দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম—জীবের ব্যক্তিগত সুখ বা দুঃখের প্রবর্ত্তক হওয়া। দ্বিতীয়তঃ সত্যস্বরূপ পরমাত্মা ব্যক্তির নিয়মের প্রতি-পালন বা ব্যভিচার করা। মূলে উভয় প্রকারই এক। অর্থাৎ সত্যেরই অনুগত হওয়ার নাম পুণ্য এবং অসত্যকে গ্রহণ করাই পাপ। যেহেতু সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আজ্ঞা পালনে, কোন ব্যক্তিরই প্রকৃত কষ্টের কারণ হইতে হয় না।

ইচ্ছাই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই ইচ্ছাশক্তি সর্ব্ব-জীবের হিতের প্রতি লক্ষ্যযুক্ত থাকিলেও প্রমাদ বশতঃ জীবের দ্বারা অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব নহে। কিন্তু দয়াময় অন্ত-র্য্যামী পরমাত্মার পক্ষে, এ অপরাধ পরিহার স্বাভাবিক। কারণ তিনি জানেন যে, জীব অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন। এবং ইহা তাঁহারই জগৎ স্রোতের অন্তর্গত। অতএব সৎ ইচ্ছা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির হিতাকাঙ্ক্ষা রাখাই পুণ্যের বীজ। এবং কোন ব্যক্তির অহিত কামনাই পাপের মূল স্বরূপ।

জগতের হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসাধ্য সত্যের অনুগামী হওয়াই প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তির অহিত বা কষ্ট হইলে, অপর বহু লোকের হিত বা শান্তি ঘটিতে পারে, এরূপ ইচ্ছার মধ্যেও পাপ নিহিত। কারণ বাস্তবিক যাহা হিত, তাহা কাহারও পক্ষে অহিত হইবার সম্ভাবনাও নাই। যেমন অগ্নি, সকলের পক্ষেই অগ্নি। একের পক্ষে অগ্নি, অপরের পক্ষে বরফ হয় না। সেইরূপ যাহা মঙ্গল, তাহা সকলের পক্ষেই মঙ্গল। যাহা আপাত চক্ষে অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয়, তাহা বাস্তব নহে।

ইহাই বুঝা আবশ্যক। অতএব মঙ্গল ইচ্ছার মধ্যে সর্ব্ব ব্যক্তিগত মঙ্গল ইচ্ছাই বর্ত্তমান। অপর পক্ষে ব্যক্তিগত কষ্টের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজের সহিত জগতের দুঃখ আকাঙ্ক্ষাই নিহিত আছে। এ কারণ একেকে সর্ব্ব হইতে বাদ দিয়া সার্ব্বজনিক শুভ ইচ্ছা সুখে পরিণত না হইয়া, দুঃখকেই আকর্ষণ করে।

হিন্দুশাস্ত্র-পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, সত্যকালে একমাত্র সত্যস্বরূপ নারায়ণের উপাসনা হইত। কেহ কাহারও অহিতের ইচ্ছা না রাখিয়া ভক্তগণ আপনার ও অপরের মঙ্গলেরই সহায়তা করিতেন। জগৎস্রোতে অসৎ লোক থাকিলেও, সদ্ব্যক্তিদিগের অন্তরে অসতের নির্য্যাতন-কামনা জাগিত না। তখন লোক অসতের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য সৎস্বরূপ পরমাত্মারই দয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। ক্রমে বলবান্ ব্যক্তি বা অবতার-রূপে পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া দুষ্টের দমন করায়, সদ্ব্যক্তিদিগের অন্তরে দুষ্টের দমন ও দুষ্ট লোকের কষ্ট উৎপন্ন হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে লাগিল; এবং একমাত্র পরমাত্মারই যে সৎ অসৎ শক্তি, ইহা ধারণা হইতে অস্তমিত হইয়া, দেব ও দানবের শক্তির সহিত ভগবানেরও পৃথক্ শক্তির কল্পনা হইয়া, কতক ব্যক্তির নির্য্যাতন ও কতক ব্যক্তির সুখাকাঙ্ক্ষা জীবে প্রকাশ হইল এবং ব্যক্তিগত অহিতাকাঙ্ক্ষা যে পাপপূর্ণ, ইহা মন হইতে অপসারিত হইল। অসত্যের নিবারণ প্রয়োজন—এই বাসনা প্রবল হওয়ায়, উপায়ের ন্যায় অন্যায়ের গুরুত্বভাব, অসত্যের ছায়ায় ঢাকিয়া গেল এবং দুষ্টের দমনকারিণী ব্রহ্ম-শক্তি বা জীবকে অবতার নামে অভিহিত করিয়া ভগবান্ হইতে পৃথক্ সম্মান ও কালক্রমে পূজা করিয়া প্রকারান্তরে অসত্যেরই

সম্মান ও আধিপত্য বিস্তারের পথ উদ্ঘাটিত হইল। যেমন, যে জীবের আহারলাভ যত সহজ, সেই জীব তত অধিক জন্ম লাভ করে, সেই প্রকার যে চরিত্র বা গুণ, মনুষ্য কর্ত্তৃক যত অধিক সম্মানিত হয় বা সহানুভূতি পায়, সেই চরিত্র বা গুণ তত অধিক পরিমাণে প্রকাশ হয়। এ কারণ অবতারের চরিত্রানুসারে যুগগত লোকচরিত্রও সেইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত মান ও অপমানের দ্বারা চরিত্রেরই সম্মান ও অসম্মান করা হয়। এ কারণ অবতার-ব্যক্তির পক্ষে পাপ পুণ্য না থাকিলেও, উপাসক-গণের পক্ষে পাপ বা পুণ্য অর্থাৎ সদসদ্‌গুণের প্রকাশ হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণ সত্য ধারণার পক্ষে একমাত্র নিরঞ্জন এক-রস-স্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মার উপাসনাই জীবের পক্ষে শ্রেয় এবং সদ্‌গুণকে আশ্রয় করিবার জন্য জীব মাত্রেরই বা অবতার-দিগের সার্ব্বজনিক আমিত্বভাব ও মঙ্গল-কামনার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক; এবং উপস্থিত জগতে যেখানে, যে ব্যক্তিতে সদ্‌গুণ আছে, সদ্‌গুণের জন্য তাহার সম্মান এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সদ্‌গুণের আবাহনই জীব মাত্রের বিশেষ কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিলে পরমাত্মার কৃপায় জগৎ অসৎ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ঘোর কলি-রূপ পাপ হইতে পুণ্যরূপ সত্যের জাগরণ। শাস্ত্রে লেখা আছে যে, অত্যাচারীর প্রতিও অত্যাচার হইতে থাকিলে, অত্যাচারীদিগের অন্তরে অত্যাচার না হউক, এইরূপ ইচ্ছা হইলে সত্য যুগ আগমন করিবেন।

যুগাদির পরিবর্ত্তন-বিষয় এই ভারতবর্ষেই বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয়। দেখা যায়, সত্যযুগে নরসিংহ ও বামন অবতার

দ্বারা হিরণ্যকশিপু বধ ও বলী ছলিত হইয়াছিল এবং ভগবান্ যেন পক্ষপাতী, এইরূপ বিশ্বাস জীব-হৃদয়ে উৎপন্ন হওয়ায় সত্যের এক পাদ লুপ্ত হইয়া তিন পাদ পুণ্য ও এক পাদ পাপ-যুক্ত ত্রেতাযুগের প্রকাশ হয়। ইহার যথার্থভাব, জীবে, পূর্ণরূপ পরমাত্মার অবিনাশী, অব্যয়, অখণ্ড, নিত্য, আনন্দ, সত্যভাব অন্তর হইতে মুছিয়া, প্রকৃতি-পুরুষের অবিচ্ছিন্ন ঐক্যভাব ত্যাগ করিয়া—জীবশক্তি, পুরুষশক্তি (চেতনা) ও প্রকৃতিশক্তি (জড়) এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্বের সহিত পৃথক্ পৃথক্ শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা, কল্পনা আরম্ভ হইল। ইহাই রাবণ-রূপ অহঙ্কার কর্তৃক জীবাত্মারূপ রামচন্দ্রের সতী সীতারূপ ব্রহ্মজ্ঞান মহাশক্তির হরণ এবং সাধনা-রূপ সমুদ্র পার হইয়া তত্ত্বজ্ঞান-রূপ বশিষ্ঠের উপদেশে দশ ইন্দ্রিয়রূপ দশাননের বিনাশরূপ অভেদভাব লাভ করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ উত্তর-খণ্ডে, রাজারূপ অদ্বৈতভাবে রাম-রূপ আত্মা অভেদে স্থিতিলাভ করিলেন। এবং রাবণ বিনষ্ট হইলেও, রাবণ-পত্নীর বৈধব্য অর্থাৎ মস্তকহীন না হইবার কারণ এই যে, দশ ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ যে বস্তু, তাহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত অভেদে স্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়ের মূল বস্তু যে প্রকাশ, তাহা অবিনাশী ব্রহ্মপ্রকাশ, ইহাই রাবণের চুলি নির্ব্বাণ না হইবার ও রাবণপত্নীরূপ চিৎশক্তির মস্তক পূর্ব্বের ন্যায় অখণ্ড থাকিবার হেতু। যে জীবাত্মার মধ্যে কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত তিনটি মাত্র ভেদভাব থাকে, তিনিই ত্রেতাযুগের রামের ন্যায় রাবণবধরূপ সাধনা-কার্য্যের উপযুক্ত। শাস্ত্রে সাধনার ক্রম নির্দ্দেশ করিবার জন্যই বিশেষ করিয়া, এইরূপ আখ্যায়িকা দিয়াছেন, যাহাতে জীব আপন অবস্থা বুঝিয়া ভগবানে অনুরক্ত ও পথ অনুসন্ধান ও

অনুসরণ করিতে সক্ষম হন। নচেৎ ভগবান্ হইতে ভিন্ন করিয়া মনুষ্যরূপের পূজার জন্য এ আখ্যায়িকা নহে।

এইরূপ স্থূল-সূক্ষ্মের ও ব্রহ্ম-জীবের বস্তুগত ভেদ-কল্পনাই দ্বাপর যুগের লীলা। এই অবস্থায় জীবাত্মার পক্ষে চেতনা ও অচেতনা একই বস্তু, কি পৃথক্ বস্তু, এই বিচাররূপ যুদ্ধের আয়োজন। এই দ্বাপর যুগ, যাঁহার অন্তরে প্রকাশ পায়, তাঁহারই সাধন-যুদ্ধের প্রয়োজন। এই সাধন-যুদ্ধের স্থান অহঙ্কার; বিষয়-ভোগ-বিলাস, যোদ্ধা; একদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি; অপরদিকে জাগতিক ভোগ্য পদার্থ সকল। জ্যোতিঃরূপ শ্বেত অশ্ব দ্বারা প্রবাহিত শরীর-রথে, বিবেক-যুক্ত মুমুক্ষু অর্জ্জুনরূপ জীবাত্মা, কৃষ্ণ-রূপ পরমাত্মা গুরু দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সর্ব্ব অহঙ্কারকে জলাঞ্জলি দিয়া পরমাত্মাই যে প্রত্যক্ষ বিরাট্‌রূপে প্রকাশ রহিয়াছেন, তাঁহার অতিরিক্ত কেহ বা কিছু নাই, ইনিই একমাত্র হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে একই পুরুষ বিরাজমান, এই জ্ঞান লাভ করিয়া জড় চেতনার ভেদরূপ যুদ্ধে, পুরুষ-কাররূপ দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগের পর অবসান করিলেন। দ্বাপর অর্থাৎ যে সকল সাধকের অন্তরে জড় চেতনার ভেদজ্ঞান আছে, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ সাধনাই প্রথম অবলম্বনীয়, ইহা জ্ঞাত করিবার জন্যই দ্বাপরের কুরুপাণ্ডবের আখ্যায়িকা।

সর্ব্ব প্রকার পার্থক্যই কলিযুগের মূর্ত্তি। কাহারও সহিত কাহারও মিল না থাকা, এমন কি নিজ নিজ অন্তরের ভাবের সহিত, আপন ব্যবহার-কার্য্যের পর্য্যন্ত পার্থক্য থাকাই ঘোর কলির অবস্থান। সর্ব্বপ্রকার বিবাদ বিসংবাদ, দুর্নীতি অবলম্বন

করাই কলির স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ। কি ব্যবহারিক, কি পারমার্থিক, সকল প্রকার ভিন্নতাই এই যুগের অবস্থা। এই কারণে এইরূপ অন্তঃকরণবিশিষ্ট সাধকের পক্ষে, প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রকার জাতিগত, সমাজগত, আচারগত, উপাস্যগত ভেদভাব ত্যাগ করিয়া, সমস্ত ভাবকে একই ব্রহ্মাকারে ধারণা করা প্রয়োজন। এইরূপ ধারণা করিলেই সত্যযুগরূপ একমাত্র পরমাত্মার উপাসনার অবস্থা আসিলে সত্যের উপাসনার দ্বারা শান্তির উপায় হয়। এই কলি-কালরূপ অনিশ্চয়াত্মক, সন্দিগ্ধ অবস্থায় প্রকৃত সাধককে কোন সমাজ, জাতি, বা উপাসকগণ দৃঢ় বন্ধন দিতে পারে না বলিয়াই, এই যুগের সাধক অল্প সময়ের মধ্যে ভগবানের কৃপায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। এ যুগে ভগবান্ ব্যতীত বাস্তবিক অপর ব্যক্তি হইতে ভরসা পাইবার উপায় নাই বলিয়াই, প্রকৃত মুমুক্ষু ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিলে পরমাত্মা সহজেই দয়া করিয়া মুক্তি দিতে পারেন বা দেন। এই ভাব বুঝাইবার জন্য কলিযুগের বর্ণনা। জীব-মাত্রেই এই চতুর্যুগরূপ চারি প্রকার আন্তরিক অবস্থাপন্ন। যাহার অন্তর যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা হইতে কি প্রকারে ব্রহ্মলাভ ঘটে, তাহা বুঝাইবার জন্য যুগধর্ম্মের বিবরণ। ইহা বুঝিয়া সাধক আপন আপন অন্তঃকরণ অনুসারে সাধনা করিয়া ও ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা রাখিলে তাহার সাধনপথ সুগম ও সিদ্ধি লাভ হয়।

একই সত্যকে, এক সত্য নিত্য ভাবে না দেখিয়া আসক্তিবশতঃ পরজ্ঞানে সত্য, মিথ্যা ও ভোগ ভাব এবং ভোগের জন্য বিবাদ উৎপন্ন করিয়া, নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্মের প্রবর্ত্তনায়ই ভিন্ন ভিন্ন যুগরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইয়া

সত্য ধর্ম্ম বা যুগ বিনষ্ট হইয়াছে। নিত্য সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য হইয়া অবতারাদির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়াই ইহার মূল কারণ।

অবতার বহু। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহাদের ব্যবহার, চরিত্র ও কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণ যিনি যে চরিত্রবিশিষ্ট, তিনি তাঁহার অন্তরের অনুরূপ অবতারের উপাসক হইতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে তাঁহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন না হইয়া উক্ত চরিত্রই দৃঢ়ীভূত হওয়াই স্বাভাবিক। এমত অবস্থায় সত্য শুদ্ধ চৈতন্য আনন্দময় অদ্বিতীয়ের ভাব লাভ করিয়া, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব; এবং ব্রহ্মের ও অবতারদিগের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া, সত্যের খর্ব্বতার আরোপে বুদ্ধিভ্রষ্টতার সহিত পতন অনিবার্য্য। ভিন্নতাই একের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরের নিকৃষ্টত্ব আরোপ করিবার যন্ত্র। এই যন্ত্রে ভগবান্‌কে আনিয়া তাঁহারই সর্ব্ব প্রকার অবমাননা করা হইতেছে এবং এই অবমাননা-রূপ পাপই সত্যকে ত্রেতা, ত্রেতাকে দ্বাপর এবং দ্বাপরকে কলিযুগরূপ মহাপাপ অবস্থায় আনিয়াছে। এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য স্তরে স্তরে পাপ-স্খলনরূপ অবতারোপাসনা ত্যাগ হইয়া একমাত্র সত্য নারায়ণের উপাসনা স্থাপিত হইলে, তবে জীবকুলের দুর্দ্দশা নিবারণ হইবে, এবং সাধক সহজে পরমাত্মার দয়া লাভে সমর্থ হইবেন। সদ্‌-গুণের অবমাননা করিয়া অসদ্‌গুণের অনুরক্ত হওয়াই সত্যের অন্তর্দ্ধান। এই যুগভেদ, ব্যক্তিগত। যিনি যে গুণে অনুরক্ত, তিনি সেই যুগে অবস্থান করিতেছেন। সত্ত্বগুণই সত্যকাল, সত্ত্ব রজঃ—ত্রেতা, রজঃ তমঃ—দ্বাপর, এবং তমোগুণই ঘোর কলি; ইহা বুঝিয়া সত্য গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ লাভের চেষ্টা মনুষ্য

মাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং ইহাই একমাত্র ব্রহ্মকৃপা লাভের ও সর্ব্ব শান্তির উপায়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ।

যাহাতে যে গুণ প্রকাশ থাকিলে, পদার্থ বা রূপ গুণ শক্তির ভিন্নতার সহিত নাম নির্দ্দেশ করা যায়, অথবা যে বিশেষণের জন্য যে নামকরণ, ঐ বিশেষণই ঐ বস্তু, পদার্থ, রূপ গুণ বা শক্তির নাম ধর্ম্ম। এবং যে শক্তি, নামকরণের উপযুক্ত বিশেষণকে পুঞ্জীকৃত ও বিচ্ছিন্ন করে, ঐ শক্তির নাম ধর্ম্মরাজ। এদেশে সৎকর্ম্মকে ধর্ম্ম, এবং সদসৎকর্ম্মের ফলদাতাকে, ধর্ম্মরাজ নামে অভিহিত করা যায়। মূলে উভয়ের ভাব একই। কারণ সৎকার্য্য সকল, সত্যস্বরূপ পরমাত্মার বিশেষণরূপে প্রকাশ হয়, অর্থাৎ সৎভাবই জীবাত্মাকে ব্রহ্মভাবে উপস্থিত করে, এবং চৈতন্যময় পুরুষই একমাত্র ন্যায় অন্যায় কার্য্যের নিয়ামক ও সর্ব্বফলদাতা; এ কারণ, পরমাত্মাই মূল ধর্ম্মরাজ। অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই ধর্ম্মরাজ এবং তাঁহার সৎ চেতনারূপের প্রকাশই মূল ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই সর্ব্বজীবের শান্তির আশ্রয়। এইজন্য মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য, ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, তিনি নিজেই ধর্ম্মের দ্বারা রক্ষিত হন। কারণ, জীব মাত্রেই সৎস্বরূপ পরমাত্মারই প্রকাশ। যিনি ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনি নিজেকেই

রক্ষা করেন। আর যিনি ধর্ম্মকে নষ্ট করেন, তিনি নিজেকেই নষ্ট করেন। এতএব আপন হিতাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে, ধর্ম্মরক্ষা সর্ব্বতো-ভাবে প্রয়োজন।

যাহা একজন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক, তাহা সকল মনুষ্যেরই মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন। স্থান কাল অবস্থা ভেদে সকলের পক্ষেই একই প্রকার অভাব থাকাও স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এবং সৎকার্য্য সকলের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় ও সুখ-শান্তিকর। এমত অবস্থায় ধর্ম্ম কখনই ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না। মঙ্গলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সর্ব্ব বিষয়েই, মনুষ্য মাত্রেই সমধর্ম্মাক্রান্ত। আমা-দের বুঝিবার ভেদে, ধর্ম্মের বাস্তব ভেদ, অসম্ভব। যদি পরমে-শ্বর অর্থাৎ জগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা পুরুষ এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ একই হইবে। সামান্য বিচারেই ইহা পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যের স্থূলশরীর একই পঞ্চতত্ত্বে নির্ম্মিত। সকলেই মন-বুদ্ধিরূপ জ্যোতিঃপদার্থের দ্বারা বিচার ও অনুভবাদি করিতেছেন। সকলেই একই ভাবে উৎ-পন্ন ও পালিত হইয়া, একই মৃত্যুর গ্রাসে সর্ব্ব লীলার উপশম করিতেছেন। অনন্তকাল বহিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই, আপনার আসা যাওয়ার স্থান ভিন্ন করিয়া দেখাইতে পারেন নাই এবং কস্মিন্ কালেও কাহারও ভিন্ন করিয়া নির্দ্দেশ করিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল দ্বেষ হিংসা পক্ষপাত করিয়া ধর্ম্মের ভিন্নতা কল্পনা করিয়া অশান্তিরই বীজ রোপণ করা হইয়াছে। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহার বিচার আজ পর্য্যন্ত হইল না; কিন্তু সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সত্য ও শ্রেষ্ঠ—এই শব্দে

মেদিনী প্রকম্পিত। বিচারশীল মনুষ্য, সকল প্রকার বিচারের সিদ্ধান্তে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে যে বিচারের প্রয়োজন আছে, এ চিন্তাও নাই। মনে হয়, যেন এ চিন্তা নিষ্প্রয়োজনীয় বা ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। কিন্তু ইহা আমাদের নিশ্চয় করিয়া বুঝা উচিত যে, ধর্ম্মের বিচার, সিদ্ধান্তে না আসা পর্য্যন্ত জগতের মঙ্গল নাই। কারণ, ধর্ম্মই একমাত্র অসত্য, অন্যায়, অবিচার ও দুঃখকে নিবৃত্ত রাখিয়া সত্য, ন্যায়, সুবিচার ও সুখ-শান্তিকে জাগাইয়া তুলে। এ কারণ হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্মকে জগতের ও জীবকুলের রক্ষক বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

পরিশ্রান্ত অর্থোপার্জ্জনকারী লোকের পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী কোন প্রকার বিশেষ চিন্তাসাধ্য বিচার করা একপ্রকার অসম্ভব। এমন কি, রক্ষক-রূপে রাজা না থাকিলে সুখে থাকা দূরে থাকুক, তাহাদের জীবন রক্ষা হওয়া পর্য্যন্ত সংশয়যুক্ত হয় বলিয়া বুঝা যায়। এমন অবস্থায় একমাত্র রাজাই প্রজাকুলের কি ঐহিক, কি পারত্রিক মঙ্গল লাভের সহায়। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে রাজাকে ধর্ম্মরাজ, এমন কি, ভগবানেরই মনুষ্যমূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ আছে। যিনি জগতের ঈশ্বর, তিনিই সর্ব্ব শক্তির সহিত রাজশক্তির অধিপতি। রাজশক্তি, ঈশ্বরশক্তি হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। যেমন পরমেশ্বর জগৎকে নিয়মিত রাখিতেছেন, রাজাও সেই-রূপ প্রজার নিয়ামক। যেমন জীবের সুখ দুঃখ পরমাত্মার ইচ্ছাধীন, সেই প্রকার প্রজার সুখ দুঃখ, অধিক পরিমাণে রাজহস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। এইজন্যই রাজার আর একটী নাম ধর্ম্মরাজ; এবং এই কারণেই রাজশক্তির অবমাননায় ভগবানেরই অবমাননা হইয়া প্রজার দুঃখভোগ ঘটে। যেমন ভগবান্ জীব মাত্রেরই

মাতাপিতা গুরু, সেই প্রকার রাজাই প্রজার মাতাপিতা গুরু। যেমন ভগবান্ ভিন্ন জীবের গতি মুক্তি নাই, সেই প্রকার রাজদয়া ব্যতীত প্রজার মঙ্গল অসম্ভব। কারণ, ভগবান্ই রাজারূপে প্রজাগণকে পালন করিতেছেন। প্রজার কর্ত্তব্য রাজাজ্ঞা পালন করা; রাজার কর্ত্তব্য—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে পুত্রকন্যারূপ প্রজার হিতানুষ্ঠানে রত থাকেন। যেমন শিশু সন্তানের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মতঃ ভগবানের নিকট মাতাপিতা দায়ী, সেই প্রকার রাজাও প্রজার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট দায়ী। যেমন ভগবান্ যাহাকে যে শক্তি না দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে ঐ শক্তির ব্যবহার তিনি চাহেন না, পক্ষান্তরে যাঁহাকে যে শক্তির মালিক করিয়াছেন, সেই শক্তির জন্য যেমন তাঁহাকেই দায়ী রাখেন; সেইরূপ জগতের মঙ্গলের জন্য যাহাকে যে শক্তি না দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে ঐ কার্য্য চাহেন না, এবং যাঁহাকে দিয়াছেন, তাঁহাকেই দায়ী হইতে হয়। এরূপ স্থলে প্রকৃত পক্ষে রাজাই প্রজাকুলের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট দায়ী হন; এবং যে ধর্ম্ম রক্ষা না করিলে জগতের মঙ্গল নাই, উহা বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্তে আসিয়া, যাহাতে প্রজাকুল সত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া পরমানন্দে থাকিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা রাজগণেরই বিশেষ কর্ত্তব্য।

পক্ষপাতযুক্ত বিচারে, সত্যের অনুসন্ধান কখন পাওয়া যায় না। এ কারণ পক্ষপাতহীন বিচার দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া, সত্যপালন করা ও করান রাজশক্তির কর্ত্তব্য। আমার বলিয়া ধারণা রাখিয়া বিচারের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, পক্ষপাত অনিবার্য্য। এ কারণ সত্যই সকলের সহিত আপনার ধর্ম্ম—ইহা

অন্তরে রাখিয়া বিচার করা আবশ্যক। রাজশক্তি, ধর্ম্মভেদ কল্পনা করিয়া, ধর্ম্মকার্য্যে উদাসীন থাকিলে, প্রজাগণও ক্রমে অধার্ম্মিক হইয়া পড়ে, তাহাতে জগতের অমঙ্গলের কারণ হইতে হয়। দয়াপরবশ হইয়া, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ রাখিলেও, মনুষ্য, ক্রমে ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ রাজা, মহারাজগণ, দয়াপরবশ হইয়া, যে অন্যায় কার্য্যকে, অধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ না রাখেন, প্রজাগণ, তাহা প্রথমতঃ অধর্ম্ম বুঝিলেও, ক্রমে ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জিত হয় না, এবং রাজ-নিয়মকে, ধর্ম্মেরই অন্তর্গত করিয়া লয়। দৃষ্টান্তস্থলে হেণ্ডনোট্ তামাদি হওয়া প্রভৃতি বিষয়কে লইলে, সহজে বুঝা যায় যে, মহারাজ, প্রজার মঙ্গলের জন্যই, তামাদি আইন রাখিয়াছেন। কিন্তু, ক্রমে উহা, ন্যায়ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লইয়া, চেষ্টাপূর্ব্বক তামাদি করিয়াও, অধর্ম্ম হইল, মনে করিতে খাতক অনিচ্ছুক হইতেছেন। একদিকে, ইহা যেমন, অধর্ম্মের রাস্তা হইয়াছে, অপর দিকে অনেক অধর্ম্ম কার্য্য, রাজ-আইনের সাহায্যেই উঠিয়া গিয়াছে। যাহাকে পূর্ব্বে হিন্দুগণ ঘোর অধর্ম্ম, নীচতা বলিত, উহা যে বাস্তবিক অধর্ম্ম বা নীচতা নহে, তাহাও রাজ-সহায়তায়, অনেকেই বুঝিয়াছেন, এবং অনেকে না বুঝিলেও, উহা ধর্ম্মাধর্ম্মের বাহিরে আনিয়া, বর্ত্তমান আচারের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, রাজা ব্যতীত, প্রজার মঙ্গল কিছুতেই নাই; এবং ধর্ম্মই সর্ব্ব মঙ্গলের আশ্রয়। অতএব ধর্ম্মরাজরূপ, রাজা-মহারাজ-দিগেরই, ধর্ম্ম বিষয়ে, সিদ্ধান্তে আসিয়া, সৎকার্য্যে রত হওয়া, ও রত করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত; এবং এ শক্তি ভগবান্ রাজা-মহারাজদিগকেই বিশেষ করিয়া দিয়াছেন। রাজা-মহারাজ-

গণই, ভগবানের রাজশক্তির অবতার। এই অবতার-ভাবই মনুষ্যকুলকে ভগবানের ইচ্ছার দিকে গতি ঘটাইয়া দেয়। ভগবান্, প্রজা অপেক্ষা, রাজা-মহারাজদিগকে, ধর্ম্মকার্য্য করিবার ও অপরের দ্বারা করাইবার শক্তি অধিক পরিমাণ দিয়াছেন। এমত অবস্থায়, ভগবানের নিকট সত্য বা ধর্ম্মরক্ষার জন্য অপর কে দায়ী হইবেন?

প্রথমে রাজা-মহারাজগণের বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, এই জগতের সুখ-শান্তির জন্য বা জীবাত্মার অনন্তকালের মঙ্গলের জন্য, ভগবান্‌কে, রাজা-প্রজাগণের প্রয়োজন আছে কি নাই। যদি প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ভগবান্-বিষয়ক কোন বিচারেরই প্রয়োজন হইবে না। আর যদি ভগবান্‌কে প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে নিরলস হইয়া তীক্ষ্ণ-ভাবে পক্ষপাতহীন বিচার দ্বারা, ভগবান্—কে, কোথায়—আছেন, মনুষ্যের প্রতি তাঁহার কি আজ্ঞা, কি করিলে তাঁহার কৃপায় জীবকুল সুখে জীবন যাপন করিয়া, অন্তে তাঁহার আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়, এই সকল বিষয় গভীর গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্তে আসিয়া পরে, প্রজাগণের নিকট প্রকাশ করা, রাজা-মহারাজগণেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। রাজা, মহারাজ, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদরী, সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতি সকলেরই বুঝা উচিত যে, আমরা যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ ঐ সকল অভিমান রাখিতেছি; এবং এখন, যে পরিমাণ সামর্থ্য, ভগবান্ যাঁহাকে যতটুকু দিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু শরীরত্যাগের পর সর্ব্ব অভিমানের সহিত সর্ব্ব শক্তিই অস্তমিত হইবে, তখন কেহই কোন অভিমান বা কার্য্য করিতে পারিবেন না। অতএব যতক্ষণ

ভগবান্ সামর্থ্য রাখিয়াছেন, সেই সময়ের মধ্যেই, শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া, ভগবানেরই সম্মান ও উপাসনা করিয়া, কৃতার্থ হওয়া বুদ্ধিমান মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহা করিলে, অসমর্থ অবস্থায়, কর্ত্তব্য-চ্যুতির, পরিতাপ করিবার প্রয়োজন হয় না। সময়ে সামর্থ্য থাকিতে, সৎকার্য্যে অবহেলা করিয়া, অসময়ে পরিতাপ করায়, কেবল কষ্টভোগই হয়।

বিষয়-লালসা আমাদিগকে একেবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এ কারণ, মৃত্যু উপস্থিত হইলেও, বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা, আমাদিগকে ত্যাগ করে না। বরং যাহাতে, বিষয়ের সুব্যবস্থা থাকে, সেই বিষয়েরই চিন্তা উপস্থিত হয়। যেন ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে,আমরাই কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ সর্ব্ব কালের জন্য এবং সর্ব্ব বিষয়েরই নিয়ামক হইয়াছি; এবং আমরা যাহাদিগকে, আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, জগতে তাহারাই প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বা বস্তু। কিন্তু বিচার করিলে দেখিবেন যে, সর্ব্ব কালের জন্য, সকল ব্যক্তি, ও বস্তু, ভগবানের আপনার ও প্রয়োজনীয়। তিনিই সকল ও সকলের। এজন্য তাঁহার শক্তি অসীম ও অপ্রতিহত এবং তাঁহার বিধানই সর্ব্বকালে স্থায়ী আছে ও থাকিবে। এ কারণ তাঁহার বিধান প্রবর্ত্তিত হইলে, জীবকুল সুখে জন্ম ও মরণকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব যাহাতে মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের বিধান-মত পরিচালিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; এবং ইহা সমাধা করিবার জন্য, শক্তিমান্ রাজা, মহারাজ, বাদশাহগণের বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত। কারণ, জগতে রাজা-মহারাজ-গণই ধর্ম্মরাজ বা ভগবানের ধর্ম্ম-মূর্ত্তি। রাজ্যে শান্তি স্থাপনা,

যেমন রাজশক্তির বিশেষ কর্ত্তব্য, সেইরূপ যাহাতে শান্তিময়ের আশ্রয়ে ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে, জগৎ মঙ্গলময় হয়, তাহা বিচার-পূর্ব্বক স্থাপনের চেষ্টা করাও বিশেষ আবশ্যক। কারণ, প্রজা সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্ম্মিক হইলে শান্তি, আপনিই বিরাজ করেন। নচেৎ শান্তি স্থাপন অসম্ভব।

প্রীতিদ্বারা যে কার্য্য ঘটে, উহা সহজসাধ্য ও স্থায়ী হয়। বুদ্ধির উপর যে কার্য্যের ভার পড়ে, তাহাতে প্রীতির সম্ভাবনা অধিক। বিচারশক্তি, বুদ্ধির পরিচালক; যাহাতে সুবিচার দ্বারা জগতে সত্যধর্ম্মের প্রচার হয়, তাহার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রকার শান্তি স্থাপনার ভিত্তি। অতএব ধর্ম্মের বিচার সমাপ্ত করিয়া, ধর্ম্মপতি রাজা-মহারাজদিগের সৎধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হওয়াও, একটী, প্রধান কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মকেই সর্ব্ব সুখ-শান্তির মূল বলিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রেরই বুঝা ও বুঝান আবশ্যক। নচেৎ জগৎ হইতে দুঃখ অশান্তির নির্ব্বাসন অসম্ভব।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

অনুতাপ ও অনুশাসন।

পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য অনুতাপ ও অনুশাসন উভয়েরই প্রয়োজন। এ কারণ ইহাদের যথার্থ ভাব অনুসন্ধানের আবশ্যকতা আছে। এই যে, জগৎ ও জীব, এক মাত্র পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হইয়া আপন আনন্দভাব হইতে বিচ্যুতি-বশতঃ নানা প্রকার কষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে, আসক্তিই এই কষ্টের কারণ, ইহা

বুঝিয়া, দুঃখের উপশমের জন্য, কায়মনোবাক্যের সহিত, সে ভাবে থাকিলে, অনিবার্য্য কষ্টকে সহ্য করিয়া পরমানন্দ লাভ হয়, সেই-ভাবে অবস্থান করিবার চেষ্টার অবিরল প্রবাহের নাম অনুতাপ। ইহা মনকে আশ্রয় করিয়া,বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, এবং মনবুদ্ধিই এই ভাব গ্রহণে সমর্থ,একারণ ইহাকে মনেরই বিষয়.বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কিন্তু, ইহা প্রকাশ হইলে, কেবলমাত্র মনের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। ইহার বিস্তার, যেমন, বুদ্ধি ও ভাবের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়, স্থূল শরীর ও কার্য্যের দিকেও বিস্তার পায়। এই অনুতাপকে হৃদয়ে প্রজ্বলিত রাখিয়া, যেরূপ ব্যবহার করিলে অনুতাপ নিবারণ হয়, তাহার চেষ্টার নামই সাধনা। অতএব অনুতাপ কেবলমাত্র মনেরই বিষয় নহে, উহা কায়, মন,বাক্য— তিনেরই ব্যবহারের বিষয়। অনুশাসনও তাহাই; কারণ, যাহা করিলে, এই জগৎ রূপ ভিন্নভিন্নভাব, আনন্দে, জীব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই পরমাত্মার আজ্ঞা বা জীব ও জগৎ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ থাকিয়া আনন্দে কার্য্য করিবার রীতি। কার্য্য সকল স্থূলকে অবলম্বন করিয়া প্রথম প্রকাশ হয়; একারণ, ইহাকে স্থূলের বিষয় বলিলেও, উহা ক্রমে, মন বুদ্ধির ও ভাবে প্রবাহিত হইয়া, অনুতাপের সহিত পূর্ণমাত্রায় একরূপ ধারণ করে। এ অবস্থায়, অনুতাপ ও অনুশাসনকে, কোন প্রকারে, পৃথক্ রূপে অনুভব করা যায় না; এবং তখন ইহাদিগকে একই সাধনা নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এখন বুঝা প্রয়োজন, অনুতাপও যেমন কেবলমাত্র মনের ভাব নহে, সেইরূপ অনুশাসনও কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম নয়। উভয়েই এক সাধনার, ভিন্ন ক্রম মাত্র।

যাহার অনুতাপ নাই, তাহার অনুশাসন রক্ষা করা হয় না, এবং অনুশাসন দ্বারা যাহার শরীর ব্যবহৃত নহে, তাহার অনুতাপ শব্দ, শব্দ ভাবে সত্য হইলেও, বাস্তব নহে। কারণ, অনুতাপ আসিলে মনবুদ্ধি, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অবস্থা যাহা হইবে, অনুশাসনেও মনবুদ্ধি শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থা তাহাই হইবে। যেমন একজন ব্যক্তির শোক লাগিলে, তাহার শরীরের যে অবস্থা হয়, কোন প্রকারে শরীরের সেই অবস্থা আনিতে পারিলেও, মনে, শোকেরই অনুভূতি হইবে। পরমেশ্বরের উপাসনার সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই। একারণ জগতে উপাসনার দুইটি দিক্ বা প্রকরণ বা উপকরণ ভাবিয়া, উপাসনার ভিন্ন পদ্ধতি স্বীকার করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি নাই। একই ভাব, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মনে, বহু বা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ পায়। একারণ হিন্দুশাস্ত্রে যোগ ও যোগক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য একই; এবং যে কোন ভাব হইতে উহা আরম্ভ হউক না কেন, শেষ অবস্থা, বিস্তার, সমাপ্তি বা ফলাফল অভিন্ন। অতএব উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যাহার পক্ষে, যেটি প্রথম অবলম্বন করা সহজসাধ্য, তাহা গ্রহণ করিয়া, পরমানন্দলাভের চেষ্টা করাই, মঙ্গলকর; নচেৎ আত্মার মঙ্গল বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া মন বুদ্ধি ও শরীরের ব্যবহার মনুষ্য জন্মের অপব্যবহার রূপেই পরিণত হইয়া, কষ্টেরই কারণ হয়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

— —

প্রচার ও প্রেরণা।

কি শুভ, কি অশুভ, উভয়বিধ কার্য্য ও ভাব প্রচার ও প্রেরণা হইয়া জগতে বিস্তারিত হয়। ইহা একটি জাগতিক নিয়ম। যতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ ইহাও থাকিবে। কারণ, ইহা, জগতের একটি স্বধর্ম্ম। অতএব, এই প্রচার ও প্রেরণা, যাহাতে জীবের মঙ্গলকর হয়, তাহা অবশ্যই বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের প্রার্থনীয়। এইজন্যই প্রচার ও প্রেরণা কাহাকে বলে এবং কি করিলে শুভমূর্ত্তিতে ইহাদের বিকাশ হয়, তাহা বুঝা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ আমরা ভালমন্দ বিষয়ের ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া, উহা অপরের গ্রহণীয় হউক, এই ইচ্ছা রাখাকেই প্রচার শব্দে ব্যবহার করি; এবং আপন ইচ্ছাকে ফলবতী করিবার জন্য অপরকে যে কার্য্যে রত করাইবার চেষ্টা, তাঁহার নাম প্রেরণা বলি। এই ভাবে লক্ষ্য করিলে, প্রচার ও প্রেরণাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক প্রচার ও প্রেরণা একই। বিচার করিলে বুঝা যায় যে, কি প্রচার কি প্রেরণা, উভয়ের মধ্যে, একই ইচ্ছাশক্তিকে অপরের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা রহিয়াছে; এবং যাবৎ ঐ কার্য্য না হয়, তাবৎ প্রচার বা প্রেরণার ফল, অসম্পূর্ণ থাকে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে প্রেচার বা প্রেরণা, তাহা সিদ্ধ না হইলে প্রচার বা প্রেরণা করা বা না করা, উভয়ই সমান হয়। একারণ যে প্রচার বা প্রেরণা, কার্য্যে প্রকাশ না পায়, তাহা ব্যর্থ, অর্থাৎ শক্তির অপব্যবহার। এই অপব্যবহার শব্দ, জীবের ইচ্ছাশক্তির উপরেই লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার। নচেৎ পূর্ণের শক্তি কখন ব্যর্থ হয় না।

কার্য্যের জন্যই প্রচার ও প্রেরণা আবশ্যক। অথবা প্রচার ও

প্রেরণা, একই কর্ম্মবীজের দুইটি অংশ। প্রবৃত্তি ইহার অঙ্কুর, ইচ্ছা ইহার জীবনবারি, জগৎ ইহার ক্ষেত্র, সৎ ও অসদ্‌গুণ ইহার শাখা প্রশাখা, সুখ, দুঃখই ইহার ফলস্বরূপ। এই প্রচার ও প্রেরণা, দুই ভাবে প্রকাশ হয়। যখন জীবের ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার দেখি, তখন জীবের কর্তৃত্ব এবং যখন জীবের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ হয়, তখন ব্রহ্মের বা স্বভাবের কর্ত্তৃত্ব আরোপ করি'। এখানে ব্রহ্ম বা স্বভাব কর্ত্তৃক প্রচার বা প্রেরণার বিষয় লক্ষ্যশূন্য হইয়া, মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বাধীন প্রচার ও প্রেরণার বিষয়ই বুঝিবার আবশ্যক। যাহাতে মনুষ্য ইহার সত্য ভাব অবগত হইয়া, আপন শক্তির সদ্‌ব্যবহারে কৃতার্থ হন।

কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল অবস্থার সহিত ব্যক্তিভাব লইয়া, মনুষ্য পূর্ণাবয়ব-বিশিষ্ট। পদার্থ ভাবে ধরিলে, এই তিন অবস্থায় তিন জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত, অহঙ্কারভাবের প্রকাশ বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটীকে পৃথক্ পৃথক্ ধারণা করিয়া, একএকটীর বলাবলের বিচার করিলে, দেখা যায় যে, স্থূলের অপেক্ষা সূক্ষ্মের এবং সূক্ষ্ম অপেক্ষা কারণের শক্তি প্রবল। এরূপ বলের প্রাধান্য, ব্যক্তিকেই অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। অর্থাৎ যে অবস্থা, ব্যক্তিভাবের বা ব্যক্তিবস্তুর, যত নিকট, তাঁহার বল তত অধিক। ব্যক্তি আছে বলিয়াই তাহার অবস্থা, এবং অবস্থা না থাকিলে ব্যক্তি অপরের নিকট প্রকাশ না থাকিলেও নষ্ট হন না, অতএব ব্যক্তিকেই সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্ বা প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এবং ইচ্ছাশক্তি ব্যক্তিতেই অবস্থান করে বলিয়াই, ইচ্ছা দ্বারা অবস্থা ও কার্য্য সকল পরিচালিত হয়। এই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইবার পথস্বরূপ প্রচার ও প্রেরণা। ইচ্ছা

সুখ-শান্তিই চাহে। শুভকার্য্যই সুখশান্তির আধার, একারণ যাহাতে জগতে শুভ কর্ম্মের প্রচার ও প্রেরণা হয়, তাহা জীব মাত্রেরই প্রার্থনীয়। এখন দেখা প্রয়োজন, কিসে শুভকার্য্য প্রকৃষ্টরূপে জগতে বিস্তার লাভ করে।

প্রীতিই ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করায়। অথবা স্বাধীনভাবে ব্যক্তির প্রকাশ অবস্থার নামই আনন্দ বা প্রীতি। পরাধীনতার বলের অপেক্ষা, সাধনতার শক্তি অপ্রতিহত। একারণ প্রীতিযুক্ত কার্য্যে ফলের সম্ভাবনা অধিক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত অবস্থা, রূপ, গুণ, শক্তি; এবং ব্যক্তি-ভাবের বলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এবং প্রীতিই ব্যক্তিভাবের স্বাধীন প্রকাশ, অতএব প্রীতিপূর্ব্বক, যে ব্যক্তি যে কার্য্যে রত হয়, তাহাই তাহার পক্ষে পূর্ণমাত্রায় প্রচার ও প্রেরণা করা। যেমন প্রীতিই ব্যক্তি-ভাবের বিশেষ নিকট ভাব, সেইরূপ প্রীতিপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানও প্রচার ও প্রেরণার নিকট অবস্থা। ইহাতে লক্ষ্যশূন্য হইয়া যে প্রচার বা প্রেরণা, তাহা শব্দমাত্রের বিস্তার মাত্র। অতএব প্রীতিপূর্ব্বক সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানই প্রচার ও প্রেরণার মূল। এজন্যই আস্ফালনহীন নির্জ্জনবাসী সৎকর্ম্মীর ভাব, বাগ্‌বিতণ্ডা-কারী ন্যায়-বিজ্ঞান-যুক্ত কর্ম্মহীন ব্যক্তির দেশ-প্রতিধ্বনিত গগনভেদী বাক্যবাণাপেক্ষাও তীক্ষ্ণ ও কার্য্যকারী হয়। ইহার মূল কারণ তাঁহাদের ব্যক্তিভাবের উপস্থিতি, কার্য্যের সহিত সর্ব্বদাই যুক্ত থাকে এবং তাঁহাদের আপন বা আত্মার হিতেচ্ছা, কার্য্যের সহিত নিহিত থাকায়, ঐ কার্য্যের স্রোত জনাকীর্ণ নগরেও উপস্থিত হইয়া জীবের মঙ্গলেচ্ছা ও কর্ম্মকে উদ্‌বোধিত করে। এইজন্যই তাঁহাদের প্রচার ও প্রেরণা অধিক ফলবতী হয়; এবং উহা

পরমাত্মার প্রেরণা বলিয়াই কখন নিষ্ফল হয় না। সময়ে উহা কার্য্যে প্রকাশ হইবেই হইবে। অতএব পরমাত্মার প্রেরণা বুঝিয়া প্রচার বা প্রেরণা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য; তাহাতে নিজের সহিত জগতের হিত অনুষ্ঠিত হয়। আত্মার হিত হউক, এই ইচ্ছার সহিত হিতকর কার্য্য করাকেই যথার্থ প্রচার ও প্রেরণা বুঝা আবশ্যক।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

অবতার ও অবতরণিকা।

পরমাত্মা ব্যতীত যখন অপর কেহই নাই, তখন পরমাত্মা, জগতে অবতীর্ণ হইবেন কি প্রকারে? যদি জীবভাবে ও ব্রহ্মভাব প্রকাশ থাকিয়া কার্য্য হইলে, অবতার নাম হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্‌গণকে অবতার বলা হয় না কেন? সমস্ত জীবই ব্রহ্মভাব হইতে জীবভাবে প্রকাশ এবং জীবভাব অস্তমিত হইলে ব্রহ্মভাবেই স্থিত থাকেন। এই ভাবে বিচার করিলে অবতার বলিয়া বিশেষ কিছুই ভাব পাওয়া যায় না। অবতার শব্দ একটি ইচ্ছামত শব্দের ব্যবহার দাঁড়ায়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

অবতার বলিবার বিশেষ কারণ, যেমন, একটি পুস্তক লিখিতে হইলে, তাহার অবতরণিকা করা হয়, অর্থাৎ পুস্তকের মধ্যে যে সকল ভাব আছে, তাহার সন্ধান দেওয়া যায়, সেই প্রকার জগৎস্রোত চালাইবার পূর্ব্বে, ব্রহ্মের যে শক্তি জীবস্রোতের ভাব পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাপন করেন, বা প্রথম প্রকাশ পান, তাঁহারই নাম

অবতার অর্থাৎ পরমাত্মা কোন নূতন ভাবাদিকে বা শক্তি প্রথম একটী শরীরে ফুটাইয়া সর্ব্বজীবে প্রকাশ করেন; এবং পরে ঐ জীবশক্তি ব্রহ্মশক্তির সহিত অভেদে অবস্থানকালে ঐ জীবচরিত্র, ইচ্ছা ও তাহার সফলতার প্রয়োজনানুসারে, জগতে নূতন ভাবেরই শক্তি সঞ্চার ও ক্রিয়ার প্রকাশ হইতে থাকে এবং ঐ জীবশক্তি শরীরী অবস্থায় আপনাকে ব্রহ্ম হইতে কখন ভেদভাব রাখেন না। এ কারণ তাঁহাকে পরমাত্মার অবতার মূর্ত্তি বলা হয়। তিনিই অবতার, যাঁহার শরীরী অবস্থায়, ইচ্ছা, শরীরী অবস্থায় ক্রিয়ারূপে পূর্ণ বিকাশ না হইলেও, শরীরত্যাগের পর হইতে জগতে প্রকাশ হইতে থাকে। অথবা জগতে, ভাবের ও ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্রোত ফিরাইয়া চালাইবার জন্য পরমাত্মার জীবশরীর-রূপ যন্ত্রই পরমাত্মার অবতার মূর্ত্তি।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

বিদ্যা ও শিক্ষা।

যাহা, জ্ঞানের প্রকাশের সহায় অথবা জ্ঞানের রূপ, তাহার নাম বিদ্যা। একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়ও, বিদ্যা নামে পরিচিত। বিদ্যার ন্যায়, শিক্ষাও দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম—জ্ঞানবান্ ব্যক্তির নিকট হইতে বাক্যের সাহায্যে ভাবের সংক্রমণ; দ্বিতীয়—চেতনা, জ্ঞান বা ভাবের মূর্ত্তিমান্ প্রকাশ হইতে, অনুভূতি, মনবুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া অন্তরে বা ব্যক্তি-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থিরভাবে থাকা। মনবুদ্ধিই ধারণার আধার।

সৎ অসৎ উভয়বিধ ধারণাই ইহাতে রক্ষিত। এক সময়ে যাহা বিশেষরূপ নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি বলিয়া ধারণা হয়, সময়ান্তরে তাহাও মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ পায়। বুদ্ধি সত্য নির্দ্ধারণের উপায় হইলেও, অভ্রান্ত নহে। একারণ বহির্ম্মুখ হইতে, যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে, সন্দেহ অহরহ। বহির্ম্মুখ হইতে যে বিদ্যার প্রকাশ, উহা বাহ্য বিদ্যা বা জগৎরূপ অবিদ্যারই অন্তর্গত এবং বিদ্যারূপ পরমাত্মার প্রকাশে যে বিদ্যা বা জ্ঞানের অভ্যুত্থান, যাহা মনবুদ্ধিকে অবশ রাখিয়া আবির্ভূত হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। এই বিদ্যাই জীবের সত্য ধারণার সহায়। একারণ সর্ব্ব-বেদশাস্ত্র-পারগ পণ্ডিত অপেক্ষা, সত্যপরায়ণ ভক্তের নিশ্চিততা স্থির, অচল, অটল। বাহ্য বিদ্যা লোকের নিকট শিক্ষা সম্ভবপর। কিন্তু তাহাও প্রথমে অন্তর হইতেই বাহিরে আসিয়াছে এবং আন্তর বিদ্যা, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ব্যতীত কাহারও দেয় নহে। একারণ সত্যনির্ণয় পক্ষে, কেবলমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়নাদিই সম্যক্‌রূপে ভ্রম নিবারণে অক্ষম নহে। বরং অনেক স্থলে, ভ্রমের উৎপত্তিই করিয়া থাকে।

ধরা হইল, শাস্ত্রলেখকগণ সত্য অনুভব করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া একজন পণ্ডিত হইলেন। যাহার যে অবস্থা কখন উদয় হয় নাই, তাহার পক্ষে সে অবস্থার সত্য ধারণা অসম্ভব। অতএব পণ্ডিত, সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রকারের ভাবলাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন। তাহার পর শিক্ষার্থীর অবস্থা। পণ্ডিত মহাশয় যাহা বুঝিয়াছেন, তিনি তাঁহার ভাবই যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইবেন বটে, কিন্তু শব্দ, ভাবের অপেক্ষা দরিদ্র। এরূপ স্থলে শিক্ষার্থী ঋষিবাক্যের কতটুকু পাইতে পারেন? এই কারণেই

সত্য জানিবার জন্য, সাধনা বা সত্যের প্রসাদ লাভের ব্যবস্থা! নচেৎ শব্দের দ্বারা, সত্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলে, সাধন কষ্টের ব্যবস্থা, নৃসংশ ব্যবহার হইত।

ভ্রমনিবারণার্থ এখানে, ইহাও প্রকাশ থাকা প্রয়োজন যে, বাহ্য বিদ্যা, ভাষাজ্ঞান বা শিক্ষাপদ্ধতির সংক্রমণাদি, নিষিদ্ধ নহে বরং উহা মন বুদ্ধির ও সাধনাকে সত্যলাভের উপযুক্ত করিবার প্রবৃত্তি ও প্রয়াস-সঞ্চারের সহায়তাই করে। অহঙ্কারী বা ভাক্ত জীবের পক্ষে বাহ্যবিদ্যা বিশেষ হানিকর, নচেৎ নিরভিমানী ভক্তের পক্ষে, সকল বিদ্যাই ব্রহ্মলাভেরই সহায়তা করে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ধারণা ও ধাবনা।

যেমন পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তিই জগতের লীলা, সেইরূপ জীবাত্মার মনই, জন্মজন্মান্তর ও ইহকাল পরকালের মূর্ত্তি। জীব, যাহা কল্পনা করিতে নাও পারেন, তাহাও পরমাত্মাতে স্থিত আছে। এ কারণ, মনুষ্যের মধ্যে, যাহা, সত্য বলিয়া ধারণা বা বিশ্বাস হয়, তাহা কোন না কোন ভাবে বা অবস্থায় জীবের প্রত্যক্ষ্য হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। এ কারণ, যে জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ, সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, অবস্থা বা ভাবের সত্যতা রক্ষা না করিয়া উদয় হয়, উহা অবিচারে গ্রহণ করিলে, মিথ্যার ধারণাই হইয়া পড়ে। নচেৎ, উহা সর্ব্বব্যক্তি ও সর্ব্ব ভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রকাশ হইলে, উহাকে সত্য বলিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই।

লোকের বুঝা প্রয়োজন, কোন এক বিষয় সত্য বা মিথ্যা হইলে, জীবের কি আসে বা যায়। যাহাতে জীবের আসে যায়, তাহা লইয়াই জীবের প্রয়োজন, এবং মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য, সে বিষয় রহিয়াছে, তাহার বিচার আবশ্যক। নচেৎ বিচার ব্যর্থ, ও কষ্টেরই কারণ মাত্র হয়।

হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের মধ্যে, কতকগুলি বিষয় বিশেষরূপ পৃথক্ পৃথক্ ধারণা আছে; যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে মোক্ষ, কৈবল্য, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ, নরক, পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম প্রভৃতি। মুসলমান ও খৃষ্টানগণের মধ্যে পূর্ব্ব ও পরজন্মের অস্বীকার, স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি, বৌদ্ধের অসংখ্য জন্মজন্মান্তর, বুদ্ধত্ব ও নির্ব্বাণলাভ প্রভৃতি। আহার সম্বন্ধেও সেইরূপ বিভেদ বর্ত্তমান। এবং একের নিষিদ্ধ, অপরের করণীয়; এবং উপাসনা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়েও, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদ্ধতি দেখা যায়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সকলেরই মূল উদ্দেশ্য এক। যাহাতে জীবমাত্রেই অনন্তকাল সুখসচ্ছন্দে বা শান্তিতে থাকিতে পারে, তাহারই উপর লক্ষ্য রাখিয়া, সকল প্রকার ভেদ স্থিত। এ ভেদ বাস্তবিক পক্ষে আত্মার নহে, জগত, ভেদময় বলিয়াই, ভেদ সর্ব্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইতেছে। একারণ যত দিন পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদত্ব না হয়, ততদিন, এ ভেদ, মনের দ্বারা যত্নে রক্ষিত হইয়া, জাগতিক ভেদের অঙ্গের শোভাবৃদ্ধি করিতেছে মাত্র; এবং পরমাত্মাতে কোন শক্তি বা ভাবেরই অভাব নাই বলিয়াই অবস্থাভেদে ঐ সকল জ্ঞানও প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে প্রকাশ হয়। যেমন, যে ব্যক্তির, ভূতের সংস্কার আছে, তাহার পক্ষে, এইজাতীয় সর্ব্বপ্রকার ভাবই প্রত্যক্ষ হওয়া

সম্ভব ; এবং যাহার, নাইবলিয়া সংস্কার আছে, তাহার পক্ষেও এ ভাব প্রত্যক্ষ হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই থাকা ও না থাকা, উভয় ভাবের ভেদ বুঝিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে থাকিলেও নাই এবং না থাকিলেও আছে ; এবং তিনি, এই আছে ও নাই ভাবের, অতীত অবস্থায় থাকিয়া, কোন ভাবের দ্বারা বদ্ধ নই থাকেন না ; এবং তিনিই বুঝেন, যে ধারণাই একমাত্র ধাবণার মূল। মনুষ্য যাহা ধারণা করে, তাহাই স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে ধাবিত হয়। এই জন্যই কেহ একই স্বর্গে ইন্দ্ররাজাকে, কেহ বা আল্লা খোদা মহম্মদকে,আর কেহ বা ঈশ্বর, খৃষ্ট বা বুদ্ধ আদি মহাত্মা-দিগকে বসিয়া থাকিতে দেখেন। এবং কাহারও মৃত্যুরপর পিণ্ড, কাহারও নেমাজ, আর কাহারও ~~বা বাইবেল~~ দেওয়া প্রয়োজন হয় এবং না দিলে, মৃত ব্যক্তির আত্মা আসিয়া ঐ সকল প্রার্থনা করে। এইরূপ একই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব লাভের কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকারীদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। নচেৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার ইচ্ছায় যাহা আছে, উহা সর্ব্ব লোকের জন্য একই ব্যবস্থা। এ কারণ সর্ব্বপ্রকার বৈপরীত্যকে অন্তর্গত করিয়া বৈপরীত্য ত্যাগ না করিতে পারিলে, শান্তির আশা নাই। প্রতি দ্বন্দ্বী ভাবই সর্ব্ব কষ্টের কারণ বা আগতি ও দুঃখ বা অভাব। এই ভাব উঠাইবার জন্যই সাধনা বা সত্যের ধ্যান ধারণা। এই ভাব অন্তরে রাখিয়া কার্য্য করিলেই তবে সত্যের প্রতি ধারণা করা হয়। এইরূপ ধারণা ও ধাবণাই শান্তির উপায়।

মনুষ্য যথার্থ সত্যের ভাব ধারণা না করিয়াই, আপন আপন দধিকে মিষ্ট ও অপরের দধীকে অম্ল বলিয়া প্রকাশ করেন। এই

ভাবই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠনের ভিত্তি। অতএব যাহাতে এই ভিত্তির যথার্থ ভাব বুঝিয়া, একেরই উপর সকল ভিত্তিই অবস্থিত হইয়া, মনুষ্য মাত্রেই পরস্পর মিলিত হন এবং পরমাত্মার আজ্ঞা পালন ও জীবহিতে ব্রতী হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য। যাহা সকলেরই পক্ষে সর্ব্ব কালের জন্য সুখ ও শান্তিকর, উহাই যথার্থ সত্য ও পালনীয় এবং যাহা দুঃখ ও অশান্তির কারণ, উহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগের উপযুক্ত। কিন্তু কি সত্য, কি মিথ্যা, কোন ভাবই যাহাতে বিবাদ, বিসংবাদ ও অশান্তির কারণ না হয়, তাহা বুঝিবার জন্য, এই সত্য-মিথ্যার অতীত যে ব্রহ্মবস্তু বা ব্যক্তির, ও তাঁহাকে ধারণা ও তাঁহার দিকেই ধাবিত হইবার ও করিবার চেষ্টা জ্ঞানী মাত্রেরই প্রথম কর্ত্তব্য। বিবাদের শান্তির জন্যই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, নচেৎ বিবাদের সহায়তা করিবার জন্য, বা দুঃখ উৎপন্নের নিমিত্যকরূপ, ধর্ম্ম প্রকাশ হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

কোন ভাব কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা ধারণাই হয় না বা ঐ ধারণা এতই অকিঞ্চিৎকর, যে উহা মনেও প্রকাশ পায় না। এজন্য মনের সাহায্যে, ইন্দ্রিয়ে ধারণা বা ভাব রক্ষিত হইলে উহা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ে, বিষয় জ্ঞানেরই আস্বাদ-দানে সমর্থ হয়। কিন্তু উহা মনের দ্বারা ধারণা করিলে, মন ও ইন্দ্রিয় উভয় ভাবে প্রত্যক্ষ, এবং আত্মা দ্বারা ধারণা করিলে, আত্মা, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়েও প্রত্যক্ষ হয়। কারণ, আত্মারই রূপ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়। এজন্য যাহা আত্মার দ্বারা ধৃত না হয়, তাহার পূর্ণ আস্বাদ অপ্রাপ্ত থাকে। অতএব আত্মা দ্বারা ধারণাই প্রকৃষ্ট

এই যে জীবাত্মা, শরীরি ব্যক্তিভাবাপন্ন নাম রূপে প্রকাশ ও ব্যবহারে আসিলেই, ব্যষ্টি ক্রিয়াশীল ও উদয়াস্তযুক্ত হন। কিন্তু যদি এই জীবাত্মা, ভোগাতীত অবস্থায় আপনাকে নিত্য বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা হইলে আর জীবাত্মাকে অন্যান্য জীবাত্মার বন্ধনের ন্যায়, বন্ধন-বেদনা ভোগ করিতে হয় না। ইহাই জাগতিক নিয়মে জীবাত্মার ধ্রুবভাব। যেমন ধ্রুবতারা চিরকাল একভাবে প্রকাশ আছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও ব্রহ্মকৃপায় চিরকাল, একই অবস্থায় স্থির থাকিতে পারেন বা থাকেন। এই স্থির অবস্থায় থাকিবার জন্যই জগৎরূপ ভোগের পরপারে যাইবার বিধি। জীব যতক্ষণ ভোগাভোগের অতীত না হন, ততক্ষণ, তিনি আপনাকে জগৎরূপ শরীরিভাবযুক্ত বলিয়াই মনে করিবেন। এবং তাহাকে ইন্দ্রিয় সমন্বিত হইয়া, গ্রহরূপে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভোগ্য, ভোগ ও ভোক্তা ভাব, ততক্ষণ জন্ম, মরণ, পুনর্জন্মভাব, জীবে বোধ হইতে থাকে; এবং এই তিন ভাবকে, যিনি আপনারই তিন অবস্থা বলিয়া জ্ঞাত হন, তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগ করিয়াও ভোগাতীত থাকেন এবং লক্ষ লক্ষ বার, জগতে শরীর ধারণ করা সত্ত্বেও তাঁহার পক্ষে শরীর বলিয়া পৃথক্ কোন পদার্থ বা শরিরী বলিয়া কোন অবস্থা বোধ হয় না। তিনি আপনাকে নিত্য একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়াই অনুভবে রাখেন। যেমন পরমাত্মা সর্ব্ব ক্রিয়া করিয়াও ক্রিয়াতীত, ব্রহ্মজ্ঞ সম্বন্ধেও, সেইরূপ সকল বিষয়ের ব্যবহার ও প্রকাশাপ্রকাশ ভাব বুঝা প্রয়োজন। তারারূপ জীবাত্মার এই স্থিররূপ অবস্থা লাভ হইলে, সেই জীবেরই নাম ধ্রুবতারা বা ধ্রুবলোকবাসী নাম হয়; অর্থাৎ

জীবাত্মার নিত্য ভাবে অবস্থান অবস্থায়, জীবাত্মাকেই ধ্রুবতারা বলিয়া বুঝা আবশ্যক।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঃ শান্তিঃ।

প্রকৃতি ও পুরুষ।

দৈব ও পুরুষার।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই শব্দের মধ্যে একের মাহাত্ম্য ও অপরের খর্ব্বতা করিয়া জগদ্বাসী দ্বেষ হিংসা পক্ষপাত বশতঃ নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন। ইহার তত্ত্ব অবগত হইলে জীবের বিশেষ মঙ্গল। এ কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষ, কাহাকে বলে, সে বিষয়ে বিচার প্রয়োজন।

ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন, ভাব গ্রহণ করা,মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। এ কারণ, প্রকৃতি শব্দ দ্বারা জড়জগৎ, এবং পুরুষ শব্দ দ্বারা, চেতনাকে লক্ষ্য করা হয়। আর কতক লোক প্রকৃতি শব্দ দ্বারা স্ত্রীমূর্ত্তির দেবী এবং পুরুষ বলিলে, পুরুষ মূর্ত্তির দেবতা কল্পনা করেন। কিন্তু যথার্থ পক্ষে প্রকৃতি বা পুরুষ, কি বস্তুতঃ কি প্রকাশ ভাবে, এক—অভিন্ন। উভয়ই ব্রহ্ম প্রকাশ। এই প্রকাশ ভোগ্য অথবা আস্বাদ ভাবে প্রকাশ হইলে, প্রকৃতি ; এবং ভোক্তা অর্থাৎ ব্যক্তিভাবে প্রকাশ হইলে পুরুষ নাম হয়। পদার্থ একই প্রকাশ। কি প্রকৃতি কি পুরুষ, কখনই একাকী বর্ত্তমান থাকেন না। একই বস্তু, দুই ভাবে প্রকাশ থাকিলেই তবে, প্রকৃতি পুরুষ

ধারণা। এইরূপে ধারণা হইলে, যে ভাব ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, তাহাই মূল ধারণা বলিয়া বুঝা প্রয়োজন।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ধ্রুবতারা।

সন্ধ্যা-সমাগমে যেমন এক একটি তারা ফুটিয়া, ক্রমে পুঞ্জ পুঞ্জ বহু নক্ষত্র, পুঞ্জাকারে বহু তারা নামে একই প্রকাশ বর্ণিত হইয়া, বহু রূপ-গুণে, বহু লীলাবিশিষ্ট কার্য্য, নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ দ্বৈতভাবপ্রকাশের সহিত, এক একটি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে সমাজ, সম্প্রদায়, আত্মীয়তা, শত্রুতা প্রভৃতি ভাবে গণ্ডীর উপর গণ্ডীবদ্ধ হইয়া, জীবনতরঙ্গের উপর নৃত্যারম্ভ করিয়া, কতই রূপগুণ, কতই শক্তি, কতই মাধুর্য্য, কতই বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কতই সাধন ভজন এবং এই সকলের কতই বিপরীত রঙ্গে, প্রকাশ পাইয়া, উঠা পড়া করিতে থাকে। আবার যেমন, চক্রগতিতে তারাগণ ক্রমে পশ্চিমাচলে গমন করে এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাপন, রূপ, গুণ, নামের পরিহার করিয়া, যে আকাশে ফুটিয়াছিল, তাহাতেই ক্রমে ম্লান হইয়া আপন ভিন্ন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, সেইরূপ কালপ্রভাবে জীবও মুকুলিত হইয়া, অবস্থার বা ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন করিতে করিতে মৃত্যুর আগমনের পূর্ব্বেই, আপন পৃথক্ অস্তিত্বের ভিত্তি হইতে সরিয়া আসিয়া, আপন ও পরের নাম, রূপ

গুণ, শক্তি, ভুলিতে ভুলিতে, ব্যষ্টিপ্রকাশকে জলাঞ্জলি দিয়া, যে নিত্য প্রকাশ হইতে প্রকাশ, তাঁহারই কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। ইহাই 'এই জগতের স্থির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বলিয়াই প্রত্যক্ষ। এ নিয়ম বিধাতা পরিবর্ত্তন করিবেন কি না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু ধ্রুব তারা যেমন স্থির, গতিরহিত, কেবল সূর্য্যকিরণে অদৃষ্ট ও রজনীর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিন একই স্থানে প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ সত্যে একনিষ্ঠ ব্যক্তি, অনন্তকাল অসংখ্যবার জীবরূপে প্রকাশ হইলেও একই ভাবে লীলতরঙ্গে নৃত্য করিয়া, মৃত্যুর আগমনে লোকচক্ষে অদৃশ্য হইয়া যান। ইহাও জাগতিক বিধির বহির্ভূত নহে। যে অবস্থা বশতঃ, ধ্রুবতারার স্থিতি, অপরিবর্ত্তনীয়, সেই অবস্থা জীবে ঘটিলে, জীবও অপরিবর্ত্তনীয় একই নিত্য অবস্থায় অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। এই অবস্থা লাভের জন্যই সাধনা বা "ধ্রুব সিদ্ধিলাভের আবশ্যক হয়।

ধ্রুব অর্থে স্থির নিশ্চয়। নিশ্চিতরূপে স্থির প্রকাশই ধ্রুবতারা। যেমন ধ্রুবতারা সৌর জগৎ হইতে বহুদূরে আছে বলিয়া ইহার গতিবিধি বা উদয় অস্ত হয় না, সেইরূপ যে জীবাত্মা জ্ঞানাতীত ইন্দ্রিয়াতীত অহঙ্কারাতীত অবস্থায় প্রকাশ মাত্রে অবস্থান করেন, তিনিও ধ্রুবতারার ন্যায়, বিষয়ভোগশক্তিরূপ জগৎ হইতে, বহুদূরে অবস্থিতি করেন বলিয়া, উদয়াস্তরূপ সুখ-দুঃখবর্জ্জিত, নিত্য একরস আনন্দমাত্রে প্রকাশ বা বর্ত্তমান থাকেন। যাহাতে জীব আপনাকে, ধ্রুবতারার ন্যায় অবিচলিত প্রকাশ মাত্র স্থিত রাখিতে পারেন, সেই জন্যই ধ্রুবতারার প্রকাশ) স্থিরতার উপমা রূপে জগতে দৃশ্য রহিয়াছে।

উভয়ভাব বোধ হয়। নচেৎ কোন এক ভাব সম্যক্‌রূপ অন্তগত হইলে, ব্রহ্ম অব্যক্ত যাহা তাহাই থাকেন।

যেমন মাতার উদরস্থ ভ্রূণ,—মাতৃরস গ্রহণ করিয়া রক্ষা হইবার সময় মাতৃশক্তি প্রকৃতিরূপ, এবং ভূমিষ্ট হইবার পর মাতৃদুগ্ধে প্রতিপালিত হইবার সময়, মাতৃশক্তি পুরুষভাবে কার্য্য করেন। অর্থাৎ চেতনাশক্তি, কেবল মাত্র আস্বাদ বা ভাবে প্রকাশ থাকিলে প্রকৃতি, এবং অহংবুদ্ধির সহিত কর্ত্তৃত্বাভিমান বা ব্যক্তিভাবে প্রকাশ থাকিয়া কার্য্যাভিমানযুক্ত অবস্থায় চেতনা বা প্রকাশের পুরুষ নাম হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই দুই ভাব সর্ব্বদাই একত্রে, প্রকাশপদার্থেই বর্ত্তমান আছে। এইজন্য পুরুষভাবও, যখন অপর ব্যক্তির দ্বারা অনুভূত হয়, তখন উহাও প্রকৃতিভাবের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। ভাবান্তরে এই প্রকাশই দৈব ও পুরুষকার নামে অভিহিত হন। যখন জীবব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্য হয়, তখন তাহাকে পুরুষকার এবং জীবের ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বের বহির্ভাগে কার্য্য হইলে, উহাকে দৈবনামে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াই, একই তাপ ও প্রকাশ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। যেমন যখন একটি জীব ইচ্ছামত উঠা বসা, নড়া ফেরা করে, তখনও অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্মের শক্তিতে ঘটে। আর পক্ষাঘাত হইয়া অবশ হইবার পরে, পরমাত্মার কৃপায় উত্থানশক্তি লাভ করিলে, ঐ উত্থানক্রিয়া অগ্নি ও বায়ু শক্তিরূপেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহাকে, তখন দৈবশক্তি বলিয়া প্রকাশ করাই মনুষ্যের স্বভাব। সেইরূপ অনবরত যেখানে যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহা এই মহাশক্তির দ্বারাই হইতেছে, ঐ শক্তি, ব্যষ্টির অধীনে বলিবার সময়, পুরুষাকার, আর পূর্ণের

আয়ত্তে রাখিবার জন্য, দৈব শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কি দৈব কি পুরুষকার, উভয়ই এক চেতনা শক্তরই কাল্পনিক ভাব-ভেদ। নচেৎ কি বস্তুতঃ, কি প্রকাশ বা ক্রিয়া গত, কোন ভেদই নাই। জীব, পরমাত্মাকে আপনা হইতে পৃথক্ কল্পনা করে বলিয়াই, এই সকল ভেদভাব জীবভাবে উদয় অস্ত হয় মাত্র।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

জ্ঞানাজ্ঞানের ব্যবহার-ভেদ।

অনেকেরই ধারণা, ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইলে, সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন জ্ঞানের সহিত, ব্যবহার, বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্রিয়া, প্রভৃতি বিষয়ও লোপ হইয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক।

প্রকাশই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানের মূল বা রূপ। যথায় এই প্রকাশের যত অভাব, তথায় তত পরিমাণ অজ্ঞানতা বর্ত্তমান। এই অজ্ঞানতাও জ্ঞানেরই বিষয়। অথবা জ্ঞানই অজ্ঞানতাকেই চিনিতে সমর্থ। নচেৎ অজ্ঞানতা, অজ্ঞানতাকে বুঝাইতেও সমর্থ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান—জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনকে সমভাবে বা এক করিয়া প্রকাশ হয়। এই প্রকাশেরই অবস্থাভেদে, এক, ভিন্ন ভিন্ন, ভিন্নাভিন্নের সহিত অভিন্নতা এবং কখন বা অব্যক্ত যাহা, তাহাই প্রকাশ হয়। কিন্তু এই সকল ভিন্নতাই এক একটি অবস্থা বা ভাব। ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাদের কোন অবস্থাতেই অপ্রকাশ থাকে না। যদি থাকিত, তাহা হইলে তথায় জ্ঞান বা প্রকাশের অভাবই বুঝিতে হইবে। অতএব

অভাবযুক্ত জ্ঞান, কখন ব্রহ্মজ্ঞান নামের যোগ্য নহে। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত, অন্যান্য জ্ঞানের বিভেদ এই যে, অন্যান্য জ্ঞান, কেবলমাত্র সেই সেই ভাবে প্রকাশ থাকিয়া, আপনার অবস্থাকে গণ্ডীতে রাখিয়া দেয়, ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বভাবে ও অবস্থাতে সমানভাবে প্রকাশ থাকিয়াও, কোন ভাব বা অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না।

অল্পমাত্র বিচারে বুঝা যায় যে, যে ব্রহ্মজ্ঞান জীবলাভ করিবে, উহা ব্রহ্মে সতত প্রকাশ আছে কি না? যাহা ব্রহ্মে প্রকাশ নাই, তাহা জীবের কোন কালে প্রাপ্তব্য নহে। যদি আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, তাঁহাতে, যে জ্ঞান প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ও অবস্থার অভাব নাই, সেই জ্ঞান জীবে প্রকাশ হইলে, সর্ব্বপ্রকার ভিন্নাভিন্ন জ্ঞানের সহিত অবস্থাদি কেমন করিয়া উঠিয়া যাইবে এবং উঠিয়া যাইবার প্রয়োজনই বা কি?

ক্রিয়াদির সহিত ব্যক্তিভাবের প্রকাশেই চেতনার অস্তিত্ব বোধ হয়। ক্রিয়াময় জগৎ বস্তু ও রূপ গুণ শক্তি ভাবাদি সমস্তই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মেরই। যাবৎ ব্রহ্ম তাবৎ এই সকল। যখন ব্রহ্ম নিত্য, তখন এ সকল কেমন করিয়া অনিত্য বা অভাবে পরিণত হইবে? যখন ব্রহ্মের অভাবের সম্ভাবনা নাই, তখন যাহা আছে, তাহারও কোন কালে অভাব হইবে না। অজ্ঞানই কতক আবৃত রাখিয়া, কখন ভাবরূপে, আর কখন অভাবরূপে বোধ ঘটায়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সর্ব্বভাবের প্রকাশের সহিত এই জ্ঞান অজ্ঞানের প্রকাশের ভেদাভেদ ও প্রত্যক্ষ থাকিবে। নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞানও তুচ্ছ জ্ঞানের ন্যায় একদেশী বা সীমাবিশিষ্ট একটি অবস্থা মাত্র হইয়া

পড়ে। অতএব অখণ্ড অসীম ব্রহ্মজ্ঞান, অভাবরহিত প্রকাশ মাত্র; এবং এই জ্ঞানে কোন ব্যবহার লোপ না হইয়া অসীম ব্যবহারকে ভিত্তি করিয়াই ব্যবহৃত হয়। নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্যবহার, সর্ব্বজ্ঞানের ও ব্যবহারের হরণকর্ত্তা হইলে, উহা কোন প্রয়োজনের বিষয় হইত না, অথবা জড়ত্বলাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের আদর বা সুখ্যাতি থাকিত। পরমাত্মা চৈতন্যময় আনন্দস্বরূপ। যে জ্ঞান ও ব্যবহার সর্ব্বপ্রকার অবস্থা ও কালে এবং ব্যবহার ও অব্যবহারে আনন্দেরই নিমিত্তক, তাহাই যথার্থ জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান; এবং এই ভাবে যাহা প্রকাশ থাকে বা কৃত হয়, তাহাই ব্রহ্ম-ব্যবহার।, ইহার বিপরীতই অজ্ঞান ও সত্যের অপব্যবহার।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

বিচার আচার।

শুচি বা পবিত্রতা।

আচার ও পবিত্রতা রক্ষার কথা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শুনা যায়; হিন্দুসমাজে ইহার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি বিশেষরূপেই কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কিন্তু বিচার না থাকায়, ইহা, উপযুক্ত রূপে পালিত না হওয়ায়, সুফলের পরিবর্ত্তে, অনেক সময় কুফলই প্রসব করিয়া থাকে।

প্রথম বিচার করা প্রয়োজন, আচার ও পবিত্রতা রক্ষা, আচার ও পবিত্রতার জন্য, কিম্বা জীবের হিতের জন্য, পালনীয়।

ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে, আচার বা পবিত্রতার জন্য আচার বা পবিত্রতাদির প্রয়োজন নাই, জীবের সুখশান্তি-রক্ষার জন্যই প্রয়োজন। কারণ, ফলাফল-ভোক্তা জীব। যেকার্য্য, জীবের সুখদুঃখের সহিত নিঃসম্বন্ধ, তাহাকে আচার বা অনাচার, পবিত্রতা বা অপবিত্রতা, যে নামেই অভিহিত কর না কেন, তাঁহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এবং উহা করা বা না করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিলেও বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্যের কোন প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু যাহা জীবের সুখদুঃখের সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহার বিষয় বিশেষ বিচার করিয়া করা বা নাকরা কর্ত্তব্য। অতএব যদি আচার বা পবিত্রতা রক্ষণীয়া হয়, তাহা হইলে, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক।

বস্তুবিচারে দেখা যায় যে, বস্তু, তাহার রূপ গুণ, শক্তির সহিত অনাদি কাল হইতে পবিত্রময়ই আছেন। এভাবে বিচার আচার বা পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই নাই বলিলেও চলে।

ব্যক্তিভাব ব্যতীত কোন অনুভব নাই। ব্যক্তিই সুখ, দুঃখ, আনন্দাদির অনুভব, করিবার কর্ত্তা। ব্যক্তিভাব, নিত্যানন্দ। এই নিত্যানন্দ রক্ষিত হইলে সুখ, এবং ইহার উপর আবরণ পড়িলেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। অতএব যে বিচার, আচার, শৌচ বা পবিত্রতা আনন্দের অনুকূল, তাহাই যথার্থ বিচার, আচার, বা পবিত্রতা। নচেৎ ইহার বিপরীত হইলে, উহাদিগকে অবিচার, অনাচার, অশৌচ বা অপবিত্রতাই বলা উচিত।

জীবের আনন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বুদ্ধি যাহা অনুমোদন করে, তাহারই নাম বিচার। এইরূপ বিচার করিয়া, ব্যক্তির পরমানন্দলাভের জন্য যাহা কৃত হয়, তাহারই নাম আচার;

এবং এই আচার রক্ষা করিয়া মনে যে নিশ্চিন্ততার উদয় হয়, তাহারই নাম শৌচ। এইরূপ ভাবে, শুচি অবস্থায় থাকা, মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কারণ, এই জাতীয় শৌচাচার ত্যাগ করিয়া কেহই সুখী থাকিতে পারেন না। নচেৎ সামাজিক কল্পিত আচার বা শৌচ ত্যাগ বা গ্রহণ করিলে, মনুষ্যের কিছুই আসে বা যায় না। কিন্তু ইহাও সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন আচার বা শৌচাদি, সমাজের প্রতিপালনীয় হইয়া আছে বলিয়াই উহার বিচার বা পালন নিষ্প্রয়োজনীয়, এরূপ মনে করা উচিত নহে। ঐ সকল আচার ও শৌচাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, উহা পালন বা ত্যাগে কি ফল উৎপন্ন হয়। যেমন কোন আচার সমাজে প্রচলিত আছে বলিয়াই ত্যাগ করিতে হইবে না, সেই প্রকার, কোন আচার সমাজের রীতি বলিয়াই পালনীয়ও নহে। প্রত্যেক শৌচাদি আচার ভিন্ন ভিন্ন ও সর্ব্ব আচারাদির সহিত মিলাইয়া, তবে উহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা আবশ্যক।

আমাদের হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাচার, লোকাচার ও লাচার এই ত্রিবিধ আচার প্রচলিত আছে। আচারে যেরূপই অন্যতা থাকুক না কেন, উহা অবশ্যই বিচারপূর্ব্বক ত্যাগ বা গ্রহণের বিষয় ; এবং তাহা না করিলে কষ্টভোগেরই সম্ভাবনা। যেমন এক সময় রাজাগণের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ প্রতিপালিত হইতেন। ঐ সময় দাসত্বাদি ব্রাহ্মণগণের পক্ষে গর্হিত কার্য্য বলিয়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে দাসত্ব না করাই আচার ছিল। এই আচার তখন ব্রাহ্মণের পক্ষে গর্হিতাচার বলা যাইতে পারিত। কারণ, অন্নের জন্যই দাসত্ব বা ব্যবসায়াদির প্রয়োজন। কিন্তু উপস্থিত

সময়ে যদি দাসত্ব বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবসায়, ব্রাহ্মণগণের অনাচার বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে, পানি-পাঁড়ে বা রসুয়ে—ঠাকুর প্রভৃতি হওয়া, কিসে অস্বাভাবিক হইবে? সামান্য একটু মাত্র তাকাইলেই, দেখিবেন, যে, যাঁহারা যত শীঘ্র, এই জাতীয় দেশাচার বা কুলাচার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরবর্ত্তী পূর্ব্বাচারত্যাগিগণের অপেক্ষা, অধিক পরিমাণে কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এইরূপে এতদ্দেশের আচারাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, দেখা যায় যে, অবিচারে আচারে নিষ্ঠা রাখিয়া, পরে কষ্টের তাড়নায় অনেককেই সত্যাসত্য বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছে, সেই মিথ্যাচার পরিত্যাগ করিতে হইতেছে, তবে বৃথা কষ্ট ভোগ করিয়া লাভ কি? কিছু পূর্ব্বেই বিচার করিয়া চলিলে আর কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। স্নানাদি শৌচকার্য্য সম্বন্ধেও এইরূপ অবিচারে ক্রিত হইতে দেখা যায়। অতএব হে হিন্দুগণ! আর কত কাল অবিচারে আচার রাখিতে গিয়া সামাজিক সদাচারের প্রতিও সন্দেহ উৎপন্ন করিবেন? সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যাহাতে জীবমাত্রেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহাই মনুষ্য মাত্রেরই সদাচার। এই আচার রক্ষা করিলে, ইহকাল পরকাল—উভয়কালই আনন্দে প্রবাহিত হয়।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি।

সত্যতা-বিহীন বিদ্যা।

বিদ্যা বলিলে সাধারণতঃ পদার্থ সকলের জ্ঞান ও লেখাপড়ায় পারদর্শিতাই বুঝায়। যদিও পরমাত্মা বা তাঁহার প্রকাশই যথার্থ বিদ্যা, কিন্তু ইহাকে সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। এ বিদ্যার প্রতি এখন প্রায় সকলেই দৃষ্টিশূন্য হইয়াছেন। যদ্দ্বারা ব্যবহার-সুখ এবং অর্থলাভ ঘটে, তাহাই এক্ষণে বিদ্যা বা অর্থকরী বিদ্যা নামে লোকসমাজে প্রচলিত। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা যে জীব অনন্তকাল শান্তিসুখে অবস্থান করিতে পারেন, এ বিশ্বাস না থাকায়, কেহই ব্রহ্মবিদ্যার জন্য লালায়িত নহেন। এবং বর্ত্তমানে, জগতের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে যদি কেহ এ বিদ্যা উপার্জ্জনের পথে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হয়। তাহার কারণ এ বিদ্যার উপকরণস্বরূপ—দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, সহ্য, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ত্যাগ, নিরহঙ্কার প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, তাহা আশ্রয় করিলে, অর্থকরী বিদ্যাভিমানিগণ, পূর্ণ মাত্রায় তাঁহাদের বিদ্যা-চালনার, সুবিধা লাভ করিয়া সত্যপ্রিয় লোকের প্রতি যথাসাধ্য অত্যাচার করিবার উপায় পান। এ অবস্থায় সহজে সকলেই বুঝিতে পারেন যে, লোকে যতদিন পৃথিবীতে বাস করিবে, ততদিন তাহার ব্যবহারিক বিষয়েরও, ন্যূনাধিক প্রয়োজন থাকিবেই থাকিবে সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়াসী হইলে, তাঁহাকে অর্থকরী বিদ্বান্-সমূহের দ্বারা সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। এরূপ স্থলে এ পথের পথিক হওয়া কত দূর সম্ভব? একেই একদিকে লোকের

প্রবৃত্তি বিরল, তাহার উপর এ পথে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলে, গমনেচ্ছুক ব্যক্তির দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। এইরূপ হইলে কোন্ সুখের বা স্বচ্ছন্দতার আশায়, লোকে ব্রহ্মবিদ্যার ফল-প্রয়াসী হইবেন? যতক্ষণ লোকে ব্রহ্মবিদ্যার ফল, অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস বা অনুভব করিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে কষ্টের তাড়নায়, ব্রহ্মবিদ্যার সম্পর্ক ত্যাগ করা, কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। ইহা দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, লোকালয়ে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা বর্ত্তমান জগতের অবস্থায় কত দুরূহ। অতএব যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা, মনুষ্যের অন্তরে সদ্‌গুণের প্রকাশ হইবে, বর্ত্তমান সময়ে সে বিদ্যার পথে পূর্ণমাত্রায় কণ্টক বিছান রহিয়াছে। অপর দিকে কেবল মাত্র অর্থকরী বিদ্যার ফলে জীবের কষ্ট নিবারিত না হইয়া, বর্দ্ধিত হইবারই সম্ভাবনাই অধিক। পুস্তকপাঠাদি বিদ্যা-আয়ত্তের দ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়। এই মার্জ্জিত হইবার অর্থ, অপরের বুদ্ধিকে অভিভূত করিবার শক্তি-সঞ্চার। যিনি যত পরিমাণে অপরের বুদ্ধিকে অভিভূত করিতে সমর্থ, ধন, মান, মর্য্যাদা, তাঁহার তত নিকট। ইহা সুখভোগের আশা ও অহঙ্কারের তৃপ্তি লাভের উপকরণ। ইহা সভ্যতা বর্জ্জিত হইলে, জগতের অনিষ্ট বর্দ্ধিত হওয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সভ্যতা-বিহীন বিদ্যার ফলাফল সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে প্রত্যক্ষ থাকা সত্ত্বেও লোকসমাজে স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যে এখানেও কিছু উপমারূপে গোচর করা হইল। ভাবিয়া দেখুন, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ডাক্তার উকিল মোক্তার প্রভৃতি হইলাম। ডাক্তার হইয়া রোগ নিবারণে সন্দেহ প্রকাশ করিলে, রোগী অপর ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হইবে, এবং ওকালতী করিতে

গিয়া মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণে অসম্মত হইলে, মক্কেল মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিবেন। সমব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিলে, আমার উদরান্নের উপায় ক্রমে সঙ্কীর্ণ হওয়াই স্বভাবিক; কাজেই অন্নের জন্য হাহাকার নিবারণ করিবার ইচ্ছায় আমাকেও ন্যায় অন্যায় ত্যাগ করিয়া কষ্টকর বুদ্ধিতে অসত্যকেও সত্য, অকর্ত্তব্যকেও কর্ত্তব্য বোধে ব্যবসা রক্ষা করাই, স্বাভাবিক কি না? বিদ্যায় কুলীন না হইলেও, ডক্তার হইলে ধন্বন্তরির পিতামহ এবং উকিল হইলে আইনেরও গুরু হইয়া বসিতে হইবে। নচেৎ দারিদ্রতা ও অপমানের ভার বহন করিয়া লোক-চক্ষে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই এ জাতীয় সুখের লোভ ত্যাগ করিয়া, উকিল হইলে সত্য মিথ্যা উভয় মোকদ্দমাই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থের জন্য বুদ্ধি বিক্রয় করিয়াছি; মক্কেল খুসী না হইলে উদরান্নের উপায় নাই; প্রমাণজনক সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত করিতে হইবে, পরে বিচার-পতির হাত। এ অবস্থায় বিচারপতির নিকট কোন পক্ষই সরল সত্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা না করায়, বিচারপতিরও কি পরিমাণে সময় নষ্ট ও কষ্ট উৎপন্ন হয়; তাহা সৎবিচারপতিই জানেন। অনেক স্থলে আইনের চক্রে পড়িয়া বিচারপতির পক্ষেও সত্যের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। সততা না থাকায়, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস হেতু, শারীরিক পরিশ্রম, অর্থক্ষয় ও ব্যর্থবুদ্ধির চালনার দ্বারা মনুষ্যের পরমায়ু ও সুখ স্বচ্ছন্দতার হানি হইতেছে। ইহা বিচারশীল মনুষ্য মাত্রেই বুঝিতে সমর্থ। সততা বর্জ্জিত বিদ্যায়, কখনই জীবের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাকে জগতে সততা অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে জীবনযাত্রা

নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ক্রিয়াই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণাবয়ব। যে ইচ্ছাশক্তি, জীব অহরহঃ পোষণ করে, তাহা প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা অধিক এবং উহা সংক্রামিত হইয়া সর্ব্ব জীবের অন্তরে প্রকাশ পায়। এ কারণ অপরের অনিষ্টের আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা, কালে আত্মদুঃখেরই কারণ হয়। প্রকারান্তরে সর্ব্বজীবের হিত-চেষ্টায় আপনারই সুখ শান্তি বৃদ্ধি হয়। ধনী দরিদ্র সকলকেই পরমাত্মা কম বেশী বুদ্ধি দিয়াছেন। সুখের আকাঙ্ক্ষা সকলেই রাখেন। মনুষ্যসমাজে থাকিতে হইলে পরস্পরের সম্পর্কে, সকলকেই আসিতে হইবে। যিনি যে বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি উহা সদাসৎ উভয় কার্য্যেই লাগাইতে পারেন। আপন বিদ্যাকে সত্যের অনুগামী করিয়া না রাখিলে, অপরের বিদ্যা, অসত্যবর্জ্জিত থাকিবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। শ্রেষ্ঠ, ধনী, জ্ঞানী প্রভৃতি ব্যক্তিগণই জগতের আদর্শ স্থল। এ কারণ তাঁহাদের মধ্যে সততার প্রকাশ না থাকিলে, বুদ্ধিহীন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে, সদ্ব্যবহারের আশা কোথায়? অতএব শ্রেষ্ঠনামধারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, জগতের মঙ্গলার্থ যে দায়িত্বভার রহিয়াছে, উহা পালন করিয়া নিজের সহিত মনুষ্য মাত্রেরই মঙ্গল প্রচেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সততাহীন বিদ্বান্ ও ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা, বিদ্যাহীন ও দরিদ্র ব্যক্তি নিজের ও অপরের অনিষ্ট করিতে অনেকাংশে অসমর্থ থাকায়, উহা প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সৎস্বরূপ পরমাত্মাই একমাত্র সততা রক্ষা করিবার ভিত্তি। তাঁহাতে নিষ্ঠা রাখিলে সততা, সততই প্রকাশ পায়, একারণ ব্রহ্মনিষ্ঠাই

একমাত্র সততা রক্ষার উপায়। অতএব যাহাতে মনুষ্য মাত্রেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, তাহার চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

সম্পদে বিপদ।

হে সম্পদশালী পুরুষগণ! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইলে, সম্পদই মহা বিপদরূপে পরিণত হয় কি না? সকলেই জানেন যে, কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পংশালী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ অথবা জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদাদি সঙ্গী করিয়া আনেন নাই এবং মৃত্যুর সময় সম্পত্তির অন্তর্দ্ধানও হয় না। পরমেশ্বরই ব্যক্তিকে সম্পদযুক্ত ও সম্পদহীন ভাবে সৃষ্টি করেন অথবা সংযুক্ত করেন। যাহাকে আমরা, -আমি বা আমার বলি, তাহাও তিনি বা তাঁহারই। যদি তাঁহার না হইয়া আমাদেরই হইত, তাহা হইলে, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু বা সম্পদহীন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যদি তাঁহার ইচ্ছায় পাইয়া থাকি, তাহা হইলে অপর হইতে ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন দায়িত্ব ঘটিবে কি না? যদি দায়িত্ব ঘটে, উহা কি, তাহা বুঝিয়া প্রতিকার করা বুদ্ধিমান মনুষ্যের কি কর্ত্তব্য নহে?

যাঁহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের পর নাই, যিনি ন্যায়পরায়ণ, তাঁহার পক্ষে একজাতীয় জীবের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা রাখা ও সম্পদদানের তারতম্য করা কতটুকু সম্ভবপর? যেমন মাতা-

পতা আপন সন্তানগণের মধ্যে, ন্যায়পরায়ণ সমদৃষ্টিসম্পন্ন সন্তানের উপর সর্ব্ব সন্তানের মঙ্গল বা প্রতিপালনেচ্ছায় অপর সন্তান হইতে বিশেষ শক্তি প্রদান করেন, সেইরূপ সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ শক্তি লাভ করেন; এবং যেমন সম্পদযুক্ত সন্তানের ব্যবহারে, অপর সন্তানদিগের কষ্ট উৎপন্ন হইলে, তাহার জন্য সম্পদযুক্ত সন্তানই দায়ী হন, সেইরূপ জগতে সাধারণ জীবের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি, জগতের সুখ-শান্তির জন্য বিশেষরূপ দায়ী থাকেন। কারণ, শক্তির সদ্ব্যবহারই সর্ব্ব জীবের মঙ্গলপ্রদ।

আসক্তি আমাদিগকে আত্মপর ভেদ ঘটাইয়া অন্ধ করিয়া রাখে। অবশ্য ইহারও কতকাংশ, জীবের সুখের কারণ হয়; নচেৎ পরমাত্মার পক্ষে ইহা রাখা নিষ্প্রয়োজন হইত। যখন এই অন্ধত্ব আত্ম ও পর উভয়ের প্রতি সমান ক্রিয়া করে, তখন ইহা মঙ্গলের কারণ এবং একদেশী হইলে কষ্ট উৎপন্ন হয়।

মনুষ্য সর্ব্ব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার উপর যাঁহারা জ্ঞানী, পণ্ডিত, রাজা, বাদসাহ, তাঁহারা মনুষ্যের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম। যদি এই শ্রেষ্ঠত্ব অবস্থা লাভ করিয়া,সেই পদের উপযুক্ত কার্য্যে বিরত থাকি, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠত্বের প্রয়োজন কি? এবং পদোপযুক্ত কার্য্য না করায় পরমাত্মার নিকট দোষী হইতে হইবে কি? হে মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ! আপনারা শান্তভাবে বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখুন যে, মনুষ্য কম বেশী শত বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ভোগাভোগ করেন। এই শত বৎসর কালের জন্য আপনারা কিনা সুখের চেষ্টা পাইতেছেন। এই তুচ্ছ কালমাত্র জীবিত থাকার সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আপনাদের অনন্ত-

কাল স্থায়িত্বের সম্বন্ধে একবারে দৃষ্টিশূন্য হওয়া কি জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য ? যতদূর বিচার করা সম্ভব, বিচার করিয়া দেখুন, একজন মানবের পক্ষে জগতের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া শেষ করা সম্ভব কি না ? অথবা যাঁহাদের আজ আপনার বলিতেছে এবং যাঁহাদের পর করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা চিরকাল আপনার বা পর থাকিবেন কি না ? আর বুঝিয়া দেখুন, সুখের সম্মুখে দুঃখের অট্টহাস্য প্রত্যক্ষ থাকায়, সুখভোগের প্রতিবন্ধক ঘটে কি না ? রোগ, শোক, অকাল-মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ নৈসর্গিক ব্যাপারে ঐশ্বর্য্য কোন্ কালে কাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে ? জগতে সুখের চেষ্টায় দিন দিন দুঃখই কেন রাজ্য করে ? ইহাতে কি জ্ঞানিগণের বুঝিবার প্রয়োজন হইবে না যে, কষ্ট নিবারণের যে চেষ্টা হইতেছে, উহা প্রকৃত উপায় নহে ?

যদি আমরা যথার্থ পক্ষে পরমেশ্বরকে জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা হইলে কেন সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা না রাখি ? কেন না তাঁহার বাস্তবিক আজ্ঞা বুঝিবার জন্য সকলে একত্র সম্মিলিত হই ? আর যদি কেবল বলিবার জন্য পরমেশ্বরের নাম পৃথিবীতে রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের আশা ত্যাগ করিয়া যাহা অভিমত হয় করুন এবং তাহার ফলাফল দেখিতে থাকুন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় সত্য যে, নিত্য সত্য ব্যক্তিরই এই জগৎরূপ রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং জীবমাত্রেই তাঁহার সন্তান। যতদিন তাঁহার ঐশ্বর্য্য লইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ সদ্ব্যবহার অর্থাৎ জীবের মঙ্গলার্থ

ব্যবহার না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত কষ্টের অবসান হইবে না। এবং এই কষ্টের জন্য তাঁহার ঐশ্বর্য্যযুক্ত সন্তানই দায়ী হইবেন। পরমেশ্বর যাহাকে যে শক্তি না দিয়াছেন, তাহার দ্বারা সে শক্তির ব্যবহার তিনি চাহেন না। অপর পক্ষে সম্পদই যথাস্থানে ব্যবহৃত না হইলে বিপদেরই কারণ হয়।

পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ লোকের ধারণা যে, অর্থোপার্জ্জনই মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, অর্থের দ্বারাই জগতে বহু কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। অতএব যে সময়, অর্থোপার্জ্জন-কার্য্যে ব্যবহৃত না হয়, জীবনের সেই সময়টী যেন বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। লোকে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, এবং মনের প্রফুল্লতার জন্য, আমোদপ্রমোদের ব্যয়িত সময়, সময়ের সদ্ব্যবহার বলিয়া থাকেন, কিন্তু পরমার্থচিন্তায় যে কালক্ষেপণ হয়, উহা তাঁহারা সময়ের সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই কালই মনুষ্যজীবনের সদ্ব্যবহার কাল। কারণ, পরমাত্মা আছেন বলিয়াই সমস্ত আছে, এবং পরমাত্মার কৃপায় অনন্তকালই সুখ শান্তিতে কাটিতে পারে। কি জাগতিক সুখভোগ, কি পারমার্থিক আনন্দ, উভয়ই পরমাত্মার ইচ্ছাধীন। পরমাত্মা দয়া করিলে অতি অল্প সময়ের ব্যবহার লইয়া আশাতীত ব্যবহার-সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দিতে পারেন। সামান্য লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন, এক জন আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও দৈনিক অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছেন, অপর একজন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ন বা অর্থের অপরিমিত ব্যবহারে সমর্থ। আবার একজন নীরোগ, স্বাস্থ্য সুখ সম্পন্ন, অপরকে রোগের তাড়নায় বিহ্বল হইতে

হইতেছে। ইহাতে বুঝা প্রয়োজন, পরমেশ্বর যাহাকে যাহা দেন, সেই তাহা পায়, তাঁহার দয়াই সর্ব্বপ্রকার শান্তির মূল।

পরমাত্মাই সাধুগণরূপে শান্তির উপায় দেখাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ জগদ্বাসী তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া, আপাত-সুখের আশায় বিপরীত করিয়া থাকেন। ত্যাগ, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয়ে বশিষ্ঠ ঋষি ও খৃষ্ট কি না উপমা রাখিয়া গিয়াছেন? কিন্তু হায়! আজ যাঁহারা ঐ সকল মহাত্মাদিগের নাম লইয়া লোককে উপদেশ দিতে অগ্রসর, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন গুরুপ্রদত্ত পথ অনুসরণ করিতে সমর্থ? যাহারা অবোধ বা শক্তিহীন, উদরান্নের জন্য লালায়িত, তাহাদের পক্ষে এ সকল সদ্‌গুণ জগতে সংস্থাপন করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ক্ষমতাশালী পুরুষগণ পরমেশ্বরের নিকট কি কৈফিয়ৎ দিবেন? জগতে সৎকার্য্যের দৃষ্টান্তও অনেক রহিয়াছে। কিন্তু উহা সার্ব্বজনিকরূপে স্থাপনা করিবার জন্য কাহারা পরমেশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন?

লোকের স্বভাব, আপনাকে নির্দ্দোষী বুঝাইবার জন্য ভ্রমকেও অভ্রম বলিয়া বিচারের সিদ্ধান্তে আনিয়া বসায়। কিন্তু ভ্রম কি কখন অভ্রম হইতে পারে? আসক্তি ও আলস্য পরবশ হইয়া কর্ত্তব্যে অসমর্থতা ভাবনা উহা কি কখন ন্যায় ও সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে? উহা কেবল আত্মপ্রতারণা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। উহার পরিণাম নরকই হইয়া থাকে। অতএব হে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ, আপনাদিগকে পরমাত্মাই তাঁহার জাগতিক উচ্চ আসনে বসাইয়া রাখিয়াছেন; আপনারা তাঁহার দয়ায়, দয়ার্দ্র হইয়া জগদ্বাসীর উদ্ধার সাধনে যত্নবান্ হউন।

ইহাতে শক্তির সদ্ব্যহার এবং কি ইহকাল কি পরকাল উভয়কালেই সম্মানিত ও শান্তিলাভের অধিকারী হইবেন। যতক্ষণ পরমাত্মা ক্ষমতা রাখিয়াছেন, ততক্ষণ উহার সদ্ব্যবহার করিলে সদ্ব্যবহার হইতে পারে। নচেৎ সময় ফুরাইলে, কে আর কি করিবেন?

"সেই দিন জগতে, স্বর্গরাজ্য আসিবে, যেদিন সৎকর্ম্ম সকল, কেবল মাত্র ব্যক্ত না হইয়া, কৃত হইবে। সেই দিন পরমেশ্বর রাজ্য করিবেন, যে দিন প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক মনুষ্যের সুখের জন্য, জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। সেই দিন শান্তি বিরাজ করিবে, যে দিন মিথ্যা জাতি, সমাজ, ধর্ম্ম, ও সৎক্রিয়ার ভেদ, উঠিয়া গিয়া, সকলেই এক রাজরাজেশ্বর পরমেশ্বরের সন্তান বলিয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালনে কৃতসংকল্প হইবে। সেই দিন পরমেশ্বর জীবের মাতাপিতা গুরু আত্মা বলিয়া পরিচয় দিবেন, যে দিন, জীব মাত্রের অভাব মোচনের জন্য, জীব মাত্রেই যত্নবান্ থাকিবেন। সেই দিন অমরপুরী হইতে রোগ, শোক অকালমৃত্যু আদি অন্তর্হিত হইবে, যে দিন প্রীতির যজ্ঞাহুতি ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম-নমস্কার জ্যোতিঃর সম্মুখে ঘটিবে। সেই দিন সর্ব্ব জীবের আশা পূর্ণ হইবে, যে দিন জীব ক্ষমতা সত্ত্বেও, কাহারও শুভ আশা ভঙ্গ না করিবেন।

ক্ষমতাবান্ ও জ্ঞানী পুরুষদিগের প্রথম বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, কিসে মনুষ্য মাত্রেই সুখে, সময়মত প্রয়োজনীয় আহার লাভে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়, মনুষ্য মাত্রেরই স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। তৃতীয়তঃ বিশ্রামকাল স্থান ও উপযুক্ত গৃহ, চতুর্থতঃ পূর্ণ পরমায়ু লাভ; পঞ্চম পরমার্থনিষ্ঠ হইয়া সুখে জন্মলাভ করিয়া সুখে মৃত্যুকে

গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই মনুষ্য মাত্রেরই মূল প্রয়োজন। এই সকল ঘটাইবার জন্যই, মনুষ্য মাত্রেরই সৎ নিত্য অর্থাৎ ভগবৎনিষ্ঠ ও তাঁহাতেই নির্ভরতা রাখা প্রয়োজন। মানুষ সৎ হইলে, মানুষের কত নির্ভাবনা ও সুখবৃদ্ধি হয়; তাহা জ্ঞানী মাত্রেই বুঝিতেছেন। ইহাতে প্রথমত ব্যর্থ চিন্তা, ভয়, ভাবনার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইলে পরমায়ু বৃদ্ধি, এবং ঐ সময়, সৎকার্য্যে ব্যবহৃত হইলে, মনুষ্যের কত সুখবৃদ্ধির সহায়তা করে। কেবলমাত্র অসতের দণ্ড হইলেই, অসৎ দূরীকরণের চেষ্টা, পূর্ণ মাত্রায় হয় না। যেমন কোন বিকারী রোগীকে, অত্যাচার না করিতে দিলেই,তাহার সেবা শুশ্রষা ও রোগ উপশমের চেষ্টা করা হয় না। রোগের কারণ নিবারণ আবশ্যক। সেইরূপ যে যে কারণ, মনুষ্যকে অসৎ কার্য্যে রত করে, ঐ সকল কারণ নিবারণের চেষ্টাই, যথার্থ সৎশিক্ষা ও অসতের নিবারণ-প্রবৃত্তি। সততা বিবর্জিত কৌশল দ্বারা কখনই ছলনাময় নিবারিত হইবে না। সৎই অসতের শত্রু বা বিপরীত শক্তি। সততাপূর্ণ ব্যবহারই অসৎকে দূরীকৃত করিতে সমর্থ। নচেৎ ছলনাময় কৌশল দ্বারা, অসদ্ভাব নিবারণের চেষ্টায়, প্রকারান্তরে অসদ্ভাবের প্রশ্রয় দানই হয়।

বহু লোকের একত্র মিলনের সহিত আনন্দলাভ করা মনুষ্য-চরিত্রের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। যদি লোক সৎ না হয়, তাহা হইলে, একত্রবাস কখনই শান্তিপ্রদ হইতে পারে না। অতএব যাহাতে মনুষ্যমাত্রেই সৎ হয়, সে বিষয়ে, মনুষ্য মাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের পক্ষে এই সকল বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব বোধে, বিশেষ করিয়া আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত।

জাতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি লইয়া, জগতে একটী বিশেষ অশান্তি রহিয়াছে। ইহার সত্যতা ভালরূপ বুঝিয়া, যাহাতে সকলেই অধর্ম্ম ত্যাগ ও ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সে বিষয়, রাজা মহারাজ প্রভৃতির পক্ষে, বিশেষ কর্ত্তব্য। যদি ধর্ম্ম কেবল মাত্র মুখে বলিবার বিষয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের বুঝান প্রয়োজন যে, যে কর্ম্ম রক্ষায়, বহু জীবের অহিত হয়, তাহা ত্যাগ করাই কি, জ্ঞানিগণের উচিত নহে? উপস্থিত সময়ে ধর্ম্মবিষয়ে একটী বিশেষ বিচার হওয়া আবশ্যক; এবং যাঁহারা ধর্ম্মকার্য্য, ভগবৎপ্রসাদে বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে করা যায়, তাঁহাদের সহিত রাজা, বাদসাহ ও স্বভাবিক বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ উপস্থিত থাকিয়া বিচারপতির কার্য্য করিলে, সুব্যবস্থা হইতে পারে। যাহাতে কোন প্রকারে পক্ষপাতের সম্ভাবনা না থাকে, সে বিষয় যথাসাধ্য যত্ন লওয়া প্রয়োজন। সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এক দিকে জগতের জীবমাত্রের উদ্ধার, অপর দিকে তুচ্ছ স্বার্থ ও পক্ষপাতের বাহাদুরী। ধর্ম্মবিচারই জগতের জীবন মরণের সংক্রমণ স্থান। এখানে যাহাতে সুবিচার হইয়া, জগতে যথার্থ ধর্ম্মসংস্থাপন হয়, ও মনুষ্যজীবন পরমানন্দে থাকে, তাহার উপযুক্ত, সকল প্রকার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। নচেৎ কেবল মাত্র থিয়াটারের ব্যবস্থা দ্বারা, জগতের মঙ্গল হইতে পারে না।

যাহা সত্য বা ধর্ম্ম, তাহা সকলের পক্ষেই সত্য বা ধর্ম্ম হইবে। একজনের পক্ষে সত্য, অপরের পক্ষে উহা মিথ্যা হইতে পারে না। স্থান কাল পাত্র ভেদে, ব্যবহার-কার্য্যে, একের সত্য বা প্রয়োজনীয় অপরের মিথ্যা বা নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কিন্তু স্থানকাল পাত্রাতীত পরমাত্মা, সকলের পক্ষে, সকল কালেই, সদা সত্য

বিরাজ মান; এবং তাঁহার আত্মা, কাল ও অবস্থামত, সকলের পক্ষেই,এক। এই সকল বুঝিয়া, যে সকল ব্যবস্থা ও ব্যবহার জগতে স্থায়ী হইলে, সমস্ত মনুষ্যজীব আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা ক্ষমতাবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ বিচারপতিদিগের করা আবশ্যক। ধর্ম্মই জগতের একমাত্র মঙ্গলকারীণী মহাশক্তি। যতদিন ধর্ম্মের বিচার শেষ হইয়া সত্যধর্ম্ম সংস্থাপিত না হয়, ততদিন জগৎ হইতে দুঃখ মোচনের আশা, দুরাশা মাত্র। যাহারা ধর্ম্ম বা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে নারাজ, তাঁহাদের যাহা ভাল বোধ হয়, করিবেন। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য—পরস্পর মিলিত হইয়া অপক্ষপাতে, সত্যের বিচার সমাপন পূর্ব্বক, সত্যধর্ম্ম পালন ও প্রচার রাখিতে যত্নবান হয়েন। যেমন একজন ব্যক্তি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া, অপরিষ্কৃত স্থানে বা ব্যক্তিদিগের সঙ্গে বাস করিলে, ক্রমে আহারও পবিত্রতা নষ্ট হয়, সেই প্রকার সুখী ব্যক্তিও, অসুখী ব্যক্তিদিগের সঙ্গে পড়িয়া, নানা প্রকারে, দুঃখ ভোগ করেন। যেমন আপনাকে পবিত্র রাখিতে হইলে, আপনার চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থান, ব্যক্তি ও ব্যবহারের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন, সেইরূপ ভগবৎভক্ত হইতে হইলেও, সর্ব্বজীবে ভগবৎ প্রীতি উৎপন্ন ও রক্ষা করিবার চেষ্টা আবশ্যক। নচেৎ সদ্‌ভাব রক্ষা লোকালয়ে বাসের পক্ষে কষ্টেরই কারণ হইয়া পড়ে। যখন জীবাত্মা, নশ্বর নহেন, তখন জীবাত্মাকে বারংবার প্রকাশ হইয়া, জগতে ব্যবহার দান ও গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি জগদ্‌বাসী সকলেই অপবিত্র হৃদয়ে থাকে, আর একজন সৎ হন, তাহা হইলে, তাঁহার পক্ষে অসৎ সঙ্গিগণ, সুখের কারণ হইবে কি না, তাহা বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আরও, লোকের

বুঝা উচিত যে, প্রত্যেক মনুষ্যই পরমাত্মার রূপ বা সৃষ্ট। অপক্ষপাতী পরমেশ্বরের পক্ষে, তাঁহার কৃত সকল ব্যক্তিগণের সহিত, তাঁহাদের রূপ গুণ শক্তির সমান সম্পর্ক। কারণ, তিনি যেখানে যাহা রাখিয়াছেন, সেইখানে তাহাই আছে। ভাল মন্দ, গুণ, কেহই আপনা হইতে সৃষ্টি করেন নাই। সুখের নিমিত্তকের নাম ভাল এবং দুঃখের নিমিত্তকের নাম মন্দ। যেখানে যাহা প্রকাশ থাকা, পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, সেইখানে, তাহাই প্রকাশ রহিয়াছে। ইহাতে সতেরও কোন বাহাদুরি বা অসতেরও বাস্তবিক কোনও হীনতা নাই। সতের পক্ষে বুঝা প্রয়োজন যে, পরমাত্মা তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া, তাঁহার কষ্ট ভোগের নিমিত্তক রাখেন নাই বলিয়াই, তিনি সৎ। নচেৎ কি বস্তু, কি রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাবে, উভয়ই এক পরমাত্মার রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাব; এবং বস্তুতঃ সমস্তই পরমাত্মা-বস্তুই আছেন।

রাজা মহারাজ বাদাসহ ও সাধারণ ধনিগণ, জগতের সুখবৃদ্ধির ও অর্থলাভের আশায়, অশ্বের চাস অর্থাৎ যাহাতে উত্তম উত্তম অশ্ব জন্মগ্রহণ করে, তাহার উপায় করিতেছেন। এবং ঐ সকল অশ্বদিগকে কত উত্তম স্থানে রক্ষা ও কত উত্তম আহারের ব্যবস্থা ও সেবা করিতেছেন; তবেই তাহাদের জন্ম, প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। তাহাদের পরিশ্রম ও আহার বিহারের পরিমাণের উপরও, কত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, তাহা তাঁহারা ভালরূপ জ্ঞাত থাকিয়া, তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন। কিসে গরুর দুগ্ধ বাড়ে, কিসে বগু সবুজি আহারের উপযুক্ত হয়, কিসে অম্লরসযুক্ত ফলাদি সুমিষ্ট হয় প্রভৃতি নানা প্রকার চেষ্টারও অভাব নাই এবং এ সকল বিষয়ে ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় করিতেও কাতর নহেন। এমন কি কুকুর

বিড়ালের বংশধরগুলি কিরূপভাবে জন্ম গ্রহণ ও প্রতিপালিত হইবে, নয়নানন্দদায়ী হইবে, তাহার জন্যও, তাঁহাদিগের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু লোকে যাহাতে সৎ হইতে পারে, অথবা সৎ লোক রক্ষার জন্য, কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ কোন আগ্রহের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে, জগতের লোক সৎ হইলে বা একজনও যথার্থ জ্ঞানভক্তি লাভ করিতে পারিলে, সর্ব্ব জীবেরই যে মহান্ হিত সম্পাদিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে কাহারও লক্ষ্য আসিতেছে না। এই সকল বিষয়ে রাজা মহারাজগণ যদি দৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে কে দৃষ্টি করিবে? ইহা দরিদ্রের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত নহে। তাহারা কেবলমাত্র ইচ্ছা রাখিলেই এবং সম্ভবপর সহায়তা করিলেই যথেষ্ট করা হইল। এ কাজের জন্য, সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণই ভগবানের নিকট দায়ী রহিয়াছেন। আরও সকলেরই বুঝা উচিত যে, যদি ভগবান্ থাকেন, এবং ভগবানের ইচ্ছায় জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবারণ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, যদি একজন সদ্ব্যক্তির প্রার্থনাও পরমাত্মার গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তে, এই দুঃখময় জগতে কৈলাস ও বৈকুণ্ঠের সম্পদের কল্পনা, প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং জীবমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার অভাব হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বসম্পদ লাভের অধিকারী হওয়াও সম্ভব। অতএব সৎলোকের উৎপত্তি ও প্রবাহ রক্ষার বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের পক্ষে কোন মতেই কর্ত্তব্য পালন হইল, মনে করা উচিত নহে, এবং ভগবৎ কৃপার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া, কার্য্য করিলে, উহার সুফলাভের আশা করা, সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিমানের বলিয়া, পরিচয় বলিয়া, বলা যাইতে পারে না।

বিদ্যাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানের সাহায্যে, কার্য্যসিদ্ধি অনায়াস-সাধ্য হয়। কিন্তু ঐ বিদ্যা যদি জীবের হিতে, ব্যবহৃত না হইয়া বিপরীত কার্য্যের সহায়তা করে, তাহা হইলে বিদ্যা শিক্ষা করা অপেক্ষা, মূর্খ থাকাই কি ভাল নহে? এই সকল বিষয় বুঝিয়া জীবের পালনের জন্য, রাজ্য করা, আর দয়া করা একই। এইরূপ রাজাই, ভগবানের দয়ারূপ বা অবতার-মূর্ত্তি।

হে সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, পরমাত্মা কেঁচোর জন্য সমস্ত পৃথিবীই অন্ন ও অন্ন আহারের পরিশ্রমেই তাহার গৃহনির্ম্মাণ-ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। বনে, বিনা চাষে পশুগণ পালন হইতেছে। পরস্পরের ব্যবহার ব্যতীত, বৃক্ষলতাগণ জীবিত। আর মনুষ্যের জন্য, তিনি কি স্বাধীন ব্যবস্থা রাখিতে পারিতেন না? নিশ্চয়ই পারিতেন। কিন্তু তাহাতে, বহু সুখশান্তির অভাব থাকিয়া যায়। প্রীতির দাসত্বে যে, পরম সুখ, এবং দয়ায় যে পরমানন্দ, ইহার আস্বাদ মনুষ্যে থাকিত না। আরও এ বিষয়, মনুষ্য ভালরূপে বুঝিতে না পারিলে, পরমাত্মাই যে, আমাদের নিকট প্রীতির দাস হইয়া সর্ব্বসুখ দিতেছেন, ইহাই তাঁহার চরম স্বাধীনতার পরিচয়, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবেন? দয়ায় বশীভূত হইয়া, নিরানন্দের ন্যায় জড়ভাবে থাকাই তাঁহার পরমানন্দ; তাহা বুঝিয়া, ইচ্ছার প্রিয় আত্মার দাসত্ব ও সুনীচভাবে থাকিয়াও আনন্দলাভ করিবার আশা থাকিত না। তিনি ইচ্ছা করিলে, সকলকেই সমস্ত দিতে পারিতেন। তাহা হইলে, কেহই সুখী, বা জগতের কার্য্যে, ভিন্নতা না থাকায়, বহু সুখাস্বাদ অনুদয় থাকিত। যেমন দরিদ্রতার অভাব থাকিলে, দানের সুখ। রোগীর অভাবে, সেবার আনন্দ। অবোধ না থাকিলে, স্নেহের শিক্ষা প্রভৃতি গুণের

আনন্দ আস্বাদ লোপ পায়। বাস্তবিক পক্ষে ঐশ্বর্য্যই সুখের পদার্থ নহে। উহা প্রিয় আত্মার জন্য ব্যবহার করিয়া, প্রিয় আত্মার সুখ বৃদ্ধি হয় বলিয়াই, উহাকেও সুখময় পদার্থ বলি; এবং ইহার বিপরীত ব্যবহার বা অপব্যবহারে উহাই বিপদময় হইয়া পড়ে। হে সম্পদবান্! আপনারা ভাবিয়া দেখুন, যে—পরিমাণ সুখশান্তি দিবার জন্য, আপনাদিগের নিকট পরমাত্মা ঐশ্বর্য্য রাখিয়াছেন, উহা যদি আপনারা আপনাদিগেরই পূর্ণ সুখের জন্য, ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে প্রত্যাখ্যানের অপরাধ কাহার হইবে? এবং কিসের উপর নির্ভর করিয়া পরমাত্মার নিকট, দুঃখোপশম বা সুখলাভের প্রার্থনা রাখিবেন? বাস্তবিক পক্ষে বুঝিতে পারিলে, দ্বেষহিংসার মধ্যগত স্বাধীনতা অপেক্ষা, প্রীতির অধীনতায় সুখ এবং সহ্য করিতে পারিলে ক্রন্দনযুক্ত লোভময় সম্পত্তি অপেক্ষা, সন্তোষযুক্ত দারিদ্রতার আনন্দ প্রচুর। অতএব ধন, জন, যৌবন প্রভৃতি সকল সম্পদই আত্মার সুখের ব্যবহারে আসিলেই, উহা সম্পদ নামের উপযুক্ত, নচেৎ বিপদেরই মূল হইয়া থাকে। পরমাত্মার ইচ্ছা ও ব্যবহার বুঝিয়া, কার্য্য করিলে, তবেই শান্তি, নচেৎ কষ্টভোগ হয়। সকলের বুঝা প্রয়োজন যে, যেমন মাতাপিতা গুরু, নাবালক মূঢ় সন্তানগণের জন্য সর্ব্বপ্রকার আশ্রয়স্বরূপ, তেমনি সাবালক জ্ঞানী সন্তানেরও আশ্রয় বটে, তথাপি জ্ঞানী সন্তানগণই, মাতাপিতা গুরুর সেবা করিয়া কৃতার্থ হয়। সেই প্রকার, পরমাত্মা সদাসৎ সর্ব্বব্যক্তির আশ্রয় হইলেও, অজ্ঞানী ইঁহার সম্মান রাখিতে বিরত এবং জ্ঞানী ভক্তই, ইঁহাকে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা করিয়া, ও ইঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া কৃতার্থ হন,—এ ব্যবস্থা, স্বাভাবিকই রহিয়াছে। যেমন

মাতা পিতা গুরু, অজ্ঞান সন্তানের অবস্থা জানেন বলিয়া, তাহাদের ব্যবহারে অপমান বোধ না করিয়া, যাহাতে মাতৃপিতৃগুরুভক্তির আস্বাদ ও আজ্ঞাপালনের সুখ বুঝিবার উপযুক্ত হয়, তাহারই উপযুক্ত ব্যবহার করেন, পরমাত্মাও সেইরূপ অসৎ ব্যক্তির মঙ্গল লাভের উপযুক্ত শক্তি প্রকাশ রাখিয়া, তাহাদের পরিবর্তন ঘটাইয়া ব্রহ্ম-আস্বাদের অধিকারী করিয়া লন।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

ওঁ

সেবা।

সাধারণতঃ স্থূল শরীরের কষ্ট নিবারণের যে চেষ্টা বা ক্রিয়া, তাহারই নাম সেবা বলা হয়। কিন্তু বাস্তব পক্ষে আত্মাই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় ভাবে প্রকাশ থাকিয়া, ভোগাভোগ করিতেছেন, এই আত্মাকেই পূর্ণরূপে সেবা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা আত্মারই যে স্বাভাবিক আনন্দ, নির্ব্বিকার অবস্থা, এই অবস্থায় যাহাতে আত্মা সুখে উপস্থিত হয় বা ইহা লাভ করে, সেইরূপ ব্যবহার করাই যথার্থ সেবা।

স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়ের যেমন সেবা করা হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের, এবং মন, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ব্যক্তিচেতনার দ্বারা মন, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ব্যক্তিচেতনার

সেবা করিলে, তবেই একটী জীবের পূর্ণমাত্রায় সেবাকরা হয়। নচেৎ সেবার পরিবর্ত্তে, অত্যাচারই হইয়া থাকে।

যাহার যে শক্তি নাই, তাহার দ্বারা, সে শক্তির কার্য্য বা সেবা অসম্ভব এবং যিনি যে সেবা না চাহেন, তাহার প্রতি সেই জাতীয় সেবা করার চেষ্টাও সেব্যের প্রতি, নিষ্ঠুর ব্যবহার। অথবা আমার সেবা করিবার ইচ্ছা আছে, এইজন্য সেব্যের নিষ্প্রয়োজনে বা আমি যে জাতীয় সেবা করিতে পারি, সেইরূপ সেবা করিবার ইচ্ছাও পাপপূর্ণ অধর্ম্ম। অতএব সেব্যের কোন্ জাতীয় সেবা আবশ্যক এবং ঐ সেবা করিবার শক্তি আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া সেবার ব্যবস্থা আবশ্যক।

স্থূল শরীর রক্ষার জন্য, উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন। কিন্তু অতিরিক্ত আহারের দ্বারা উত্তম পদার্থের ব্যবহারও স্থূল শরীরের বিনাশ বা রোগ উৎপন্ন করিবার কারণ হয়। যেমন স্থূল শরীরে, স্থূল পদার্থ গ্রহণকারী শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, স্থূল শরীরের সেবায় স্থূল শরীর সুস্থ থাকে, সেইরূপ জ্ঞান, বিজ্ঞান, আত্মজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা সেবা করিবার সময়, সেব্যের জ্ঞান বিজ্ঞান ও আত্ম-জ্ঞান গ্রহণের শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ সকল জাতীয় সেবা আবশ্যক। নচেৎ বিপরীত ফল প্রসব করে।

সেবা করিবার শিক্ষা, মানবজীবনের একটী প্রধান শিক্ষা। এ শিক্ষার অভাববশতঃ জগতের নানা দুর্গতি। আমার ইচ্ছা আছে, এক জনের সেবা করি, কিন্তু শিক্ষা নাই। প্রীতির বশীভূত হইয়া সেবা করিতে গিয়া, কষ্ট দিয়া ফেলি, পরে বুঝিতে পারিলে অনুতপ্ত ও মর্ম্মাহত হই। কিন্তু যদি পূর্ব্ব হইতে সেবার সর্ব্ব-ভাব বুঝিয়া, সেবা করিতে যাইতাম, তাহা হইলে অনেকাংশে

নিরপরাধী থাকিতে পারিতাম এবং প্রীতির ব্যবহার সমাপ্ত হইলে, অনুতাপের সম্ভাবনা অল্পই থাকিত। কারণ সেবা-বিষয় বুঝিয়া সেবা করিলে, কি নিজের, কি সেব্যের, কষ্টের সম্ভাবনা অল্প ও সুখের আশা অধিক আছে। সেবার যথার্থ ভাব বুঝিয়া, সেবা করা, ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এইপ্রকারে সেবা করাই ধর্ম্মমূলক।

অসমর্থ ব্যক্তির সেবাই, সামর্থ্যবান্ ব্যক্তির সেবা অপেক্ষা, আকাঙ্ক্ষণীয়। কারণ, সামর্থ্যবান্, আপন শক্তিতেই, আপনার কষ্ট নিবারণ করিয়া, জাগতিক কষ্টস্রোতের প্রতিবন্ধক ঘটাইতে পারেন। অপর পক্ষে বিপরীত ফল হওয়াই সম্ভব। এক পক্ষে অসমর্থ ব্যক্তির সেবাই যেমন প্রয়োজনীয়, অপর পক্ষে এই সেবা, অতীব দুরূহ ও ভয়াবহ। কিন্তু, ইহা যতই দুরূহ বা ভয়াবহ হউক না কেন, প্রয়োজনের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। কাজেই ইহা পরিত্যাগ করা, মনুষ্য জীবের অকর্ত্তব্য। অতএব সেবা-শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রয়োজন আছে; এবং এই সেবা-শিক্ষার জন্যই, কে, কাহার, কি প্রকারে সেবা হয় এবং সেবাই বা কি, তাহা বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। নচেৎ সেবার অছিলায় নির্য্যাতন ঘটিয়া, জগতে দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হয়।

আমাদের ইন্দ্রিয় তাপ পদার্থ। এই ইন্দ্রিয় উপযুক্ত তাপের অভাবে ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য, তাপময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও তাপময় পদার্থের সাহায্যে, তাপময় দুঃখ নিবারণের চেষ্টাই ঐন্দ্রিয়িক বা শারীরিক সেবা। মন বুদ্ধি, প্রকাশ পদার্থ, অজ্ঞানরূপ অনুপস্থিত প্রয়োজনীয় ভাবের অভাবই, অন্ধকার। প্রকাশরূপ উপস্থিতি ভাব দ্বারা এবং মন-বুদ্ধিস্থিত প্রীতি ভক্তিশ্রদ্ধার সাহায্যে, মনবুদ্ধির দুঃখ বা অশান্তি

নিবারণের যে চেষ্টা, তাহার নাম মনবুদ্ধির সেবা। এই মন-বুদ্ধির অন্তরেই জীবচেতনা বা ব্যক্তিভাব নিহিত। যখন জীব-জ্যোতিঃ, বিকল শরীরে অবস্থান করেন, বা শরীরত্যাগের উন্মুখীন হন, সেই সময়, ঐ ব্যক্তিচেতনা, শক্তিহীন হইয়া আত্মনাশের আশঙ্কায় অভিভূত হন। এই অবস্থায়, আত্মার নিত্যতা ভাব, ব্যক্তিচেতনাতে, নিত্য ব্যক্তির দ্বারা সঞ্চার হওয়াই আত্মার সেবা, বুঝা প্রয়োজন। জীবের ব্যক্তিগত ভাবই অতি প্রিয়; এবং এই ব্যক্তিভাবকে অবলম্বন করিয়াই, ব্যক্তির স্থূলসূক্ষ্ম শরীর ও সুখ দুঃখ, ভোগাভোগ। মনবুদ্ধির বিকল অবস্থায় এই ব্যক্তিভাব বিশেষরূপে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ কারণ এই অবস্থায়, জীব সম্পূর্ণ অসমর্থ ও নিরাশ্রয়। যাহাতে এই নিরাশ্রয় অবস্থায়, জীব পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া, শান্তিলাভে সমর্থ হন, তাহার চেষ্টাই মূল সেবা। এইরূপ সেবক হইবার জন্য, একটি মনুষ্যকে বিশেষ শিক্ষা করিয়া, আপনাকে অমর জানিয়া, মৃত্যুভয়শঙ্কিত, চকিত-নেত্র, নিরাশ্রয়, মুদিতেন্দ্রিয়, জীবজ্যোতির নিত্য প্রকাশ অক্ষুণ্ণভাব, প্রতীতি দিবার চেষ্টার নামই আত্মসেবা। এই আত্ম-সেবাই সর্ব্বপ্রকার সেবার মূল সেবা। এইজন্যই জীবের সেবা করিবার প্রয়াসী হইবার পূর্ব্বে, আত্মজ্ঞানলাভের প্রয়োজন। এই আত্মাকে জানিলেই, স্থান ও অবস্থা-ভেদে আত্মার কখন কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা অধিক।

মুমুক্ষু ও মুমূর্ষু, এই উভয় প্রকার ব্যক্তিরই সেবা, বিশেষ প্রয়োজনীয় ও দুঃসাধ্য। কারণ, উভয়েই আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার ভয়ে আকুল-হৃদয়। ইহাদের সেবা করিবার পূর্ব্বে কোন্ অবস্থায় তাহাদের কোন্ কষ্ট এবং কোন্ উপায়ে তাহা

নিবারণ হয়, তাহা, জানিয়া তবে সেবায় নিযুক্ত হইবার সাহস করা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য। নচেৎ বিপরীত ফলের আশঙ্কা অধিক।

মুমুক্ষু মৃত্যু আসিবার বহু পূর্ব্বেই, মরণকে নিকটে দেখিয়া, চমকিত। বিচারে, সকল আশ্রয়ই, নিরাশ্রয় জ্ঞানে, আশ্রয়-লাভের প্রয়াসী। সুখের প্রলোভনের মধ্যেই, দুঃখের নিভৃত গুপ্ত বাস দেখিয়া ভীত। অহঙ্কারের উর্দ্ধেই, পদাঘাতের সম্ভাবনায় বিহ্বল। চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, অবসন্নতা এবং আপনার সম্মুখেই, পরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়া, হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। কিন্তু মুমূর্ষুকে এইসকল ভাব চেষ্টা করিয়া বিচারে আনিতে হয় না। তাহার শরীর অবশ হইয়াছে। পরের সাহায্য ব্যতীত, কোন প্রকারে, কষ্ট নিবারণের আশা নাই। হস্তপদাদির শক্তি সকল, রাখালহীন পশুপালের ন্যায় বিচ্ছিন্ন। জিহ্বা স্বাভাবিক পরিচিত আস্বাদ দানে, বিরত। শ্রবণ ভাষাজ্ঞান হরণে, যত্নবান্। জাগতিক দ্বৈতভাব রক্ষার মধ্যে, কৌতুক করিবারই চেষ্টা অধিক। চক্ষু, মনের বিষয়কেই, বাহিরে প্রত্যক্ষ করিবার ভাণ করিতেছে। অগ্নি আর ইন্দ্রিয়রূপে থাকিতে অনিচ্ছুক। মনবুদ্ধি পর সাজিয়া, আপনাকে পরের দ্বারা আবৃত করিতেছে। জাগতিক বন্ধুর আসন টলিয়াছে। ব্যক্তিভাব "এই এলাম এই গেলাম, এই আমার এই তোমার, যেই ভাল সেই মন্দ, এই আছি এই নাই, কি হবে কি হ'লো, কোথা আছি কোথা যাব, হায় হায়, যাই যাই," এইরূপ নানাভাবে নানারূপে আবির্ভূত। হায়! এই অবস্থায়, এই আমির দুর্দ্দশা যে কি, তাহা কে প্রকাশ করিবে? মরিবার ইচ্ছা নাই, অথচ না মরিয়াও নিস্তার কোথায়, এ মরণের টানাটানির ব্যবস্থা কে জানিবে? অব্যাহতির উপায় করা, দূরে

থাক, কষ্টের উপর কষ্ট না দিয়া, যাঁহারা বিরত থাকেন, তাঁহারাও মুমূর্ষুর বন্ধু নামে, গণ্য হইবার উপযুক্ত। সেবা কে করিবে! এবং ইঁহাদের সেবা করিবার ইচ্ছা রাখিবার পূর্ব্বে, কত শিক্ষার প্রয়োজন, বা আত্মাকে কত ভাল বাসিলে, তবে ইঁহাদের সেবা করিবার আশা করা যায়, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? হায় জীব! এখানে তোমায় কেবলমাত্র কল কৌশল বা পাঠ শিক্ষাই যথেষ্ট হইবে না। তোমাকে অগ্রে মরিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে, তবে তুমি মুমুক্ষু ও মুমূর্ষুর অবস্থা বুঝিয়া মুমুক্ষুকে অজ্ঞানের ও মুমূর্ষুকে মৃত্যুর পর পারে যাইবার পথ দেখাইতে সমর্থ হইবে। নচেৎ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কত দূর যাইথে বা লইয়া যাইতে পায়। তাই বলি সেবা করিবার পূর্ব্বে, একবার মরণের পরপারে ঘুড়িয়া আইস, তাহা হইলে কি মুমুক্ষু, কি মুমূর্ষু, উভয়েরই সেবা করিকে সমর্থ হইবেন। নচেৎ সেবা, অত্যাচার রূপেই পরিণত হয়। একটী মনুষ্যের আগাগোড়া সমস্ত ভাব বুঝিতে হইলে, জন্মের পূর্ব্বাবস্থা হইতে, মৃত্যুর পর অবস্থা পর্য্যন্ত, জ্ঞাত থাকার প্রয়োজন। তবেই তাঁহাকে চিনিয়া, তাঁহার সেবা করা সম্ভব। আত্মার সম্পূর্ণরূপ সেবা করিবার জন্যই, আত্মা বস্তু ও তাঁহার রূপ, গুণ, শক্তি এবং এক ও ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ভাবের সহিত প্রকাশ অপ্রকাশের গতি বুঝা আবশ্যক। এই জন্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানের এত মর্য্যাদা। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি, কি নিজের, কি অপরের কাহারও কোন সেবাই অক্ষুণ্ণ ভাবে করিতে সমর্থ হয় না।

আত্মা, বস্তুতঃ নিত্য, আনন্দময়। ইহা সত্য হইলেও, আত্মার দুঃখের অবস্থায়, ইহা শুনিয়া বা ভাবিয়া কি কেহ কখনও শান্ত হইতে পারেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে। সেইজন্য, যে অবস্থায়

উপস্থিত হইলে, আত্মাতে এই ভাব প্রকাশ পায়, তাহা লাভ করিবার চেষ্টা করার নামই সাধনা। এই সাধনাই ভগবৎকৃপায়, শান্তির উপায় হইয়া থাকে। বিচারই জ্ঞানের উদ্বোধক, জ্ঞানই সত্যাসত্যের পথপ্রদর্শক; এবং ভগবান্ই, এই সত্য বস্তু। এই জন্য, মূল সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রসাদ ব্যতীত, কোন জ্ঞানই, আত্মার হিতকর হয় না। অতএব পরমাত্মায়, নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া, সকল প্রকার বিচার, শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন।

যতদূর পর্য্যন্ত, যাহার যে বিষয়, ভাল করিয়া জানা আছে, তাহার কর্ত্তব্য ততদূর পর্য্যন্ত, তিনি বুঝিয়া জীবের হিত বা সেবা করেন। যেখানে, তিনি অন্ধ, সে বিষয়, অপরের জানা আছে বা নাই; এরূপ নিশ্চয় ধারণা রাখিয়া, জেদ করিয়া কোন কার্য্য করা বা করান উচিত নহে। বরং সেখানে, সেব্যের ইচ্ছামত চলাই প্রশস্ত। অথবা সেবা নিরস্ত থাকিলে, নির্দ্দোষ সেবা মাত্র করিয়া, পরমাত্মার প্রতি সেব্যের সুখশান্তির বিষয়, ন্যস্ত করা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরে নিষ্ঠারহিত ব্যক্তি, সেবা করিবার অনুপযুক্ত। পরমার্থে নিষ্ঠা থাকা, সেবকের পক্ষে, প্রথম গুণ বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, জীবে প্রীতি, সত্যে অনুরাগ, ক্ষমা, দয়া, বিবেক প্রভৃতি গুণ প্রার্থনীয়। এই সকল গুণের সহিত মৃত্যুর বর্ত্তমান ও পূর্ব্বাবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি আদি, কি ভাবে প্রকাশ থাকে; কি করিলে কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে, এই সকল শিক্ষা থাকিলে, তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় সেবার অধিকারী বলা যাইতে পারে। যদিও সকলেই পূর্ণ মাত্রায় এই সকল গুণসম্পন্ন না হইতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও সেব্যের কোন্ অবস্থায় কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ

করিলে, জীব রোগমুক্ত না হইলেও, রোগের বৃদ্ধি, কিম্বা রোগের যাতনার আধিক্য না হয়, সে শিক্ষার বিষয় নিশ্চয়ই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে উপায়েই হউক, শারিরীক ও মানসিক অবস্থার সম্বন্ধে শিক্ষা করা, মনুষ্য মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

যেমন ভয় ও প্রীতি, এই দুই ভাব হইতে, মুমুক্ষতা প্রকাশ পায়, সেইরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তিরও চরিত্রানুসারে ভয় বা প্রীতি, হিংসা বা দয়া, সত্য বা অসত্য, আসক্তি বা বিবেক প্রভৃতি দুই জাতীয় ভাবের উদয় হয়। এই ভাবের ভিন্নতা অনুসারে, তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক ব্যবহার বা গতিবিধির ভিন্নতা ঘটে।

এই যে জগৎ পদার্থ, ইহা একমাত্র চন্দ্রমা জ্যোতিঃ বা পরমাত্মার ইচ্ছা শক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি বা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ পদার্থ, নিজ অস্তিত্বের দিকে প্রকাশ হইলে, চেতনা বা জ্ঞানভাব এবং ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য যুক্ত হইলে, জগৎ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব ও জীবরূপে প্রকাশ হন। প্রকাশাপ্রকাশাতীত অব্যক্ত ব্রহ্ম, যেমন সর্ব্বপ্রকাশের অস্তিত্ব, সেইরূপ ক্রিয়ারূপ বিকাশে, পৃথিবী- স্থূল অস্তিত্ব। স্থূলই জগৎ লীলার ভিত্তি। এ কারণ, স্থূলের প্রতি পরমাত্মার লক্ষ্য, যখন যত অধিক, স্থূলের স্থায়িত্ব, তখন তত দৃঢ়। এই লক্ষ্য দুই ভাগে বিভক্ত। এক সমষ্টিগত, অপর ব্যক্তিগত বা বিভেদগত। সমষ্টি, চেতনার প্রতি লক্ষ্যযুক্ত। ব্যক্তি বা বিভেদ, আস্বাদ ও জড় ভাবকেই অবলম্বন করিয়া স্থিত। এ কারণ ব্রহ্ম ইচ্ছা, চন্দ্রমা ও তারা দুই ভাবে প্রত্যক্ষ। চন্দ্রমা প্রকাশ, ব্রহ্ম ইচ্ছা এবং তারাগণ ব্যক্তি বা বিভেদগত ইচ্ছাশক্তি। এই তারাই আকাশ পদার্থ বা ভিন্ন ভিন্ন ভাব, শক্তি, স্থান, পদার্থ বা ব্যক্তি প্রকাশের মূল যন্ত্র বা প্রকাশ। ইহা ব্রহ্ম ইচ্ছা বা চন্দ্রমা রূপ সমষ্টি ইচ্ছা

শক্তির গতি অনুসারে প্রকাশ অপ্রকাশ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ অপ্রকাশ হইয়া থাকে। এইজন্যই মূলে, কি সমষ্টি ভাব, কি ভিন্ন ভিন্ন ভাব, উভয়ই পরমাত্মার ইচ্ছারূপ চন্দ্রমা প্রকাশকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তারাগণের গতি, ঊর্দ্ধ ও অধঃ দুই প্রকার। ঊর্দ্ধগতি ভিন্নতা-নিবারক এবং অধোগতি ভিন্নতা প্রকাশক ও রক্ষক। ঊর্দ্ধগতির অবস্থা, প্রকাশভাব হইতে আরম্ভ হয়। অধোগতি শব্দকেই প্রথম অবলম্বন করে। এই শব্দ হইতে, প্রাণ, প্রাণ হইতে তাপ, তাপ হইতে আস্বাদ ও আস্বাদ হইতে ব্যক্তি ও পদার্থগত ভেদ উৎপন্ন হইয়া জগৎ বা জড় চেতনরূপ ভিন্নতা প্রকাশের পরাকাষ্ঠা। যেমন চৈতন্যময় জ্যোতির অস্তিত্ব-প্রকাশক ইচ্ছাশক্তিরূপা চন্দ্রমা প্রকাশ, সেইরূপ জড় বা পদার্থভাবের ভিন্নতার অস্তিত্ব পৃথিবী পদার্থের আস্বাদরূপ জল পদার্থ। ইচ্ছাশক্তিই যেমন স্থূলের দিকে আসিলে সৃষ্টি, সেইরূপ আস্বাদ, সূক্ষ্মের দিকে গতিবিশিষ্ট হইলে প্রলয়। এজন্য বিবেক, বিতৃষ্ণা, প্রভৃতি গুণ, ব্রহ্মভাবে উপনীত হইবার উপায়; এবং রোগ অর্থাৎ স্থূল বা ভিন্নতার হরণের জন্য, প্রথমে জিহ্বার আস্বাদের পরিবর্ত্তন ও রক্ত মাংসের অবস্থান্তর। পরে রক্ত-মাংসের পরিবর্ত্তনে, অগ্নিরূপ তাপ বা ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তনে মন বা প্রবৃত্তির, এবং প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনের সহিত ভিন্ন ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। এই প্রবৃত্তি ব্যক্তিগত অবস্থায় নিবৃত্ত না হইলে, সুষুপ্তির অবস্থার ন্যায় জীবাত্মা চন্দ্রমা প্রকাশে স্থিত থাকে। জীব, শরীর ত্যাগ হইবার সময়, স্তরে স্তরে এই স্থূল জাতীয় ভিন্ন ভাব ত্যাগ হয়। এই ত্যাগের ন্যূনাধিক অবস্থাই, রোগ ও মৃত্যু।

যেমন ক্রিয়া বা অবস্থা, জীবের একমাত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাব

প্রকাশের কারণ, সেইরূপ ক্রিয়ারূপ জগৎস্রোতের জন্য, একই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা আকাশে, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, নক্ষত্র তারা প্রভৃতি রূপে প্রত্যক্ষ হন। যেমন অবস্থা বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার ভেদ থাকিলেও জীব ব্যক্তি একই, সেইরূপ, জগদ্‌ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন [illegible] ও ভাব প্রকাশ থাকিলেও, পরমাত্মা, একমাত্র ব্যক্তিই সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত রহিয়াছেন। যেমন ক্রিয়ার ভিন্নতা রক্ষার জন্য, ভাবের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ আবশ্যক, সেইরূপ বহুরূপ জগতের জন্যই, পরম জ্যোতির, ভিন্ন ভিন্ন, রূপ, বর্ণ, আকার ও ভাবের ভেদরক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রকাশ রহিয়াছে।

ন্যায় অন্যায়, সাধু অসাধু ভাব স্থূল, অস্থি মাংসের সহিতও সম্পর্ক রাখে। এইজন্য নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেও ব্যক্তি-ভেদে, ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হয়। যখন তাপ বা ক্ষুধাগ্নি বাহিরের অন্ন গ্রহণে বিমুখ, তখন স্থূল শরীর ও রক্ত মজ্জা প্রভৃতিকে তাপরূপে গ্রহণ করিয়া, আত্মা, ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ থাকেন। এই অবস্থায় আত্মার, ভিন্নতা প্রকাশের নাম, প্রেতত্ব। একারণ প্রেত অবস্থায়, নিরামিষ ভোজী ব্রাহ্মণের, আমিষ আহারের বিধান বলিয়া উক্ত আছে। এবং এই প্রেত অবস্থায়, শরীরের মজ্জা ও স্নায়ু সকলের রস শুকাইতে থাকে বলিয়া, এক প্রকার নেসা ও সুখ উৎপন্ন হয়। এই সুখ উৎপন্ন হইলে,রোগী বহুবিধ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মনোমধ্যে, সর্ব্ব সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের প্রকাশে, নানা প্রকার বিষয় অনুভব ও ভোগাভোগ করে এবং স্থূল শরীরের ভোগাভোগের প্রতি, অনেক অংশে, লক্ষ্যশূন্য হয়। এই অবস্থায়, ঐ আত্মার উপর অপর ব্যক্তির মনের বিষয় সকলও, বিশেষরূপ আধিপত্য করে। ক্ষুধাগ্নিকারী অর্থাৎ, যে শক্তি, জিহ্বায়, অগ্নিশক্তিকে প্রকাশ

করে, সেই শক্তিই, ইন্দ্রিয় সকলকে আহার গ্রহণে সমর্থ করিয়া থাকে। এজন্য মুখাগ্নিকারীর দশপিণ্ড দিবার বিধি; এবং ইন্দ্রিয় দশ বলিয়া দশপিণ্ডের ব্যবস্থা। মৃত্যুর পূর্ব্বে, ইন্দ্রিয় সকল বাহিরের পদার্থ গ্রহণ না করিয়া স্থূল শরীরকেই আহার করিয়া বর্ত্তমান থাকে। এবং ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল মনোরূপে একের অন্তর্গত হয়। এই এক ভাবে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, দশ ইন্দ্রিয়, স্থূল পদার্থ গ্রহণের উপযুক্ত হইলে, রোগ, আরোগ্য হইয়া, জীবচেতনা বা ব্যক্তি ভাবে প্রকাশ বা জীবিত থাকেন। তখন, তাহার একাদশ দিবস শ্রাদ্ধ অর্থাৎ মনের সহিত ইন্দ্রিয়াদির সেবা লাভ হয়। নচেৎ দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি এক হইয়া দ্বাদশ মাসান্তে, দ্বাদশ ভাবের প্রকাশের অতীত হইলে, পূর্ব্ব পুরুষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবভাবে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে জীবাত্মা, যে, বিরাট পুরুষে, নিষ্পন্দ ছিলেন, সেই পুরুষের সহিত, এক ভাবে অবস্থান করেন। ইহাই মূল সপিণ্ডকরণ। অর্থাৎ আপনাতেই আপনার স্থিতি বা অখণ্ড ভাবে লয় সাধন অর্থাৎ খাদ্য-খাদক-ভাবের পরিহারাবস্থা।

পঞ্চ পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ। এক ভাগ—তাপ, ইহা ক্রিয়াত্মক। অপর, প্রকাশ, ইহা আস্বাদরূপ। এই ক্রিয়া ও আস্বাদ বা ভাব, স্থূল ও সূক্ষ্মের উপর নির্ভর করিয়া পার্থক্য রক্ষা করে। স্থূলের সংস্পর্শে তাপ এবং সূক্ষ্মের আধিক্যে, প্রকাশ পদার্থ, ভাবরূপ ধারণ করে। এজন্য শরীর ক্ষীণ হইলে, বিকারাবস্থায় জীব অধিক কার্য্য করিতে না পারিলেও বা স্থূলের সহিত ব্যবহারে না আসিয়াও, সূক্ষ্মে, ভাবের আস্বাদে, অভিভূত হইয়া পড়ে। যেমন স্বপ্নের মধ্যে, অনেক স্বপ্ন সত্য

হয়, সেইরূপ, এই বিকারও, কখন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ঘটনার সাক্ষিস্বরূপ হয়। ইহা চরিত্রের উপর নির্ভর করে। যাঁহারা মিথ্যার দাস নহেন, তাঁহারা লোকবর্ণিত বিকারাবস্থায়, সত্য ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহাদের জ্ঞান, স্থূল ভাবের সহিত দৃঢ়তা রাখিতে পারিলেই, যোগী, সর্ব্বদর্শির আসন হইতে কিছুমাত্র কমি নহে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায়, এই সকল বিষয় অনুভবে না আসিলে, অবসন্নাবস্থায় সত্যানুভবের সামঞ্জস্য, পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা, অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ কারণ পূর্ব্ব হইতে যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও জাগতিক গতি ও ভাবাভাব অবগত হইতে পারিলে, মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়। পরমাত্মাতে দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠা থাকিলে, পৃথক্ চেষ্টা না করিলেও চলে। এ সকল শিক্ষার চেষ্টাই, যোগশিক্ষা অর্থাৎ ভগবানে অভেদ হইবার পথ; এবং ইহা স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ হইলে, ইহারই নাম, রোগ বলিয়া উল্লেখ হয়। এই পথের এক অবস্থায়, যোগী ও রোগী উভয়ই অবশ এবং বহু স্থলে যোগীর ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং রোগীর অপর ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর ব্যবহার নির্ভর করে। যোগী ও রোগীর অবস্থা ও ব্যবস্থা অনেক স্থলেই একরূপ। এজন্য আহার-ব্যবহার সম্বন্ধেও উভয়েরই সমান ব্যবস্থা।

যে ভাব দ্বৈতভাবকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখে বা দ্বৈত ব্যবহারের বীজ পূর্ণমাত্রায় নষ্ট না হইবার সহায়, তাহাই জাগতিক স্বাভাবিক বা জীবের সুস্থাবস্থা। ইহার বিপরীতই রোগ ও যোগাবস্থা। রোগে, ব্যক্তির দ্বৈতভাবের অবস্থা বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ভেদ ভাবের সত্যতা মুছিয়া গিয়া সূক্ষ্মের ভাবই

কেবল মাত্র সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয় ; যোগে, এই তিন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা, অবস্থা, বিশেষত্ব এবং সত্য মিথ্যার সহিত এই তিনের অতীত যে বস্তু,তাহারও ভাব বুঝা যায়। জ্ঞানের ব্যপকতার ভেদই যোগী ও রোগীর ভেদ। নচেৎ কি বস্তুত্বঃ কি ব্যক্তিত্ব, কি রূপ গুণ ভাবে, বিশেষ ভেদ নাই বলিলেও বলা যায়। রোগীকে যে অবস্থার মধ্যে দিয়া মৃত্যুকে গ্রহণ করিতে হয়, যোগীও, সেই সেই অবস্থার মধ্য দিয়া অভেদরূপ দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত অবস্থায় উপস্থিত হন। এই অবস্থার জ্ঞান বা ভাব লাভ করিতে পারিলে, কি মুমুক্ষু কি মুমূর্ষু, উভয়েরই হিত বা সেবা করা সম্ভবপর। এই সেবাই, জীবের পক্ষে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রয়োজনীয়। অন্যান্য সকল প্রকার প্রয়োজনে, সাধারণ মনুষ্য, অল্প বিস্তর উদ্ধার হইতে পারিলেও, এ বিষয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সাধারণের পক্ষে সুকঠিন। এ কারণ যাহাতে এই অবস্থায় জীব,সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মাকে সর্ব্বাশ্রয় ও প্রিয় এবং স্নেহ ও দয়ার আস্বাদরূপ বলিয়া বিশ্বাস, ও অনুভব করিতে পারেন এবং অপরের জানা থাকিলে কিছু কিছু কষ্ট নিবারণের উপায় বলিয়া দেন এবং যে ভাবে স্থূল শরীর রাখিলে বা স্থূল সূক্ষ্মের সহিত, স্থূল সূক্ষ্মের বা ঔষধের মিলন ঘটিলে, ব্যক্তিভাব শান্তভাবে পরমার্থনিষ্ঠা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ব্যবহার করাই, জাগতিক বন্ধুর কার্য্য, ইহার বিপরীত চেষ্টা শত্রুতা নামেরই উপযুক্ত।

আয়ুরূপ তাপের অন্তর্নিহিত যে প্রকাশ বা চেতনাশক্তি,তাহাই ইন্দ্রিয়রক্ষার মূল শক্তি পরমায়ু। এই শক্তি শরীরীতে অবস্থান করিলে, ইন্দ্রিয়রক্ষার উপযুক্ত বাহিরের স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে অগ্নি-শক্তি স্থূল সূক্ষ্ম ভাব গ্রহণ করিয়া রক্ষা করে। এই পরমায়ু শক্তি,

শরীরে অস্তমিত হইলে, প্রথমে শরীর স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বা আয়ু শক্তি, বাহির হইতে স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ না লইলে, স্থূল শরীর কৃশ ও সূক্ষ্ম শরীর বলহীন হইয়া পড়ে এবং স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্মশক্তি আপন সূক্ষ্মশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া ক্রমে আপনিই স্থূল শরীরকে পরিত্যাগ করে বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম মৃত্যু।

প্রথমে অগ্নিব্রহ্মের খর্ব্বতায় বল ও রূপের বিকার। তাহার পর, প্রাণের অবসন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ শক্তির ও ব্যক্তিগত বল হ্রাস হইয়া আকাশ * তত্ত্বে একই সময়ে বহু ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রকাশ পাইতে থাকে। তাহার পর, এই ভিন্নতা, চন্দ্রমাজ্যোতিঃর উন্মুখীন হইলে, শব্দ- ভাব লয় হইয়া প্রকাশেই, ভাবের উদয় অস্ত, ইচ্ছা-

* আকাশভাবের স্থূলভাব শব্দের সহিত জগতীর সর্ব্বপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন স্থূলপদার্থ বা ক্রিয়া অবস্থা। স্থূল আকাশতত্ত্বের হাত হইতে এড়াইতে পারিলে অথবা মনের প্রতি আকাশ পদার্থের স্থূলভাবের আধিপত্য কমাইলে, স্থূলের সুখদুঃখ জ্ঞান লোপ হয়। আকাশের সূক্ষ্ম অংশ বা মহা-আকাশস্থিত ভাবের ভেদ হইতে নিস্তার লাভ হইলে, ভাবের আস্বাদ বর্জ্জিত, এবং আকাশ পদার্থের কারণভাব ব্যক্তিত্ব ভেদ। এই ভেদভাবের অতীত অবস্থায় একমাত্র সত্য বস্তু প্রকাশ থাকা সত্যেও ভিন্নভাব না থাকায়, এক কি বহু কিছুই বলিবার থাকে না। ইহা সর্ব্বভাবাভাব বা সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, জ্ঞান, বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, কারণ সূক্ষ্ম স্থূলের সাম্যবস্থা বা যৎতৎ। একপক্ষে প্রকাশের তারতম্য রাখিয়া আকাশ পদার্থই যেমন, জগত প্রকাশের মূলরূপে প্রকাশ, সেইরূপ অপর পক্ষে মহাকাশ চেতনময় প্রকাশ পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি চেতানা ও সর্ব্বভাবাভাবকে, এক করিয়া ক্রমে একই ব্যক্তির উপস্থিতীর দিকে গতী ঘটাইয়া, সর্ব্বপ্রকার ভাবের প্রকাশকে, এক প্রকাশ মাত্রে, সমাপ্তি করিলে আপন ও পরভাবের অভাব ঘটে। আকাশ ভাব-ক্রিয়ার ভেদাত্মক। মহা আকাশ-ভাবের ভেদ রক্ষক। ক্রিয়া পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ থাকিলেই অপর ক্রিয়ার অনুভব থাকে বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া রহিয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু কোন একটী ভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ হইলে, উহার অতীরিক্ত কোন ভাব আছে বলিয়া অনুভূতি থাকে না। ঐ ভাব অপসারিত হইলে পর, আগতীক ক্রিয়ার উপর লক্ষ আসিলে তবে ভাবেরও যে, ভেদ আছে, তাহা বুঝা যায়।

শক্তির গতি অর্থাৎ মন যেভাব সর্ব্বদা পোষণ করে, ঐ ভাবের অনুরূপ গতি অনুসারে ঘটে। কর্ণের রস শুকাইতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে, শব্দজ্ঞান লোপ পাইয়া, রূপেই সর্ব্ব ভাব প্রকাশ হয়। তাহার পর, চক্ষের রসাংশ কমিতেকমিতে, ব্যক্তিচেতনার ভিন্ন জ্ঞান অন্তর্হিত হয়। এ অবস্থায় রোগী, ভোগের বিষয় সকল, জ্যোতিঃ-পদার্থের মধ্যে, ভাবেই ভোগাভোগ করিয়া থাকে। এই সময়, সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের অন্তরের পবিত্রতা ও আসক্তি অনুসারে, গত ভাব স্মরণে পান এবং বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে, এক করিয়া উপলব্ধি করেন। এখানে পরমাত্মার ও জীবাত্মার নিত্যতার সাক্ষ্য, ভালরূপই পাওয়া যায়। পরমাত্মাতে যে, সমস্তই, সর্ব্বদা উপস্থিত আছে এবং জীবাত্মার উপস্থিতি যে,কেবল মাত্র শরীরী অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে না, ইহাই, জীবকে বুঝাইবার জন্য, ভবিষ্যৎও, জীবের নিকট বর্ত্তমান, এই ভাব রাখিয়াছেন। বিচার করিলেও বুঝা সহজ যে, যদি জীব মৃত্যুর পর, অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব-রহিত হয়, তাহা হইলে, যাহা এখনও উপস্থিত হয় নাই, তাহা, তাহার নিকট উপস্থিত না হইলে, কেমন করিয়া তাহার অনুভূতিতে আসিল। ইহা নিশ্চয় সত্য যে, জীব শরীর-ত্যাগের পর তাহার অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব হারায় না; এবং ব্যক্তিত্ব, ইন্দ্রিয় ও ভিন্নতার উপরই নির্ভর করে। অতএব মৃত্যু দ্বৈতভাব বা ব্যক্তিভাবের হরণকর্ত্তা নহে এবং শরীরত্যাগ হইলেও আস্বাদযুক্ত প্রকাশরূপে জীব ব্যষ্টি অবস্থায় বীজরূপে শরীরী ভাবে অবস্থান করেন। এবং এই ভিন্নতা থাকে বলিয়াই, জীবের পুনঃ প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সকল বিষয়, উত্তমরূপে বুঝিয়া, যাহা জীবাত্মার আকাঙ্ক্ষনীয়, তাহাই জীবাত্মার পক্ষে মঙ্গল ও

প্রয়োজনীয় বুঝিয়া জীবের সেবা শুশ্রূষা করা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্য; এইরূপ সেবায়, অপরাপর ব্যক্তির সহিত, নিজেরই হিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই মূল আত্মসেবা। অনেক সময়, মন বুদ্ধি সুস্থ না থাকিলেও, ইন্দ্রিয় অভ্যাসবশতঃ শরীরের মাঙ্গল্য ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ সময়, সেবকের পক্ষে, বিশেষ বিচার করিয়া সত্যভাব বুঝিয়া, সহায়তা করিতে পারিলে, রোগীর অনেক উপকার হয়। সাধারণতঃ রোগীর ইচ্ছামত চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। রোগী নিতান্ত বুদ্ধিহীন থাকিলে, তাহাদের প্রিয় ব্যক্তি বা নিকট আত্মীয়ের বুদ্ধি ও ইচ্ছামত ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য, অবোধকে কোন কালেই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অনুচিত নহে। ইহা সর্ব্ব অবস্থাতেই সকল বুদ্ধিমানেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু বুদ্ধিমানদিগের ইহাও বুঝা প্রয়োজন যে, তিনি যাহা লইয়া বুদ্ধিমান, তাহাও পরমেশ্বরের আয়ত্তাধীন। এবং স্থান কাল পাত্র বিশেষে, বুদ্ধিই অবুদ্ধি নামে, পরিচিত হয়। এ কারণ, সেবা করিবার মূলে, পরমাত্মার শরণাগত হইয়া, সেবার ব্যবস্থা রাখা উচিত। মনুষ্য চিরকালই আপন আত্মীয় স্বজন প্রিয় ব্যক্তির সম্মিলন অবস্থাই প্রার্থনায় রাখে। এবং সাধ্যমত, বুদ্ধি জগতে, মনুষ্যকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ যাহাতে অকাল মৃত্যু না হয়, সে চেষ্টাও হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত, তাহার কোন প্রতিকারই হইল না। কোন এক রোগ নিরাকরণের ঔষধ প্রকাশ হইলে, অনেকেই আনন্দিত হন। কিন্তু নূতন এক রোগ আসিয়া, দশ বিশ গুণ মৃত্যু সংখ্যা বাড়াইয়া দিল। দশ বৎসর মৃত্যু সংখ্যা কমিয়া আসিয়া, এক বৎসরে বিশ বৎসরের বাকী পড়া উশুল

হইয়া গেল। যতদিন হইতে মনুষ্যের জন্ম ততদিন হইতে স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা প্রকাশ হইয়া, এক কার্য্যের সফলতা, অপর কার্য্যে বিফল প্রয়াস হইয়া আসিতেছে। অন্নের অভাবেও মৃত্যু, অন্ন পাইয়াও মৃত্যু। অন্নের অপব্যবহার না করিলেও স্থানান্তর হইতে মৃত্যুই সংক্রমিত হইয়া থাকে বা মনুষ্যকে গ্রাস করিতেছে। মৃত্যুও থাকিবে, মৃত্যু নিবারণের চেষ্টাও হইবে। ইহা পরমাত্মারই অভিপ্রেত। কিন্তু, বুদ্ধিমান মনুষ্য কি, পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর, একবারও দৃষ্টিপাত করিবেন না। একবারও কি ভাবিবেন না যে, যিনি ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে, ঐ শক্তি যথায় তথায় প্রকাশ করিতে ও রক্ষিত স্থান হইতে গ্রহণ করিতে সক্ষম? যদি ইহা একবারও ভাবেন, তাহা হইলে, ঔষধাদি অপেক্ষা, পরমেশ্বরের প্রতি ভরসা রাখিবার চেষ্টা করা ও করাণ কি অধিক প্রয়োজন, মনে হয় না? আরও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, সৃষ্টিকর্ত্তার প্রয়োজনে সৃষ্টি, কিম্বা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছায়, সৃষ্টি পালন ও লয় হইতেছে। যদি তাঁহার ইচ্ছায় হয়, এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান স্বাধীন পুরুষ হন, তাহা হইলে, কে তাহার ইচ্ছার বিপরীতে, রক্ষা বা নাশ করিবে? তবে কেন পরমেশ্বরের ভরসা রাখিবার দিকে শিথিলতা? যদি, ঔষধ রোগ নিবারণের নিমিত্তক হয়, তাহা হইলে, ইহা যে মৃত্যুর নিমিত্তক হইবে না, ইহাই বা কে বলিতে পারে? বহু চিকিৎসায়, জীবন লাভ করিলে, মৃত্যুর নিমিত্তক, উপস্থিত না হওয়ায়, ব্যর্থ কষ্টের মধ্য দিয়া জীবনলাভ যে হইল না, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার কি উপায় আছে? আরও, বিচার করিয়া দেখা উচিত, উপস্থিত জগতে ঔষধাদি লাভের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার উপযুক্ত অর্থ দিতে, অল্প

লোকই সমর্থ। ঔষধ ও তাহার ব্যবস্থাদাতাদিগের উপর ভরসা স্থাপিত হইলে, শতকরা ৯৯ জন লোককে, মিথ্যা আপশোষ রাখিয়া, জগতে বৃথা দুঃখের আধার হইতে হইবে। এমন অবস্থায় পরমাত্মার উপর নির্ভর রাখা কি, জ্ঞানী বিজ্ঞানীদিগেরও কর্ত্তব্য নহে ? হে মনুষ্যকুল ! আপনারা উদ্বিগ্ন না হইয়া, স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে পারিবেন, যে, পরমাত্মার ইচ্ছা ব্যতীত একটী তৃণও পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে অক্ষম, তিনি যাহা, ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়, হইতেছে এবং হইবে। উপস্থিত কালে, জীব অহঙ্কারকে, বিশেষ প্রিয়ভাবে বলিয়াই, পরমাত্মাই এখন মনুষ্যমধ্যে অহঙ্কারশক্তিকে বাড়াইয়া, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি দয়া করিয়া, জীবের অহঙ্কার নিবারণপূর্ব্বক, ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা প্রদান করিলে, "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" এই ভাবই প্রকাশ হইয়া জগৎ আনন্দময় হইবে।

যাঁহারা সুচিকিৎসক, তাঁহারাও জানেন যে, শরীরে যে রোগ-নিবারিণী শক্তি আছে, উহাও পরমাত্মাই রাখিয়াছেন। ঔষধ ঐ রোগ-নিবারিণী শক্তিকে সাহায্য বা রোগীর সহন শক্তিকে বৃদ্ধি করে, অথবা রোগীর প্রবল কষ্টকে কমাইয়া দেয়। ইহাও সম্পূর্ণরূপে রোগীর স্বাভাবিক শক্তির উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। যে ঔষধ রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি করে, উহা ঐ রোগের ঔষধ না হইয়া, বিষই হইয়া থাকে। মন, আমাদের একটী মূল পদার্থ বা শরীর রক্ষার মূল যন্ত্র। এজন্য, মনই শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য, দিবারাত্র চিন্তা করিতেছে। মনের প্রফুল্লতায়, শরীরের স্বচ্ছন্দতা ঘটে, এবং মনের বিকৃতির অবস্থায়, শরীর, তেজ, বলহীন হইয়া বিশেষরূপ অসুস্থ হয়। অতএব, যাহাতে, রোগীর মনের স্বচ্ছন্দতা ও নির্ভাবনা

আইসে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়—পথ্য; ঔষধ যতই দেওয়া হউক না কেন, পথ্য উপযুক্ত না হইলে, কোন ঔষধই, রোগ নিবারণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে না। তৃতীয়-স্বভাবের সাহায্য; যাঁহাতে স্বভাব অর্থাৎ জল, বায়ু, তাপ ও প্রকাশ পদার্থ অস্বাস্থ্যকর বা রোগীর কষ্টের কারণ না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা রাখা। চতুর্থ—পরিচারকদিগের চরিত্র, অন্তঃকরণ ও আচার-ব্যবহার ও পরমার্থনিষ্ঠা ও প্রীতিযুক্ত সেবা। পঞ্চম-চিকিৎসার সুব্যবস্থা।

জীবাত্মার যে ব্যক্তিগত প্রকাশ, তাহাই শরীররক্ষার মূল কারণ। এই প্রকাশ, বর্ত্তমান থাকিলে তাপ ও রস গ্রহণ ও রক্ষাশক্তি বর্ত্তমান থাকে। ইহার অবর্ত্তমানে বা বিরুদ্ধগতীতে রক্ষা বা ধারণকারিণী শক্তির অভাবে ঔষধাদি রোগ নিবারণে অকৃতকার্য্য হয়।

পরমেশ্বর স্বভাবতঃ নব দ্বার রাখিয়া, জীবের রোগশক্তিকে অহরহঃ নিষ্কাশিত এবং প্রাণ ও ক্ষুধাশক্তিদ্বারা শরীর রক্ষা ও বর্দ্ধিত করিতেছেন। স্বভাবের এই শিক্ষা অনুসারে রোগ ও স্বাস্থ্যের জন্য ত্যাগ ও গ্রহণের ব্যবস্থা। যে রোগ, এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও নিবারিত না হয়, তাহা স্বয়ং মৃত্যুর উপস্থিতি, বুঝা প্রয়োজন।

প্রাণবায়ু ও ক্ষুধাগ্নি, প্রয়োজনীয় পদার্থের গ্রহণকারী ও মলাদি রূপে রোগ-শক্তিকে নিষ্কাশিত করিবার উপায়। বমন, দাস্ত, ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব, শরীরকে রোগমুক্ত করে। যে রোগ ইহা সত্ত্বেও নিবারিত না হয়, তাহা উৎকট রোগ বলিয়াই বুঝা আবশ্যক। রোগ, উৎকটের সীমা অতিক্রম করিলেই, মৃত্যুর দর্শন উপস্থিত হয়। এই ঘোর দর্শনে, সাহসীও ভীরু, মহারাজও

দরিদ্র, পাপী পুণ্যাত্মা সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়ে। এ সময়, পরমেশ্বর যাঁহাকে দেখা দেন, তিনিই কেবল মাত্র তাঁহার মুখ তাকাইয়া শান্ত থাকিতে পারেন। এই সময় যাহাতে মুমূর্ষুর প্রাণ ক্লেদশূন্য হয় এবং দাস্ত বদ্ধ হইয়া উদর অধিক স্ফীত না হয়, তাহার চেষ্টা করিলে শারীরিক কষ্টের, কতক লাঘব হইতে পারে। এই সময় রোগীর ইচ্ছামত উঠান বসান বা পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনাদি আবশ্যক। মুমূর্ষু, নির্ব্বাক্ থাকিলে, সুমিষ্ট রস বা অল্পপরিমাণ জল পুনঃ পুনঃ দেওয়া প্রয়োজন, এবং প্রয়োজন বুঝিলে, স্নান করান বা উত্তাপাদি দেওয়া আবশ্যকও হইতে পারে। এমত মনে করা উচিত নহে যে, আর বাঁচিবে না, তবে বৃথা কেন স্নানাদি করাইতে হইবে। এই সময়ে সেবা করাই আত্মীয়ের পক্ষে আপন আত্মা বা পরমাত্মারই সেবা বলিয়া মনে করা উচিত।

মুমুক্ষু নানাপ্রকার ভাবিয়া ভাবিয়া কিনারা না পাওয়ায় বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে। এ অবস্থায়, যাহাতে সে ব্যক্তি, দৃঢ়ভাবে ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া সর্ব্ব ভাবনাকে, একই ব্রহ্মধ্যানে নিমগন রাখিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন। যেমন, মনবুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়ের মিলনরক্ষার দ্বারা, রোগের উপশমের চেষ্টার প্রয়োজন, সেইরূপ ভক্তিশ্রদ্ধারূপ রসের সহিত অদ্বৈত জ্ঞানের মিলন রক্ষার দ্বারা, মুমুক্ষুর সিদ্ধিলাভের সহায়তার প্রয়োজন। যেমন দ্বাদশ মাসান্তে মুমূর্ষুর পূর্ব্বপুরুষের সহিত মিলন বা সপিণ্ডকরণ হয়, সেইরূপ দশ ইন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধির অতীত ভাবে জীবাত্মা প্রকাশ হইতে পারিলে, ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব ঘটে। যিনি এই ভাবে মুমুক্ষু ও মুমূর্ষুর সেবা করেন, তিনিই যথার্থ ভগবানের সেবক।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

মরণ।

হে মৃত্যু, তুমি কি ভীষণ! তোমার নামেই, জীবকুল আকুল হইয়া পড়ে। তোমাকে দেখিবারও অপেক্ষা রাখে না। অতি দূরেও তোমার আগমন-বার্ত্তা শ্রুত হইলে, চক্ষু ঘুরিতে থাকে, কাণে তালা ধরিবার যো হয়। তোমার রাজ্য ছাড়িয়া পলাইবার জন্য হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া লাফাইয়া উঠে। তবে কেন, কখন কখন প্রিয় বন্ধুর সম্মিলনআকাঙ্ক্ষার ন্যায়, তোমাকেও কেহ কেহ আলিঙ্গনে অভিলাষী হয়? তাহারা তো, তোমার তাড়নার বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহে! কষ্টও তাহাদের প্রিয় নয়। তথাপি কেন তোমাকে চাহে?

বাস্তবিক পক্ষে, তাহারা তোমার জন্যই তোমাকে চাহে না। তাহাদের চাহিবার কারণ শান্তি। তুমি গন্তব্য পথ আগলাইয়া রাখিয়াছ মাত্র। তাই তাহারা, তোমাকে ভীষণ অপেক্ষা ভীষণ জানিলেও, তোমাকে না চাহিয়া থাকিতে পারে না। কেন না, তোমাকে পরাস্ত করিতে না পারিলে, অশান্তির পরপারে যাওয়া অসম্ভব। তাই তোমাকে জয় করিবার জন্য তোমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। নচেৎ চিরকাল তোমার গ্রাসে থাকিবার জন্য কেহই তোমাকে চাহে না। অশান্ত ইন্দ্রিয়, অশান্ত জগৎ তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে, অসহ্য যাতনায় পড়িয়া, মরণ! তোমা রূপ বেড়া ভাঙ্গিয়া, আপন শান্তিগড়ে উপস্থিত হইবার জন্যই তোমাকে চাহে। হে মরণ, তুমিই এই জগৎ ও মঙ্গলময় পরমাত্মার মাঝে থাকিয়া জগতের নানাপ্রকার কষ্ট উৎপন্ন করিয়াছ। শান্তিময় মাতাপিতার নিকট হইতে দিতেছ না।

জগৎ তোমারই রাজ্য। তাই তুমি জীবকে ভোগ করিয়া পুনরায় বিষ্ঠারূপে জগতেই পরিত্যাগ কর। তাই জগতের সহিত জীব দুর্গন্ধময় অসৎ হইয়া আছে। তাই বলি, হে মরণ, তোমার কি মরণ নাই? তুমি কি চিরকালই বাঁচিয়া থাকিবে? তোমার রাজ্যে, তোমার পীড়নে, জীব ঝালাপালা হইয়াছে। হে মরণ, জীব চিরকাল মরিয়া আসিতেছে। ক্রমে মরণ যেন, তাহাদের অভ্যাস হইয়া পড়িল। এইবার তোমার মৃত্যু। যে দিন জীব, তোমাকে আপন শক্তি বলিয়া বুঝিবেন, সেই দিনই তুমি জীবের গ্রাসে প্রাণ হারাইবে। সেই দিন, জীব তোমার ভয়ে কাতরও হইবে না, প্রাপ্তির সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাও নিষ্প্রয়োজন হইবে। তখন জীব তোমাকে পরমাত্মারই দয়ার ঝরণা জ্ঞানে, সুখে তোমাকে পান করিতে প্রস্তুত থাকিবে, রোগ, শোক, অকালমৃত্যুরূপ তোমার পদাঘাত আর সহিতে হইবে না। ভক্তি ও জ্ঞানের পোল এপার ওপারের ভেদ, উঠাইয়া দিবে।

হে মৃত্যু, আমাদের দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত খর্ব্ব বলিয়াই না তোমার আধিপত্য? নচেৎ পূর্ণ, একমাত্র পরমাত্মার অতিরিক্ত তুমি কোথায় থাকিবে, বা কি হইবে? আমরা জন্ম কল্পনা করিয়াছি বলিয়াই না, তোমার অস্তিত্বের অহঙ্কার? আমরা, না তোমাকে, না নিজেকে চিনিতেছি, সেইজন্যই না তুমি প্রতাপশালী? হে মৃত্যু! মিথ্যা আর জীবকে ভয় দেখাইও না। প্রসন্ন নয়নে জীবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তোমাকে জীব বন্ধু বলিয়াই দেখুক।

যতদিন তুমি জীবের সর্ব্বপ্রকারে, বিষয়হারী রূপে দেখা দিবে, ততদিন তোমাকে, শত্রু বলিয়াই বোধ করিবে। কিন্তু, যদি

কেহ বুঝিতে পারে যে, তুমিই, আমাদের অহঙ্কাররূপ সীমা বা বন্ধন উঠাইয়া, বিষয়-বিষয়ীর সহিত অভেদ করিয়া দিতেছ, তুমিই আমাদের ক্ষুদ্রতা তুলিয়া লইয়া, অনন্ত অসীমত্বের লক্ষ্য ঘটাইয়া থাক, তুমিই আমাদিগের সুখদুঃখময় জ্বলনকে ঘুচাইয়া, শান্তিভোগের সহায়, তখন তোমাকে, কে না, প্রিয় বন্ধু মনে করিয়া থাকিতে পারিবে? তথাপি হে মৃত্যু, লোকসমাজে তোমার দুর্নামই রটিয়াছে। তাই বলি, যখন অপযশ লইয়াছ, তখন ভাল করিয়াই লও। এক বার তুমি সকলকে জীবনেই, মৃত করিয়া রাখ তাহা হইলে, আর কেহ তোমার নিন্দাও করিবে না এবং শত্রু বলিয়াও মনে ভাবিবে না। জীব বুঝিতে পারিবে যে, যাহাকে তাহারা জীবিতাবস্থা বলিতেছে, তাহাই তাহাদের মৃতাবস্থা। এবং যাহা মৃতাবস্থা বলিয়া আশঙ্কার বিষয় মনে হয়, তাহাই যথার্থতঃ জীবিতাবস্থা। ইহা দেখিলে, আর কেহই তোমাকে শত্রু মনে করিবে না, জগত হইতে তোমার দুর্নাম উঠিয়া গিয়া সুযশই থাকিবে।

ইন্দ্রিয় আমাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রিয়ই আমাদিগকে ভুলাইয়া নিজের করিয়া আদর দেখাইতেছে। আমরাও ইন্দ্রিয়ের সাজে সাজিয়া, ইন্দ্রিয়কে পরমাত্মীয় বোধে, ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার বিষয়ে মজিয়া আছি। তাই ইন্দ্রিয় ছাড়া কাহাকেও আপন বলিয়া মনে করিতে পারি না। মরণ! তুমি এই ইন্দ্রিয়েরই হরণকর্ত্তা। তুমি আত্মার ইন্দ্রিয়রূপ খোলসটী গ্রাস কর বলিয়াই, তোমারই নাম রাক্ষস। এ রাক্ষসত্ব আমাদের জন্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়ের পক্ষে। কিন্তু ইন্দ্রিয় আমাদিগকে এমনই ভুলাইয়াছে যে, তাহার মৃত্যুতে আমরা, আমাদের মৃত্যু বোধ করি। তাই আমরা তোমাকে দেখিলে বা তোমার নাম শুনিলেও ভীত হই। হে

মৃত্যু! তুমিই আমাদের পরমবন্ধু এবং কষ্টের নিবৃত্তিরূপ পরমাত্মীয়! তুমি যখন এতই করিয়াছ, তখন আর কিছু দয়া করিলেই আমরা তোমাকে চিনিয়া নির্ভয়ে রহিব। তুমি যখন আমাদের খোলস উঠাইতে আইস, তখন তোমারও খোলসটী ছাড়িয়া রাখিও। তাহা হইলে, তোমার সহিত আমাদের একই রূপ দেখিলে, আর ভীত হইব না। ভিন্ন রূপ দেখি বলিয়াই ভয় হয়। হে মরণ! এ বন্ধুত্ব করিতে তুমি কাপণ্যতা করিও না। তাহা হইলে আমরা প্রফুল্ল অন্তরে, কি ইহ জগতে, কি পর জগতে, আনন্দেই অবস্থান করিতে পারিব। আত্মা, তোমাকে চিনেন, তাই জাগতিক বা ঐন্দ্রিয়িক তাড়না অসহ্য হইলে তোমাকেই, আপন জানিয়া, মনকে চাহিতে বলেন। মন তোমায় না চিনিলেও তাড়নায় পড়িয়া না চাহিয়া থাকিতে পারে না। হে মৃত্যু, যাহাতে মনের অবস্থা আত্মারই ন্যায় চক্ষুষ্মান্ হয়, তাহা তুমি ঘটাইয়া জীবের চির অন্ধত্ব মোচন কর। তাহা হইলেই জীব তোমাকে বন্ধু বলিয়াই দেখিবে।

লোকে আপনারই একটী অবস্থার নাম, মরণ বলিয়া রাখিয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহারা না থাকিলে, তুমি কোথায় থাকিবে? আর কেই বা মরিবে? জীবাত্মা, নিত্য অমর, তাঁহার কোন কালেই মৃত্যু নাই। যে স্থূলশরীর, জন্মের পূর্ব্বে পঞ্চতত্ত্বরূপ ছিল, আত্মার ব্যক্তিত্ব ভাব বর্জ্জিত হইলে, তাহার সেই নিত্যাবস্থাই ঘটে। যে শক্তি, স্থূল সূক্ষ্ম শরীরকে গঠন করে, সে শক্তি কখন ধ্বংস পায় না। যে মূর্ত্তি স্থূলে প্রত্যক্ষ হয়, উহাও তাহার কারণভাব আকাশেই নিত্য বর্ত্তমান থাকে। তবে তুমি কাহার প্রতি আধিপত্য কর? হে মৃত্যু! অন্ধত্ববশতঃ জীব তোমার এক ভীষণ রূপ কল্পনা করিয়া, আপন পরিখায়, আপনিই ডুবিয়া মরিয়া

গাইতেছে। তাই পরিত্রাণের জন্য, সত্য জ্ঞানের অভিলাষী। তাই তোমার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, সাধনা, তাই তোমাকে চক্ষের আড়াল করিবার জন্য ব্রহ্মকল্পনা। নচেৎ জীব যাহাকে আমি বলেন, তিনিই একমাত্র নিত্য বিরাজ। তাঁহা ছাড়া অন্য কেহই নাই। কিন্তু এ জ্ঞান, তুমি আছ বলিয়াই জীবের প্রকাশ হইবার আশা। নচেৎ জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, চিরকাল প্রকাশ থাকিলে, সমষ্টি আমিত্বের জ্ঞান, সর্ব্বকালের জন্য অদৃষ্য থাকিত। হে মরণ, তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরাজিত হইলেও, তোমার অবমাননা নাই। কারণ, তোমাকে জয় করিলেও অহঙ্কার আস্ফালনে বিরত থাকে। কারণ একদিন জীবকে তোমার নিকট পরাজিত হইতেই হইবে। তাহা অহঙ্কার ভাল রূপই জ্ঞাত আছে। অতএব তুমি জীবের যথার্থ বন্ধু বলিয়াই, তোমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে বলি। জীব তোমার কোলে যাইয়া যেমন রোগ, শোক, তাপ, দুঃখঃ, দারিদ্রতা প্রভৃতি হইতে নিস্তার পায়, সেইরূপ আপনাকে ভুলিয়া নরকরূপ অজ্ঞানজনিত জন্ম মরণ ভাবিয়া যে কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পায়। কিন্তু তুমি একবার পরাজয় হইলেই, সকল জ্বালা হইতেই নিস্তার পাইবে। তাই বলি মৃত্যু, তুমি সেইরূপে প্রকাশ হও, যেরূপে প্রকাশ হইলে, জীব তোমাকে চিরবন্ধু বলিয়া বা আপনার হইতেও আপনার বলিয়া চিনিতে পারে। হে মরণ, তুমি ভয়ের কারণ না হইয়া, আনন্দের নিমিত্তক হও। তাহা হইলে, সকলের সহিত তুমিও নিস্তার পাও। নচেৎ উভয়েরই মরণ আবশ্যক।

হে মরণ! তুমিও ভিন্নভাবে সম্পূর্ণরূপ বিষাদ নহ। তুমিও

অনেকের প্রার্থনীয়। জগতে বিষয়ের তাড়নায়, যে ব্যক্তি মর্ম্মাহত, সেও যেমন তোমাকে চাহে, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মানন্দে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও তোমার জন্য অনেক আকিঞ্চন রাখেন। এই দুইজনের ভাবের প্রভেদ এইমাত্র, একজন নিজকে দুঃখের জ্বালায় নাস্তি করিবার ইচ্ছায় তোমাকে চাহে, আর একজন নাস্তিত্ব উঠাইবার জন্য, তোমার দর্শন আশা করে। তাই বলি মৃত্যু, তোমাকে চিনিতে পারিলে, তুমিও উপাদেয় বস্তু, এবং তুমি যাহাকে গ্রহণ না কর, সে কখন আপনাকেও গ্রহণ করিতে পায় না। কারণ তুমিই ভবনদী। তোমাকে পার হইলে, তবেই জীবের শান্তিঃ বা আপ্তপ্রাপ্তি ঘটে। হে মৃত্যু, তুমি আর জীবকুলের ভয়াবহ না হইয়া প্রিয়রূপে প্রকাশ থাক। তোমার কৃপায় আপনাকে বা পরমার্থকে চিনিয়া সকলেই পরমানন্দের চির আস্বাদ ভোগ করুন। তাহা হইলে তোমার দুর্নাম উঠিয়া গিয়া সুযশই প্রকাশ থাকিবে। জীবকুলও শান্তি পায়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

কল্পিত ও অকল্পিত উপাসনা।

যতক্ষণ, যাহাকে, সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ না করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা, উহা বাস্তব ধারণা নহে। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে এই রীতি দেখা যায় যে, যেকোন একটী পদার্থের ভাব, একটী ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিলেও, অপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে সত্য ধারণা করিতে অপারগ থাকে ;—যেমন কর্ণ ইন্দ্রিয়ে শব্দ

শ্রবণ হইলেও ঐ পদার্থের রূপ, স্পর্শজ্ঞানাদি অবশিষ্ট থাকে। পূর্ণভাব, মন বুদ্ধিতেও ধারণা হওয়া, অস্বাভাবিক। অতএব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাহা অনুভূত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যৎটুক সত্য লাভ সম্ভব, তাহার অতিরিক্ত বহু সত্য ভাব অবশিষ্ট থাকায়, মন পূর্ণমাত্রায় সত্যলাভে বঞ্চিত, এই অবস্থায় মন অতিরিক্ত ভাবে রঞ্জিত হইবার চেষ্টায়, যাহা ধারণা করে, উহা কল্পনা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। উপাসনারও বিষয়, বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্য বা ব্রহ্ম জীবাত্মায় প্রকাশ না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা, উহাও কল্পিত ভাব ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এইভাবে দেখিলে দেখা যায় যে, কি নিরাকার, কি সাকার, কি অখণ্ডাকার, আর কি ভূত প্রেত বা প্রতিমাদি, সকল প্রকার উপাসনাই কল্পিত উপাসনা। কারণ, যে ব্যক্তি উপাসক, তাহার এই সকল ভাবের কোন ভাবটীই, পূর্ব্ব হইতে যথার্থতঃ জানা থাকে না; এবং সকলেই নিজ নিজ মনবুদ্ধির দ্বারা, উপাস্যের ভাব, রূপ, গুণ, শক্তি বা নির্গুণত্ব আনন্দময় ভাবাদি গড়িয়া লয়েন। যিনি সগুণ সাকার ধারণা করেন, তিনিও সগুণ সাকারকে তাঁহার নিজের মত করিয়া লয়েন। নিরাকার নির্গুণ ধারণা কারিরও পক্ষে, তাহাই। এবং যাহারা ভূত প্রেত কিম্বা প্রতিমা উপাসনা করিতেছেন, তাঁহারাও আপনাপন কল্পনায় যাহা পায়, তাহাই সত্য বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক উপাসনায় ব্রতী হয়। অতএব উপাসনা সম্বন্ধে কল্পনা, সর্ব্বজাতীয় সাধকের মধ্যেই একরূপ।

এই কল্পনা দুই ভাবে বিভক্ত। এক সত্য, অপর মিথ্যা। যাহা জীবের হীতকর ও আপনার উদ্দেশ্যের সহিত মিলাইয়া পক্ষপাতহীন

বিচারের অন্তর্গত হয়, উহা, সত্য, এবং যাহা ইহার বিপরীত, তাহাই মিথ্যা। যাবৎ সাধনা, সিদ্ধিরূপে প্রকাশ না হয়, তাবৎ কল্পনা থাকিবেই থাকিবে; এবং সত্য প্রকাশ হইলে, উহা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, প্রতিয়মান হইবে না। কারণ সত্য এক, যাহা তাহাই।

ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি, সীমা বিশিষ্ট। এ কারণ বিচারাদি দ্বারাও সত্য উপলব্ধি হয় না। সত্য প্রকাশ হইলে, সেই সত্যকে, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সহিত কি প্রকারে মিলাইলে, ঐ সত্য অঙ্গহীন না হয়, তাহাই বিচার করিয়া বুঝিবার বিষয়। এ কারণ সিদ্ধের বচনই সত্য বলিয়া উল্লেখ আছে। সিদ্ধই সত্যকে, যথা সাধ্য পূর্ণাঙ্গী রাখিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এ কারণ বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধগণের বাক্য অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগের ভাব গ্রহণের সহিত যে উপাসনা পদ্ধতী, উহাকেও সত্য বলিয়া বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, এই সত্য, সাধকের পক্ষে সত্যধারণা নহে। উহা সিদ্ধের পক্ষে সত্য হইলেও, সাধকের পক্ষে, যে কল্পিত, সেই কল্পিত উপাসনাই ধরিতে হইবে। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক, সিদ্ধের ভাব লাভ না করেন, ততক্ষণ সিদ্ধের ভাব সম্বন্ধে যে ধারণা, উহা তাহারই অন্ধ ধারণা মাত্র। এ কারণ, ভক্তি, প্রিতী, শ্রদ্ধা বিহীন, যে উপাসনার ক্রিয়া, উহা, উপাসনা নামেরই অযোগ্য। পক্ষান্তরে ভক্তিপ্রীতিযুক্ত ভগবৎ বিরহ, পরমাত্মার দর্শন লাভের উপায় হয়।

পরমাত্মাই সর্ব্বপ্রকার ফলদাতা। এবং তাঁহার পক্ষে, কোনপ্রকার সিদ্ধি দান করা অসম্ভব নহে। তথাপি তিনিই, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্যক রাখিয়াছেন। সুক্ষের নিমিত্যক, সকল সময়, সর্ব্ব সমক্ষে, প্রকাশ নাই। কিন্তু স্থূলের নিমিত্তক, কতকাংশ

প্রত্যক্ষ। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া সূক্ষ্মাদির বিচার। নচেৎ বিচার অসম্ভব। যাহাতে বিচারককে পক্ষপাত করিতে না হয়, তাহাকে সত্য বিচার বলা যাইতে পারে। এই সদ্‌বিচারে, যাহা সিদ্ধান্ত হয়, উহাই মনুষ্যের করণীয়।

বিচার করিলে, উপাসনার দুইটী নির্দ্দোষ পিঠ, রহিয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে। প্রথম পরমেশ্বর, আমাদের আপনার ব্যক্তি, তাঁহার কৃপায় সর্ব্বমঙ্গল লাভ, এই বিশ্বাসে তাঁহার দর্শন আশা। আপনার ব্যক্তি, এই ভাবটী না রাখিলে, প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সহিত কোন প্রকার মিল থাকে না। কারণ, আপন গন্ধ ও ব্যক্তিহীন ভাব হইতে, মঙ্গললাভ বা কৃপা প্রার্থনার ইচ্ছা, প্রস্ফুটিত হয় না। দ্বিতীয়, যাহা আছে, তাহাকে, এক ব্যক্তিত্ব ভাবের অন্তর্গত করার নাম পরমেশ্বর। কারণ, যাহা নাই, তাহা, পরমাত্মা বলিলে, ইহাও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয়; এবং এই প্রত্যক্ষ বিষয়ের সহিত, বিষয়ীর একত্ব ভাব আছে, ইহা মৃত্যু প্রত্যক্ষ ঘটাইতেছে। অতএব এই দুই ভাবে উপাসনাই বিচারে অনুমোদিত হওয়া, অযথা নহে; এবং বিশেষ বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, এ দুই ভাবের মধ্যে একই ব্যক্তিত্ব ও আত্মীয় ভাব রহিয়াছে। একারণ, এই প্রকার, ভাবের উপাসনাকে অকল্পিত উপাসনার অঙ্গস্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই দুই ভাবকে রক্ষা করিয়া, যে সকল উপাসনা, অথবা যে উপাসনা, এই দুই ভাবের যত নিকট সম্বন্ধ রাখে, তাহার মধ্যে তত পরিমাণ, অকল্পিত ভাব আছে বলিয়া, জানা আবশ্যক; এবং যাহা, ইহাদের হইতে যতদূরে স্থিত, তাহাতে তত পরিমাণ কল্পনার আবরণ বুঝা প্রয়োজন; এবং যিনি আছেন, তিনি অপ্রকাশ হইলে, আছেন বলিবারও স্থল ছিল না। এজন্য তাঁহাকে প্রকাশ-

মাত্র বলিয়াই, ধারণা করা বা চিন্তা রাখা, আবশ্যক। নচেৎ, কোন ব্যক্তিত্বের ধারণা সম্ভব নহে। অতএব একমাত্র প্রকাশ ভাবে, পরমেশ্বরের উপাসনাই অকল্পিত উপাসনা। এ কারণ সর্ব্ব হিন্দুশাস্ত্রে এবং অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তকে পরমাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ বা আলোক মাত্র, এই ভাবে ধ্যান ধারণার বিধি। যেহেতু, আলোক ভাব ব্যতীত কোন ধারণাই হয় না। কারণ, ধারণা শক্তি, আলোক পদার্থ। যিনি ধারণা করিবেন, তিনি নিজে আলোক, এই অবস্থায় ধারণাকারীর পক্ষে আলোক ব্যতীত অপর কি ভাব ধারণা বা প্রত্যক্ষ হইতে পারে? যতদূর পর্য্যন্ত কোন ধারণা হয়, ততদূর আলোকই প্রকাশ থাকে। যথায় কোন ধারণার বোধ নাই, তথায় আলোকাভাবেরও বোধ থাকে না। অতএব উপাসনার জন্য, একমাত্র আলোকময় ব্যক্তির ধারণাই অকল্পিত উপাসনার উপায়স্বরূপ। কিন্তু ইহা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা আলোক পদার্থকে চক্ষে, বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করি বলিয়া, যাহা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায়, উহাকে আলোক বলিয়া না বুঝিয়া, অন্য পদার্থ বোধ করিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আলোক পদার্থই, ভিন্ন ভিন্ন রূপগুণে প্রকাশ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বলিয়া অনুভবে আইসে। এ ভাবটী, অন্তরে না রাখিয়া, আলোক পদার্থকে ধারণা করিতে গেলে, কেবলমাত্র বর্ণ বা রূপই ধারণা হয়। এবং এই রূপ ভাব, আলোকের একটী মাত্র গুণ বলিয়া, আলোকের অপরাপর গুণ হইতে ভিন্ন, সঙ্কীর্ণ ভাবমাত্রে দাঁড়ায়। যাহাতে এই ভিন্ন ও সঙ্কীর্ণ ভাব অন্তর্গত হইয়া একমাত্র প্রকাশ ভাব উপলব্ধি হয়, তাহার জন্যই, শাস্ত্রে, বস্তুকে, সাকার নিরাকার প্রভৃতির অতীত,

অথচ তিনিই সর্ব্বরূপে প্রকাশ, এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়া পরমাত্মার পূর্ণত্ব রক্ষার চেষ্টা আছে। রূপগুণশক্তি প্রভৃতি ভাব, প্রকাশ পদার্থেরই, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। প্রকাশে ভিন্নতা না থাকিলে ক্রিয়া থাকে না এই ক্রিয়া বা ব্যবহার, রক্ষার জন্যই, প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝা আবশ্যক। এবং যে প্রকাশভাবের দ্বারা, যে কার্য্য বা ব্যবহার সুখসাধ্য, তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করাই, পরমাত্মার ইচ্ছা বা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এই ভাবে, পরমাত্মার, উপাসনার যে চেষ্টা, তাহা কল্পিতের মধ্যে, অকল্পিত নামেরই যোগ্য।

মূল কথা, যতক্ষণ, পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া, সাধককে নিঃসন্দেহ না করেন, ততক্ষণ সাধক, যে প্রকারেই পরমাত্মাকে ধারণা করুন, না কেন, উহা সাধকের কল্পিত ধারণামাত্র। যেরূপ, এক সত্যেরই, সত্য মিথ্যা দুই ভাব, সেই প্রকার, সাধন সম্বন্ধেও সাধকের, কল্পিত উপাসনার মধ্যে, কল্পিত ও অকল্পিত দুই প্রকার ভাব আছে। যে ধারণা বা উপাসনার ক্রম, সাধককে পরমানন্দের অধিকারী করে, উহা কল্পিত উপাসনার মধ্যে অকল্পিত, এবং যাহা সাধকের বন্ধনের কারণ হয়, উহা কল্পিত উপাসনার অন্তর্গত, কল্পিত উপাসনা। সাধক আপন চেষ্টায়, যাহা করিতে চাহে, উহা, তাহারই কল্পিত বলিয়াই, পরমাত্মার কৃপা ব্যতীত সত্য অপ্রকাশ থাকে। এবং কৃপা প্রাপ্তির জন্য, আপনাপন সর্ব্ব প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা, বিদ্যাবুদ্ধি, তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া, অবসন্ন হৃদয়ে, তাঁহারই শরণাগত হওয়া প্রয়োজন। এই অবসন্নতার নাম অহঙ্কার-বিসর্জ্জন। যাবৎ অহঙ্কার ক্লান্ত না হয়, তাবৎ কল্পনা অপ্রতিহত থাকে এবং সত্যের মূর্ত্তি, অন্ধকারে আব-

রিত হয়। সত্যের এই আবরণই কল্পনা। এবং স্বতঃপ্রকাশ সত্তা, যখন আপন ইচ্ছায় প্রকাশ হইয়া, পূর্ব্ব ভাব বিমার্জিত করেন, তাহাই অকল্পিত।' অতএব সিদ্ধির পর, যে সাধনা বা ব্রহ্মের ধারণা উহাই অকল্পিত সাধনা বা ধারণা। তদ্ভিন্ন সমস্তই কল্পিত উপাসনা বা ধারণা। ঐ কারণ, সাধনার জন্য, বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধগণের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

জগৎ সদসৎ লোকে পূর্ণ। অসৎলোক সুবিধা পাইলে আপন অভীষ্টসিদ্ধি-লালসায়, আপনাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রচার রাখিতে কুণ্ঠিত নহে। এমত অবস্থায়, সরলহৃদয়, ধর্ম্মপিপাসুর পক্ষে, প্রতারিত ও বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা অধিক। একারণ বিচার আবশ্যক। যাহা, প্রত্যক্ষকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাখিয়া বা ত্যাগ করিয়া বিচার না হয়, উহা মায়া বা জাগতিক কল্পনার মধ্যেই স্থান পায়। অপরদিকে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিবার পথ অন্বেষণ। কাহার উপর ভিত্তি করিয়া বিচার হইবে—এরূপ চিন্তায়, সাধকের পক্ষে, বিপন্ন হওয়াই স্বভাবিক। কিন্তু সামান্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, নিঃস্বার্থে, মিথ্যার প্রচার নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে সর্ব্ব লোকেরই সমান স্বার্থ বা কষ্ট, তাহা মিথ্যা হইলে, উহা লোকসমাজে প্রচারের প্রয়োজন হয় না। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ও আধুনিক আচার্য্যগণের উপদেশ বিচার করিয়া, সত্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন; এবং উহা বিচার করিবার জন্য জ্ঞান, বিচারশক্তি ও পক্ষপাতরহিত সরল অথচ দৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণের আবশ্যক। নিরহঙ্কার চিত্তে এইরূপ অন্তঃকরণে, সত্য, সহজেই প্রতিফলিত হয় বলিয়া, সত্যানুসন্ধায়ীর পক্ষে, ইহা প্রথম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এবং ইহা একটী সাধনার অঙ্গ। এইজন্য

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, পরমেশ্বরকে ব্যর্থ তর্কে আনিবে না, এবং শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া, সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবে। ইহার যথার্থ ভাব, যাহা তুমি জান না, তাহার সম্বন্ধে যে কল্পিত ধারণা রাখিয়াছে, তাহার দ্বারা কেমন করিয়া সত্যাসত্যের নিষ্পত্তি হইবে? যে প্রকারে বিচার দ্বারা, সত্যলব্ধ ব্যক্তিগণের বাক্য, বিচার করা প্রয়োজন, প্রথমে তাহা ভালরূপে বুঝিয়া, পরে তাঁহাদের কথার সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক এবং সত্য বুঝিবার জন্য তাঁহারা যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও প্রতি-পালন করা প্রয়োজন। এইরূপে সত্য বুঝিবার চেষ্টায়, সত্যপথে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। অথবা কেবল মাত্র পরমেশ্বরের নিকট, অবিচ্ছিন্নভাবে সত্য জানিবার প্রার্থনা রাখিয়া, তাঁহাতে ভক্তি-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আত্মসমর্পণে, সহজে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশে জীবের সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানান্ধকার নিবারিত হয়।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

সৃষ্টি সম্বন্ধে দেবতাদিগের কর্ত্তৃত্ব।

বেদাদি শাস্ত্রে, কোন কোন স্থানে পরমাত্মা সৃষ্টি করিলেন, আবার কোন কোন স্থানে আকাশ, কোন স্থানে বায়ু, কোন স্থানে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা বা ঈশ্বরগণ কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, উল্লেখ ও তাঁহাদের স্তবস্তুতি দৃষ্ট হয়। ইহার যথার্থ ভাব বুঝিতে না পারিয়া, কেহ বা বহু সৃষ্টি-কর্ত্তার অস্তিত্ব, বেদ অঙ্গীকার করে, এবং কেহ কেহ বা বেদ-

বাক্যকে খামখেয়ালী বাক্য বলিয়াও ধারণায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা যথেচ্ছাবাদ, কিংবা, বহু ঈশ্বরবাদও নহে।, ইহার যথার্থ ভাব, একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব্ব-রূপে প্রকাশমান। লোকচক্ষে যাহা ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা পদার্থাদি বলিয়া বোধ হয়, এবং ঐ সকল শক্তির ও পদার্থের মধ্যে, জীবে যে, একের মর্য্যাদা ও অপরের হীনতা বর্ণনা করে, তাহা সত্য নহে। তাঁহার সর্ব্ব শক্তিই তিনি, এবং সৃষ্টির জন্য সর্ব্ব শক্তিরই সমান প্রয়োজন। এই সমান প্রয়োজন ভাব প্রকাশ করায় অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মের যে শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বেদ যখন যে বর্ণনা বা স্তব করিয়াছেন, তাহার আদি অন্ত ও মধ্যে, যে পরমাত্মাই প্রকাশ এবং সে শক্তি না থাকিলে সৃষ্টিপ্রকাশ থাকিত না, এবং শক্তিদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব বোধ হইলেও, বস্তু, ব্যক্তি একই পরব্রহ্ম—এইভাব বুঝাইবার জন্য, কোন স্থানে অগ্নিব্রহ্ম, কোন স্থানে বায়ুব্রহ্ম কোন স্থানে আকাশ, কোন স্থানে মায়া, কোন স্থানে সূর্য্য, কোন স্থানে প্রকৃতি, কোন স্থানে পুরুষ, কোন স্থানে বা ইন্দ্র প্রভৃতি নানা নাম ও ভাবযুক্ত ব্যক্তির, সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রকাশ রহিয়াছে। একারণ, প্রমাদবশতঃ, ঐ সকল নাম, অপ্রকাশরূপ ব্রহ্মের নাম বলিয়া ধারণা রাখায়, নামের অনুরূপ প্রকাশের বা প্রত্যক্ষ ব্যক্তির অবমাননা করিয়া জগতে দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা যদি বিচার করিয়া দেখি, যে, যে সকল নাম ব্রহ্মের রহিয়াছে, তাহার অনুরূপ পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে কি ক্ষতি হয়? তাহা হইলে এ মীমাংসা হইতে পারে—প্রথমতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত, কোন বস্তু বা ব্যক্তি, অথবা কাহার শক্তি নাই ধরিলে, তাহার পর, নামের অনুরূপ পদার্থকে ব্রহ্ম স্বীকারে, অপর কাহাকেও

ব্রহ্ম বলিয়া অঙ্গীকার করা না হওয়ায়, কোন দোষই থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয়হীন ব্রহ্ম ব্যক্তি ব্যতীত, অপর কেহ না থাকায়, তাঁহার অতিরিক্ত অঙ্গীকার অসম্ভব বলিয়া দোষ নাই। ইহা সাধারণতঃ মনে করা অযথা নহে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের বিচার করা প্রয়োজন যে, যেখানে অদ্বিতীয় পরমাত্মা মাত্র বর্ত্তমান, সেখানে আমরা কে হইয়া তাঁহার বিচার, ও ভাব লাভের চেষ্টা, বা বাসনা প্রভৃতি করিতেছি; এবং আমাদের অনুরূপ মনুষ্য বা জীবদিগকে, কেন ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা না করি। কেনই বা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যে আমি, নিরানন্দের জ্বালায়, অস্থির হইয়া পড়িয়াছি? ব্রহ্ম বলিয়া শব্দ রক্ষার প্রয়োজন কি? কেনই বা উপাসনার প্রয়োজন? পদার্থ ও সৃষ্টি বলিলে, কি বুঝি? দেবদেবী প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কোন্ ভাব, আমাদের অন্তরে প্রকাশ হয়? ঐ সকল ভাবাদি দ্বারা, আমাদের কোন্ কার্য্যের সহায়তা করে,—প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বহু বিষয়ের মীমাংসা হইলে পর, তবেই সহজে বুঝা যাইবে যে, কেন বেদ জীবের প্রত্যক্ষের বহির্ভাগে ব্রহ্মভাবটী রাখিয়াও ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবী, ঈশ্বরাদির কল্পনা করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ, যাহাতে সাধক, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ভাব, যাহাতে ব্যক্তিত্বের আস্বাদ বর্জ্জিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিতেছেন, সেই ব্যক্তিবর্জ্জিত ভাবে ব্রহ্ম কল্পনা করিলে, নির্ভাবনায় অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয়দাতা হইবার সম্ভাবনা এবং বাহ্য বিজ্ঞানের আধিপত্যের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, যাহাতে ব্যক্তিত্বের আস্বাদ লাভের চেষ্টা হয়, সেইজন্য বেদ, সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে, ব্রহ্ম বলিয়াও, ব্রহ্মকে সর্ব্বাতীত নিরঞ্জন নামে অভিহিত, এবং প্রত্যক্ষ পদার্থকে তাঁহার

শক্তি বা সৃষ্টি নামে অভিহিত করিয়াছেন। অথচ, যেখান হইতে যে কার্য্য হইতেছে, তাহা, পরমাত্মাই করিতেছেন বলিয়া, পদার্থ ও শক্তির ভিন্ন ভিন্ন, অস্তিত্ব, রূপ, গুণ, শক্তি, ভাব ও কর্তৃত্বের পরিহারও রহিয়াছে। এই ব্যক্তিভাব লাভ হইলে, জীবের দ্বৈত ভাবের পরমানন্দ, চরিতার্থ হয় এবং মাতা পিতা দয়া করিয়া অভেদে প্রকাশ হইলে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের তৃপ্তি ঘটে। তখন আর কাহাকেও পৃথক্ ব্যক্তি বা কেহ কাহার স্রষ্টা বা সৃষ্ট থাকে না; আত্মা, আপনাতেই আপনি, আনন্দে বিরাজ করেন। যত দিন পর্য্যন্ত, এ ভাবের উদয় না হয়, তত দিন জীব, আপনাকেও যেমন, অপর ব্যক্তি ও আপন ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ বোধ করেন, সেই প্রকার ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ, শক্তি ও ভাবকে চেতনাযুক্ত কল্পনার সহিত দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া পৃথক্ ব্যক্তি এবং অচেতন ভাবযুক্ত প্রকাশে, পরমাত্মার সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্বই, অনুভব করিবেন।

ব্রহ্ম আছেন বা নাই, ইহা বলিবার কিছুই নাই। এ কারণ জীবে যাহা প্রকাশ পায়, জীব তাহাই ব্রহ্মে আরোপ করে, এবং যাহা জীবে অপ্রকাশ, তাহার কোন সন্ধান পায় না। এই জন্য ব্রহ্মের ভাব বুঝিতে হইলে, ঐ সকল ভাব জীবে ফুটাইবার জন্য, যে চেষ্টা, তাহারই নাম সাধনা ইত্যাদি। তাপই এই সাধন ক্রিয়া এবং প্রকাশই ইহার পথ। ব্যক্তি ও বস্তুভাব ইহার গন্তব্য স্থান। যাহাতে জীব এই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহারই জন্য, এক এক ভাব ও শক্তিকে ব্যক্তি বা চেতনা রূপে আশ্রয় করিয়া, এবং ঐ ভাব ও শক্তির অচেতনত্ব নিষেধের জন্যই, ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী শব্দের ব্যবহার। নচেৎ ব্রহ্ম ব্যক্তি ও

বস্তু ব্যতীত, অপর ব্যক্তি বা বস্তু নাই, যিনি সৃষ্টি করিবেন বা সৃষ্ট হইবেন। পরমাত্মাই একমাত্র সর্ব্ব শক্তি, রূপ, গুণে, প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন। জীবও তাঁহারই প্রকাশ। জীবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অভিমান আছে বলিয়াই, বিরাটেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আস্বাদ অনুভূত হয় এবং জীব, অনেক স্থলে, আপনাতে কর্তৃত্ব আরোপ করেন বলিয়াই, ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কর্তৃত্ব বোধ করেন মাত্র এবং নিজেকে সৃষ্ট মনে করিয়া, তাঁহাদেরও প্রতি সৃষ্ট শব্দ ব্যবহারে বাধ্য হয়। নচেৎ জীবের সহিত যাহা কিছু আছে, সমস্তই অসৃষ্ট পরমাত্মাই আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন। যাহাতে, সাধক সর্ব্বস্থানে ব্যক্তি ও চেতনা ভাবের ধ্যান রাখিয়া, একই ব্রহ্ম ব্যক্তি বা চৈতন্যময় পরমাত্মারূপে সমাধি লাভ করিতে পারেন, তাহারই জন্য ভিন্ন ভিন্ন অহঙ্কার-রূপ দেবদেবীর কল্পনা। কারণ জীব অহঙ্কারভাববর্জ্জিত চেতনা বা ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ধারণায় অক্ষম। অতএব যাহাতে সর্ব্বরূপে, সর্ব্বভাবে, পরমাত্মার উপস্থিতি ধারণা করিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিরোধভাব অস্তমিত হয়, তাহার চেষ্টা, ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

জগতের হিত।

আমরা জগতের হিত বলিলে, জীবেরই সুখশান্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, জীবের সর্ব্বপ্রকার কষ্টের নিবারণ ও সর্ব্বপ্রকার সুখের মিলনকেই, জগতের হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই ভাবে জগৎ বলিলে, জীবকুলকেই বুঝায়। ইহার কারণ—

জীব ও জগৎ, সর্ব্বভাবেই একরূপ; এবং যাহাকে জগৎ বলিয়া—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, রূপ, গুণ, শক্তি বলিয়া নাম দিতেছি, উহাই ক্ষুদ্র চেতনাবিশিষ্ট হইয়া জীবরূপ সুখদুঃখ ভোগাভোগ করিতেছেন এবং পুনরায় শরীরী অবস্থা ত্যাগ করিয়া, আপন বৃহতেই লয় হইয়া থাকেন। জীবের, ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, শক্তিতে প্রকাশ হইবার কারণ অবস্থা, জগতেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে ভাব কারণে প্রকাশ থাকে, ক্রিয়ারূপে উপস্থিত হইলে, ঐ ভাবই প্রত্যক্ষ হয়। অতএব জীবের মূল হিত চাহিতে হইলে, জগতেরই, হিত প্রার্থনার প্রয়োজন।

এখন বিচারের বিষয়,—কিসে জগতের হিত, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যায়, এবং উহা সম্পন্ন করা জীবের আয়ত্ত কি না?

হিত বলিলে কি বুঝিব? যদি সুখের নাম হিত হয়, তাহা হইলে, দেখা যায়, মনুষ্য ক্ষণস্থায়ী সুখের চেষ্টায়, দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখ উৎপন্ন করে। এখানে, যে সুখের চেষ্টা বা সুখলাভ, উহা কি জীবের হিতকার্য্য বলা যাইবে? ইহা, কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই অভিমত হইবে না। অতএব সুখের অপর একটী নামকরণ হিত শব্দ নহে। এই হিত বুঝিতে হইলে, যাহার হিতের প্রয়োজন, তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়, পূর্ব্বেই বিচার করা প্রয়োজন।

এই যে সুখ দুঃখ, আনন্দ বা হিতাহিত, ইহা জগতের অন্তর্গত কিংবা জগতের বহির্ভূত কিছু। ইহা অবশ্যই জগতের অন্তর্গত; কারণ, জগতের অতীত ভাবের নাম ব্রহ্ম বলিয়া কল্পিত আছে, তাঁহার সম্বন্ধে সুখদুঃখের সম্বন্ধরহিত ভাবই, বর্ণিত। এখন জগৎই যদি স্বয়ং সুখদুঃখময় হয়, অথবা সুখদুঃখ যদি জগতেরই রূপ, গুণ, শক্তি হয়, তাহা হইলে, জগৎকে দুঃখবর্জ্জিত করা অসম্ভব; এবং এ

প্রয়াস, কষ্টকে, নিবারণ না করিয়া, বৃদ্ধি করাই স্বাভাবিক। আর যদি বলা যায় যে, পরমাত্মাই সর্ব্বদুঃখবর্জ্জিত আনন্দময়, তাঁহার প্রাপ্তিলাভই একমাত্র জগতের হিত। তাহা হইলে, এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক যে, জগৎ, তাহার সুখ দুঃখ, গুণ বা শক্তি কোথায় রাখিয়া দিবে? অথবা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে যদি সুখ-দুঃখ জগতের সঙ্গেই বাস করে, তাহা হইলে জগতের হিতলাভ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে?

বাস্তবিক পক্ষে জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু হয়, তাহা হইলে, জগতের হিত প্রাপ্তি, কোন কালেই ঘটিবে না। জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে বলিয়াই, জগতের হিত হইবার আশা। একই বস্তুর ব্রহ্ম ও জগৎ দুইটী ভাব মাত্র। সেই জন্যই জগতের হিত সাধনার প্রবৃত্তি। নচেৎ জগৎ ভিন্ন হইলে, তাহার পক্ষে আপন রূপ, গুণ, শক্তি, ত্যাগ করিয়া অপরের গুণ লাভে অভিলাষ পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। এক অপরিবর্ত্তনীয়, সর্ব্ব জ্ঞান, শান্তি, আনন্দ চৈতন্য ভাবই ব্রহ্মভাব এবং এই সকল ভাবের ক্ষুদ্রত্ব বা বিপরীতত্ব ভাবই জগৎ। ব্রহ্মত্ব, জগদ্ভাবের অন্য নামকরণ মাত্র। এইজন্য জগৎ আপনার সম্বন্ধে হিত ও অহিত দুইটী ভাব কল্পনা করিয়া, আপন পূর্ণ ভাবের প্রতি লক্ষ্য আনিয়া, নিত্য অবস্থা লাভের অভিলাষী। এই অভিলাষই সাধনা বা মঙ্গলক্রিয়া বা হিতানুষ্ঠান।

জগৎই, জীবরূপে প্রকাশ; এবং জীব ভাব আছে বলিয়াই, একই বস্তুর জগৎ ও ব্রহ্ম দুইটী ভাব ও নাম রাখিবার প্রয়োজন। কারণ জীব আপনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে, ভেদ রাখিয়া থাকে; এবং এই ভেদ বশতঃই, আপনার এক অবস্থাকে, স্বয়ং

ভাবে, গ্রহণ করিয়া অপর অবস্থাকে, পর, বলিয়া ধারণায় রাখায়, দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। যাহাতে জীবে স্বরূপ ভাব প্রকাশ হইয়া, পরভাব মুছিয়া যায়, তাহাই জীব বা জগতের হিত বুঝা প্রয়োজন; এবং এই পর ভাব, যত পরিমাণ নিবারিত হইবে, তত পরিমাণই একটী জীব, অপর সর্ব্বজীবের সহানুভূতি লাভ করিবে, ও সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবে। এ সহানুভূতি প্রত্যেক জীবের ব্যবহারে আসিলে, জগতের হিত, অনেকাংশে প্রকাশ যে পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ কারণ, যাহাতে মনুষ্যমাত্রেরই অন্তঃকরণে সর্ব্বজীবের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা উৎপন্ন হয়, তাহাই জগতের হিতকার্য্য।

প্রকাশেই সদ্ভাব ও অভাব। ব্যক্তি ভাবের প্রকাশই, চেতনার ভিত্তি। এই ভিত্তিই, ভোগ ও ভোক্তার বিভেদ রূপ। আনন্দ, সুখ ও দুঃখ এই তিন ভাবের প্রকাশই অহঙ্কার এবং এই ভাবাবস্থাই, জীবের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর। এই তিন শরীর বা অবস্থার সহিত, ব্যক্তি চেতনা পূর্ণ বস্তু, যৎ তৎ। যৎ তৎ ভাবে, আনন্দ, সুখ, দুঃখ কিছুই বলিবার নাই। ব্যক্তি ভাবই, যৎ তৎ এর ব্যক্ত বা প্রকাশ অবস্থা। এবং এই অবস্থাতেই সর্ব্ব প্রকার ভোগাভোগ। ব্যক্তি চেতনার, একমাত্র ভাবের প্রকাশে, হিতাহিত নাই। কারণ তাহাতে ভোগ বা ভোক্তার বিভেদ প্রকাশ, অস্তমিত। স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই দুই ভাবে প্রকাশ হইলেই, সুখ দুঃখ উৎপন্ন ও ভোগ হয়। যাহাতে জীবের, স্থূল সূক্ষ্ম ভাবের, প্রকাশ থাকার অবস্থায়, কষ্টের বিরাম ও সুখের প্রকাশ থাকে, তাহাই জগতের হিত।

জীব বস্তু আনন্দ। আনন্দের জন্যই, তাহার প্রকাশ বা সৃষ্টি;

নচেৎ প্রকাশ হইবার, অন্য কোন উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে না। এ কারণ, জীব যতকাল, তাহার সর্ব্বভাবের প্রকাশেই, নিত্যানন্দ ভাবে প্রকাশ থাকিতে না পারেন, ততকাল, তাঁহার জন্মমরণরূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সুখ ও দুঃখ ভোগ হয়। এই জন্ম মরণ, সুখ দুঃখ ভাবই আত্মার জগৎরূপ। যাহাতে এই অবস্থাতেও জীব পরমানন্দে থাকিতে পারে, তাহার চেষ্টাই জগতে রহিতচেষ্টা। এই চেষ্টার সফলতাই, জগৎ বা জীবের হিত।

পর বা শত্রুভাবের পরিহার ও আত্মীয়তার বিস্তার, ব্যতীত, অশান্তি নিবারণের আশা নাই। একের সুখ দুঃখ, অন্যের সুখ দুঃখের সহিত, নিঃসম্পর্ক থাকিলে, আত্মভাব দূরে পড়িয়া যায়। আপন দুঃখ মোচনের চেষ্টা স্বাভাবিক। অতএব যাহাতে পরস্পরের বেদনা, পরস্পরের অন্তরে স্থান পায়, তাহার সাধনাই যথার্থ হিতসাধন। এই সাধনার জন্যই, অদ্বিতীয়, সর্ব্বরূপে প্রকাশমান, একমাত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহা ব্যতীত অপর কেহই নাই, এই ভাব অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ এই ভাবেই সর্ব্বপ্রকার ভিন্নতার নিবৃত্তি। ভিক্ষুকের নীচতার কষ্ট ও মলিনতা, এখানে নাই। পক্ষান্তরে মহারাজও নিরহঙ্কারে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে সমর্থ। অভাবীর অভাবের আতঙ্ক এবং দাতার দানের গর্ব্ব, উভয়ই প্রশমিত থাকে। জীবে এই ভাবের অবস্থাই, জগতের হিতাবস্থা।

অজ্ঞানীর অন্তরে মৃত্যুই সর্ব্ব অভাবের মূলস্বরূপ। এইজন্য মৃত্যুই, জীবের অশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছে। ইহার মূলে, দুইটী বিষয় রহিয়াছে। একটী অসহ্য যাতনা, দ্বিতীয় ভোগ অপহৃত হইবার আশঙ্কা। এই দুই ভাব জীবিত অবস্থায়, অন্য

বিস্তর প্রকাশ থাকায়, জীব নিরন্তরই মৃত্যুর দংষ্ট্রাঘাতে ব্যথিত হইতেছেন। যতদিন এই ভয়, জীবের অন্তঃকরণ হইতে অপসারিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দয়াবান্ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও, সর্ব্বপ্রকারে, সদানন্দরূপে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অপ্রতিহত থাকিবে না। কারণ দয়াশক্তি অপরের দুঃখ আপনাতে আকর্ষণ করে। যাবৎ সার্ব্বজনিক হিত অনুষ্ঠিত না হয়, তাবৎ নিত্যানন্দ বা ব্রহ্মানন্দকেও নিরানন্দ ভোগ করিতে হইবে। বিরাট্ একটী ব্যক্তি। অথচ একেরই বহুব্যক্তিত্ব। এ উভয় ভাবই বিরাটে নিত্য অবস্থিতি করিতেছে। এমত অবস্থায়, কাহাকে পর রাখিয়া, একদেশী ব্যষ্টিপ্রকাশে নিত্যানন্দ বর্ত্তমান থাকিবে। অতএব যে রক্তে জ্ঞানের প্রকাশ আছে, তাহার পক্ষে, কেবলমাত্র আত্মসুখচেষ্টা থাকা অসম্ভব এবং পক্ষান্তরে সার্ব্বজনিক হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই স্বাভাবিক। যাহারা সত্য সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছেন, মৃত্যু প্রভৃতি ভয় সম্বন্ধে তাঁহাদের জন্য চিন্তা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের মধ্যে ইহা অপ্রকাশ, তাঁহাদের জন্যই বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশের প্রয়োজন রহিয়াছে। সাধনার দ্বারা সত্য উপলব্ধি না হইলেও, যাহাতে অপর জীবাত্মার সাধনার ফলস্বরূপ সত্যজ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞানীরও অল্প বিস্তর শান্তি লাভ হয়, এ চেষ্টা রাখা জ্ঞানী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এ কারণ, যাহাতে মনুষ্যমাত্রেই, বোধোদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, জীবাত্মার অমরত্ব ভাব, এবং পরম পিতা-মাতার স্নেহদয়ার অসীমত্ব অমায়িকত্ব ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এবং মৃত্যুকালে স্বয়ং পরমেশ্বরই, জীবকে কোলে বসাইয়া, তাহার কষ্টের চিকিৎসক ও মহৌষধ-

রূপে উপস্থিত থাকেন, এ ভাব অন্ততঃ, অন্ধ বিশ্বাসের অন্তর্গত রাখিয়া, ইহার সত্যতা বুঝিবার প্রয়াসী হয়, এ শিক্ষা রক্ষা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। নচেৎ জগতের শান্তি জন্য, লক্ষ চেষ্টাও ব্যর্থ। কারণ মনুষ্য কোন কালেই সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। অপর পক্ষে বাস্তবিকই জগৎ-মাতাপিতা প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবের সেবায় রত রহিয়াছেন ও সর্ব্বপ্রকারে যাতনার অবসানে যত্নবান্। জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিদিগের অন্তরে, এ জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও পরমাত্মা তাঁহাদেরও সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে, জগৎ-মাতাপিতাই একমাত্র সেবক নামের উপযুক্ত। যতক্ষণ জীব অহঙ্কারে অভিভূত থাকে, ততক্ষণ তাঁহার শুশ্রূষা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই সুষুপ্ত, বিকার বা মুমূর্ষু অবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত, কষ্টের বিরাম লাভে, জীব অকৃতকার্য্য থাকে। এইজন্যই, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য, অহঙ্কার পরিহারের অবশ্যক বলিয়া উল্লেখ আছে। অহঙ্কার, আপনাকেই দেখে বলিয়া, অহঙ্কার থাকিতে, পরমাত্মার, নিরুদ্দেশ্য অবস্থা। অতএব যাহাতে জীবমাত্রেই, পরমাত্মার উপর নির্ভর করিতে পারেন, সেই শিক্ষাই জগতের হিতশিক্ষা বা হিত। ইহার বিপরীত ভাবই অহিত বলিয়া বুঝা প্রয়োজন।

যাঁহারা মৃত্যুকে ভয় করেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে, জগতে দুই ভাবে, কষ্টের বিস্তার হয়। প্রথমতঃ একটী জীব নানাপ্রকার ভয় পাইতেছে ; দ্বিতীয়তঃ, তাহার বিচ্ছেদে নিকটবর্ত্তী লোকের ভবিষ্যৎ কষ্টের আশঙ্কা। কিন্তু পরমাত্মার প্রতি সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভর রাখিতে পারিলে, এ উভয় প্রকার ভাবনা থাকিবার স্থল থাকে না। যাঁহারা মৃত্যুকে ভয়ের কারণ না দেখেন, তাঁহাদের

মৃত্যুতে, অপর জীবিত ব্যক্তির কষ্টের আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু যাঁহাদের আশঙ্কা হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারাও যদি ভগবন্নিষ্ঠ হন, তাহা হইলে দুঃখ কষ্ট, কোথায় থাকিবে? জীব যতক্ষণ, ইন্দ্রিয়রূপ ব্রহ্মশক্তিকে পরাধীন ভাবিয়া আপনাতে কর্তৃত্ব অহঙ্কার রাখে, ততক্ষণ ব্রহ্মশক্তির দয়া বুঝিতে পারে না। যখনই জীব নিরাশ হইয়া অবসন্নতার সহিত, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া মহাশক্তির অধীন বলিয়াই প্রত্যক্ষ করেন, তখনই তাঁহার যাতনা অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি উপস্থিত হয়। এজন্যই উপাসনার আরম্ভ হইতে কৃপাভিক্ষার শিক্ষা। এই শিক্ষা ফলবতী হওয়াই সিদ্ধিলাভ।

মূল কথা, জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তিন অবস্থাতেই ব্যক্তি-ভাবেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। কারণ, ব্যক্তি না থাকিলে, কাহার অবস্থা থাকিবে? এই ব্যক্তিভাব উপদ্রবরহিত হইলেই, জীবের শান্তি এবং যাহাতে এই ব্যক্তিভাব, সর্ব্ব অবস্থাতেই আনন্দে অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাই, হিতানুষ্ঠান। এই ব্যক্তিভাবের মূল অগ্নিব্রহ্ম। কারণ, অগ্নিব্রহ্মই, বিরাট্ হইতে তাপরূপে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গ্রহণ করিয়া এক একটী নির্দ্দিষ্ট জীব, জন্তু, উদ্ভিদ রূপে প্রকাশ হইতেছেন। যেমন প্রসন্নচিত্ত মাতাপিতা হইতে, পবিত্র বুদ্ধিযুক্ত সন্তানের উৎপত্তির আশা করা যায়, সেই প্রকার, প্রসন্নভাবাপন্ন অগ্নিব্রহ্মের প্রকাশে, আনন্দময় শক্তি ও ব্যক্তিভাবের প্রকাশ আশা নিরর্থক নহে। একারণ অগ্নিব্রহ্মের প্রসন্নভাবের প্রকাশই জগতের হিত। অতএব জগতের হিতের জন্য, অগ্নিব্রহ্মকে, পবিত্র পদার্থের দ্বারা প্রকাশ রাখা কর্ত্তব্য। এইভাবে অগ্নিব্রহ্মের প্রকাশ রক্ষা হইলে, সর্ব্ব ব্যক্তির মূল

অবস্থার প্রসন্নতার চেষ্টা বা হিতানুষ্ঠান করা হইবে। তাহার পর, ব্যক্তির স্থূল, ও সূক্ষ্ম শরীর ও ভাবের আনন্দ ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য, স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের যথার্থ অভাব মোচন হইলেই, জগতের বা জীবের হিত সাধন হয়। বাস্তবিক পক্ষে একই ব্যক্তি অগ্নিব্রহ্মই, কি জগৎ, কি জীব, উভয় রূপে প্রকাশ আছেন বলিয়াই, জীব ও জগৎ, একই ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও স্থূল সূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশ, ইহা বুঝাইবার জন্যই জীবের হিত শব্দের পরিবর্ত্তে, জগতের হিত শব্দ, ব্যবহৃত হয়। জীবভাবে অগ্নিব্রহ্মই প্রকাশ থাকিয়া ভোগাভোগ করেন, এবং জগদ্ভাবে ভোক্তা ও ভোগ, উভয়েরই কারণভাব নির্ব্বিকার আনন্দরূপে নিত্য প্রকাশ আছেন। অগ্নিব্রহ্মকে ব্যষ্টি মাত্র পদার্থজ্ঞানে, ইহার অমর্য্যাদা করাই জগত বা জীবের অহিত। অগ্নিব্রহ্মের মধ্যে, যেমন তাপ ও প্রকাশ এই দুইটী ভাব আছে, সেই প্রকার মনুষ্য মাত্রেরই মধ্যে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, এই উভয় ভাবই সংস্থিত। ইহার কোন এক অবস্থার প্রাধান্য বা মাহাত্ম্য, বা অপর অবস্থার হীনতা নাই। এবং এই দুই অবস্থাই একই ব্যক্তির প্রয়োজনীয়। যেমন তাপ ও প্রকাশের সাম্যাবস্থায়, অগ্নিব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ গার্হস্থ ও সন্ন্যাস দুই অবস্থাকে, একমাত্র মনুষ্যের অবস্থার অন্তর্গত করিলেই জগতের মঙ্গল। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থ ও সন্ন্যাস নামের ভেদ, ভেক, ও অহঙ্কার নাশের, সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিকপক্ষে এই দুই অবস্থা, যেখানে এক হইয়া প্রকাশ না পায়, সেখানে মনুষ্যের অবস্থা সকল, দুঃখেরই কারণ হয়। বিচার করিলে দেখিবেন, সন্ন্যাসী-নাম-ধারিগণ যেমন একজাতীয় মান, সুখ ও সিদ্ধির আশায় কষ্ট সহ্য করিতেছেন, গৃহস্থও অহঙ্কার-

চরিতার্থতার জন্য ও সুখলোভে নানাপ্রকার দুঃখসহনে তৎপর। বাস্তবিক পক্ষে, কেহই শান্তি পাইতেছেন না। কষ্টেরই প্রকার-ভেদমাত্র জগতের ঐশ্বর্য্যরূপে বর্ত্তমান। সন্ন্যাসী যেমন ক্ষণস্থায়ী আনন্দ বা অন্তঃকরণের একটী ভাব অবলম্বন করিয়া, অপর স্থানে অন্ধ হইয়া থাকেন, গৃহস্থগণের মধ্যেও তাহাই। এক কথায় বুঝিতে হইলে, ইহাই বুঝা প্রয়োজন, মনুষ্য মনুষ্যই। মনুষ্য বা দেহী মাত্রেরই সমান ব্যবস্থাই রহিয়াছে। এমন কোন ভাবই একটী মনুষ্যে নাই, যাহার কোন চিহ্ন, অপর ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় না অভাব। একই গৃহস্থগণের মধ্যে যেমন, রুচিভেদে, ব্যবহারভেদ মাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য একই সুখ, শান্তি বা আনন্দ লাভ, সেই প্রকার কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ, সকলেরই মধ্যে, একই উদ্দেশ্য, সিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ও, ক্রিয়ার প্রকাশ।

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, সন্ন্যাস ও গৃহস্থের উদ্দেশ্য ভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে, ইহা যথার্থ নহে। কারণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, সন্ন্যাসী আপন মনুষ্য ভাবের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলে, তাহাকে সন্ন্যাসাদি ভাবান্তর ঘটাইবার প্রয়োজন হইত না। গৃহস্থের পক্ষেও তাহাই। প্রচলিত আচার, ব্যবহার ও ভেকাদি ত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণের অবস্থার নাম, গার্হস্থ ও সন্ন্যাস হইলে, উহা মনুষ্য মাত্রেরই, অবস্থাভেদ বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এই অবস্থাভেদ বশতঃ, মনুষ্যের পক্ষে, ব্যক্তিত্বের ভেদ ঘটাইয়া, অহঙ্কার রাখিবার সম্ভাবনা নাই। ব্যর্থ অহঙ্কার, অজ্ঞানেরই পরিচয় মাত্র। মূল উদ্দেশ্য, জীবমাত্রেই সুখ-শান্তি চাহে। এই সুখ-শান্তির লোভেই সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহিতে প্রস্তুত। নচেৎ কষ্টের

জন্য কেহই কষ্টকে আকাঙ্ক্ষা করেন না। অজ্ঞানতা, সর্ব্বপ্রকার কষ্টের জন্মদাতা। অজ্ঞানই, দ্বেষ, হিংসা, পক্ষপাত ও ব্যর্থ অভাব উৎপন্ন করিয়া লব্ধ সুখশান্তিকেও, বিসর্জ্জন করে। অজ্ঞানই ভেদের ভিত্তিকে দৃঢ় রাখিয়া, পর বোধে, আপনারই আত্মার সহায়তা বা সুখ বৃদ্ধির চেষ্টায়, নিবৃত্ত থাকে। এ কারণ অজ্ঞানতা নিবারণ না হইলে, জগতের হিত কোথায়? ভেদই অজ্ঞানতার জীবন। জ্ঞানের জন্য ভেদাভেদের পরপারে, অবস্থান করাই প্রয়োজন। ভেদ ও অভেদ উভয় ভাবই, বন্ধনের কারণ। যেহেতু. ভেদে অভেদত্ব ও অভেদে ভেদত্ব বর্ত্তমান। এই বন্ধনই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অবস্থা। অতএব অবস্থান্তরে ভেদ ও অভেদের ভাব বুঝিয়া, যখন যে ভাবে ব্যবহার রাখিলে বা যে ভাব অন্তরে ধারণা করিলে, জীব সর্ব্বাবস্থায় আনন্দে থাকিতে পারে, তাহা করাই জগতের হিত। জ্ঞানলাভের চেষ্টা পাইবার অবস্থার নাম সন্ন্যাস বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, জীবের পালন ইচ্ছাই, গার্হস্থ্য নামের উপযুক্ত। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে, এই দুই ভাব থাকা আবশ্যক। যাবৎ মনুষ্যের পক্ষে, এই দুই ভাবই সহজসাধ্য না হয়, তাবৎ জগতের হিত অপ্রকাশ থাকিবে। এই উভয় ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে, অপ্রতিহত ভাবে প্রকাশ থাকাই জগতের যথার্থ হিত।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

আত্মজ্ঞান ও তাঁহার প্রয়োজন।

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভাব লোক-প্রমুখাৎ ও শাস্ত্রে প্রকাশ আছে। কাহারও ধারণা, আত্মা যে বস্তু, সেই বস্তুকে জ্ঞাত হওয়াই আত্মজ্ঞান। আর কাহার ও ভাব, আপনাকে জ্ঞাত হওয়াই আত্মজ্ঞান। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অগ্নিকে জ্ঞাত হওয়াই যথার্থ আত্মজ্ঞান। কারণ অগ্নিব্রহ্মই সর্ব্ব রূপ, ভাব, গুণ, ক্রিয়াও শক্তিতে প্রকাশমান আছেন এবং ইনিই জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। এই তিন ভাব, একমাত্র অগ্নিব্রহ্মের এবং অগ্নিব্রহ্ম স্বয়ং সর্ব্বাতীত বস্তু ও ব্যক্তি, ইহা অবগত হইতে পারিলে, তবেই বস্তুর সহিত তাঁহার সর্ব্ব ভাব, অবস্থা, রূপ, গুণ, শক্তি অবগত হওয়া যায়। নচেৎ আত্মজ্ঞান একদেশী ব্যষ্টিজ্ঞান মাত্র হইয়া পড়ে।

চেতনায়, অগ্নিব্রহ্মের অবস্থা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। বিরাটে অগ্নিব্রহ্মের রূপ, ক্রিয়াময়, ভাবময়, প্রকাশময় ও চিন্ময় ব্যক্তিত্ব। এই কয়েক ভাবে অগ্নিব্রহ্মকে চিনিলে, তবেই অগ্নিব্রহ্মকে চেনা হয়, বা আত্মজ্ঞান জন্মে। ইহার কোন এক ভাব পরিত্যক্ত হইলে, উহা পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান নামের অনুপযুক্ত। কেহ কেহ, বহু প্রকার জ্ঞানের মধ্যে একজাতীয় জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন, উহা বাস্তবিক আত্মজ্ঞান নহে। উহাকে আত্মজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে মাত্র। আত্মজ্ঞানের মধ্যে, কোন জাতীয় জ্ঞানেরই সম্পূর্ণ অভাব নাই। তবে জগতের ও শরীরীর প্রয়োজনানুসারে সর্ব্ব জাতীয় জ্ঞান যথাসম্ভব প্রকাশ থাকিতে পারে, সর্ব্বজাতীয় জ্ঞান সর্ব্বদাই পূর্ণভাবে জীব-শরীরে বা অন্তরে, বিকাশ থাকিবার কোন হেতু

নাই। কিন্তু যে জ্ঞানে, আত্মার এক ভাব হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ, বা বহু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ হইলেও একই আত্মা অপরিবর্ত্তনীয় আছেন, এ ভাব প্রকাশ না থাকে, উহা আত্মজ্ঞান নহে। আত্মজ্ঞান অপরিবর্ত্তনীয়, অথচ একই বস্তুর সর্ব্বভাব, ইহা প্রকাশ আছে। এইজন্য আত্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান অপ্রকাশ থাকে না। এবং আত্মজ্ঞানও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে, কিছু মাত্র ভিন্ন জ্ঞান নহে। এই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তাহার পক্ষে পর না থাকিলেও, ব্রহ্মে যেমন আত্ম-পর-ভাব থাকা ও না থাকা উভয় ভাব আছে ও নাই, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিতেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ থাকে; এবং তিনি তাঁহার শরীরি ভাবের সুখ-দুঃখ শরীরি ব্যক্তিতে ও অশরীরি ভাবের মুক্তি, সর্ব্ব অশরীরি ব্যক্তির পক্ষে, সমান ভাবে আছে জানিয়া, যে ভাব আপনার মধ্যে প্রকাশ থাকায় অজ্ঞানের কষ্ট নিবৃত্ত আছে, যাহাতে ঐ ভাব প্রকাশ থাকিয়া সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন আত্মার প্রকাশে, আনন্দ বৃদ্ধি করে, তাহার চেষ্টা পান। কাল্পনিক সুখদুঃখ, যেমন অন্তঃকরণকে ব্যক্তিবিশেষে কোমল করে মাত্র, কিন্তু সুখ বা দুঃখের পূর্ণভাব দিতে বিরত, সেইরূপ বিচারাদি দ্বারা, যে আত্মজ্ঞানের ভাব বুঝা যায়, উহা দ্বারা আত্মজ্ঞানীর যথার্থ ব্যবহার ঘটে না। আত্মজ্ঞান, যেখানে প্রকাশ থাকে, সেইখানেই আত্মজ্ঞানের ব্যবহার ঘটে। এইজন্য লক্ষ বিচার করিয়াও যেখানে বিচার, কার্য্য করিতে অক্ষম, সেখানে আত্মজ্ঞানের বিন্দুমাত্র অনুভূতি, জীবকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সক্ষম। একারণ সাধনার দ্বারা ব্রহ্ম কৃপায়, আত্মজ্ঞান প্রকাশ হইলে, তবেই উহার যথার্থ ব্যবহার হয়, নচেৎ অসম্ভব। এ বিষয় সামান্য বিচারে বুঝিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। দেখা যায়, মুখে আমর

সকলকেই আত্মা বলি। কি আপনার বা আপন নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি, কি অপর ব্যক্তিকে। কিন্তু এই নিকট ও পর ভাবটী ভাল করিয়া বুঝিলেই, দেখিতে পাইব যে, একের সুখদুঃখ, আপনার সহিত অধিক সম্পর্কে রাখি, আর অপরের সুখদুঃখের বিষয় আপনসম্পর্কের ছায়ামাত্র অন্তরে অনুভূত হয়। এই ভাবেই আপনার ও পর ভাব সংরক্ষিত। এজন্য যাহা, আমরা এক জনপ্রিয় ব্যক্তির জন্য করিতে সমর্থ, তাহার সহস্রাংশের একাংশও অপর ব্যক্তির জন্য করিতে সমর্থ হই না। এই আপন ও পরভাব আমার ক্রিয়াত্মক অবস্থার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই ঘটে। এ কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়াময় অগ্নিভাবের সহিত জীব এক হইয়া সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপ আত্মজ্ঞানের কার্য্য বা সর্ব্ব জীবের হিতচেষ্টা নিরস্ত থাকে। আপনার সহিত সর্ব্ব-জীবেরই হিতইচ্ছা প্রকাশ হইয়া, জীব যাহাতে জগতের হিত সাধনের অধিকারী হন, এই জন্যই আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। নচেৎ অহঙ্কার বৃদ্ধি করিয়া আপন ও জগতের অমঙ্গল ঘটাইবার শক্তির নাম আত্মজ্ঞান নহে; এবং এ জাতীয় আত্মজ্ঞান, জগতে নিষ্প্রয়ো-জনীয় বা অমঙ্গলকর।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

ভোগ।

যেখানেই ইচ্ছার প্রকাশ, সেইখানেই ভোগাভোগ বর্ত্তমান। কিন্তু ভোগ করিবার বাসনা থাকিলেও, ভোগ করিবার শিক্ষা না থাকায়, ভোগ পূর্ণমাত্রায় লাভ হয় না বলিয়া ভোগের প্রবৃত্তি অনবরতই প্রকাশ হইতে থাকে। ভোগশিক্ষা থাকিলে. অন্ততঃ ভোগ করিবার পর, দীর্ঘকাল ভোগের বাসনা শান্ত থাকিতে পারে। যেমন ভুক্ত পদার্থের সারাংশ শরীরে অধিক পরিমাণ আসিলে, পুনঃপুনঃ ক্ষুধা পায় না। এবং সারাংশ শরীরে না আসিয়া, অজীর্ণতা বশতঃ নির্গত হইয়া যাইলে, আহার ইচ্ছা ও বারংবার আহার করিলেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, বা শরীর বলিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক শীর্ণই হইতে থাকে, সেই প্রকার অন্যান্য ভোগের বিষয়ও পূর্ণমাত্রায় ভোগ না হওয়ায়, অনবরত বাসনার দ্বারা দুঃখ ভোগ ও হতাশ হইয়া অন্তঃকরণ ক্ষীণ ও জ্ঞানের হ্রাস হইতে থাকে। যেমন আহার রীতিমত ভোগ হইলে বা পরিপাক হইলে, শরীর বলবান্ হয়, সেইপ্রকার অন্যান্য ভোগও যথাবিধি ভোগ করিতে পারিলে, স্বাস্থ্য ও মনোবুদ্ধির বলাধান হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আত্মার প্রসন্নতা ঘটে।

সামান্য মাত্র মনোযোগ দিলে এ বিষয় সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। আহার করিবার সম্বন্ধে, যিনি অতিরিক্ত শীঘ্র শীঘ্র আহার করেন তিনি ভুক্ত পদার্থের আস্বাদ যৎটুকু পান, তাহা অপেক্ষা, যিনি মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে আহার করেন, তাঁহার আস্বাদ লাভ যথেষ্ট অধিক, এবং এইভাবে আহার করিলে, শরীরের নিষ্প্রয়োজন অবস্থায়; বারংবার আহার

বা আস্বাদ লইবার জন্য সর্ব্বদা মনের চঞ্চলতা ঘটে না। ইহার প্রধান কারণ শরীর ও মন উভয়ই তৃপ্ত হয়। আহার বিষয়ে যেরূপ দেখা গেল, অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ও এইভাবে ভোগ করিলে আনন্দভোগ অনেকাংশে তৃপ্ত হইয়া শান্তি পাইবার পক্ষে অগ্রসর হওয়া যায়। কি চেতনা, কি অচেতনা, উভয় ভাবের মধ্যেই অল্পবিস্তর সকল ভাবই রহিয়াছে। চেতন জীবের মধ্যে ব্যক্তি-ভাব, অপর পদার্থে নির্দ্দিষ্ট নামকরণের প্রয়োজনীয়তা ভাব। চেতনায় মনোবুদ্ধি, অপর পদার্থে রূপ, গুণশক্তি। চেতনায় ইন্দ্রিয় ভাব, স্থূলে তাপময় আস্বাদ। যেমন জীবচেতনা পদার্থাদি ভোগে সমর্থ, সেইরূপ জীবব্যক্তি জীবচৈতনাকেও ভোগ করিবার অধিকারী। কাম ক্রোধাদি এবং দয়া, শীলতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গুণ, শক্তি দ্বারা জীবচেতনা, জীবচেতনাকে ভোগ করিতে ও ভোগ দিতে পারেন। স্থূলের অপেক্ষা সূক্ষ্মের প্রসার অধিক বলিয়া, অনেক ভোগ আছে, যাহা অচেতন পদার্থ হইতে পাওয়া যায় বলিয়া, অনুভবে আইসে না। ঐ সকল ভোগ জীব-শরীরের বাহির হইতে লাভ হইলে, উহা ব্রহ্মচেতনা হইতেই প্রকাশ হইল বলিয়া ধারণা হয়। এ জাতীয় ভোগ লাভ অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমাত্মা জীবরূপে ঐ সকল ভোগ দিবার জন্য নিরন্তর উপস্থিত। এই জীবভাব হইতে উহা লাভ করা জীবের পক্ষে সহজসাধ্য। ইহা পবিত্রতা-রক্ষার সহিত ভোগ হইলে, আনন্দ, ও অপবিত্র অন্তরে ভোগ, দুঃখের নিমিত্তক হয়। যেমন স্থূল ভোগের পদার্থ তাপময় আস্বাদ বলিয়া, ইন্দ্রিয় উহার ভোক্তা, সেইপ্রকার চেতনা বা ব্যক্তিত্ব ভাবময় বলিয়া মনবুদ্ধি ও ব্যক্তিচেতনার ভোগ্য। যেমন স্থূল শরীরে, সর্ব্বস্থানে

অগ্নি ও প্রাণশক্তি থাকিলেও জিহ্বা, উদর, ও ফুস্ফুসে ঐ সকল আস্বাদ, বিশেষরূপে প্রকাশ পায় ; জিহ্বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আস্বাদ গ্রহণ করে ও হৃদয় তৃপ্তি লাভ করে। সেইরূপ মন,বুদ্ধি ও ব্যক্তিচেতনা সর্ব্বশরীরে থাকা সত্ত্বেও জীবাত্মার প্রকাশে এই সকল ভাব গৃহীত হইলে, তবেই চেতনার পূর্ণ আনন্দভাবের ভোগ হয়। যেমন স্থূল বিষয় গ্রহণজন্য, স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ ব্যবহার প্রয়োজন, সেইরূপ ভাব ও আনন্দ প্রভৃতি ভোগের জন্য, ভাবময় মন, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রকাশ প্রত্যক্ষ থাকার প্রয়োজন হয়।

জীবভাবেই ভোগাভোগ করিবার কর্ত্তা। জ্ঞান ও ভাবের প্রকাশ ও ভোগ-ক্ষমতাই জড়-চেতনার ভেদরক্ষার সীমা। সর্ব্বপ্রকার ভোগাস্বাদ লাভ করিবার জন্য, পরমাত্মাই জীবরূপে প্রকাশমান। এই ভোগ তিনভাগে বিভক্ত। দুঃখ, সুখ ও আনন্দ। যাহা অনিচ্ছায় ঘটে, উহা দুঃখ, ইচ্ছার পূরণ হইলে সুখ, এবং যাহা ইচ্ছানিচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া, বা ইচ্ছানিচ্ছার সম্পর্করহিত হইয়া, আত্মাতে প্রকাশ পায়, তাহাই আনন্দ। এই তিন প্রকার ভোগেরই অধিকারী জীব এবং সর্ব্বজীবের ভোগের মধ্যেই, এই তিনপ্রকার ভোগ লাভ হইতে পারে। পারমার্থ জ্ঞানও, দুঃখের হেতু বলিয়া একজনের নিকট প্রকাশ থাকা সম্ভব, পক্ষান্তরে জাগতিক ক্ষণস্থায়ী ভোগের মধ্যেও পূর্ণানন্দ লাভ ঘটে। যিনি পরমাত্মাকে কাল বলিয়া দেখেন, তাহার পক্ষে পরমার্থ-চিন্তা ও ভোগ, দুঃখময় বলিয়াই অনুভূত হয়। আর যিনি দেখেন যে, যে পরমাত্মা তাঁহার স্নেহের জননী, দয়াময় পিতা, ও পরম বন্ধু, এবং সেই পরমাত্মাই একমাত্র ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন, এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া, সর্ব্ব ভিন্ন

ভিন্ন ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্যভাবে প্রকাশ। এরূপ দ্রষ্টার পক্ষে, স্থূলপদার্থাদির ভোগেও আনন্দ লাভই হইয়া থাকে। কারণ বাস্তবিক পক্ষে আনন্দময় পরমাত্মাই, সুখদুঃখরূপে অনুভূত হন। এরূপ অনুভবের কারণ, জীব মূলবস্তুর আস্বাদলাভে অনিচ্ছুক থাকিয়া, বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ লাভের প্রয়াসী। কিন্তু বস্তু না থাকিলে, কিছুই থাকিতে পারে না। এবং কেহ ইচ্ছা রাখুন, আর নাই রাখুন, নিত্য বস্তু চিরকালই থাকিবেন এবং বস্তু থাকিলেই তাহার আস্বাদ, কিছু না কিছু, জীবচেতনায় উপস্থিত হইবেই হইবে। এমত অবস্থায় ইঁহার আস্বাদ গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকিলে, কষ্টই অনিবার্য্য। অতএব জ্ঞানী লোকের কর্ত্তব্য যে, ভোগ-ত্যাগেচ্ছায় দুঃখ উৎপন্ন না করিয়া, উহার সহিত সম্বন্ধভাবেই বস্তু ও ব্যক্তি-ভাবের সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা রাখেন; অর্থাৎ যাহাতে ভোগ পূর্ণ মাত্রায় লাভ হয়, তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার ভোগের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তাহাদের নিত্য ভাবকেও ভোগ করিয়া ভোগ চরিতার্থ করেন, বা ভোগাতীত হন। এইরূপে, ভোগ করিলে, ভোগ দুঃখের কারণ না হইয়া, আনন্দেরই সহায় হইবারই সম্ভাবনা এবং এই জাতীয়, ভোগকে বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে না করিয়া, মুক্তিরই উপায় বলিয়া বুঝা আবশ্যক।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

আত্মানন্দ।

অপ্রতিহত সুখস্রোত, শান্তির অভিমুখে প্রবাহিত হইলে, উহার নাম আনন্দ বলা যায়। যাহা আছে বলিয়াই অস্তি শব্দের জীবন, তাঁহারই নাম, আত্মা। যে জীব এই আত্মাকে, সর্ব্ব রূপ, গুণ, ক্রিয়ার সহিত প্রীতিপূর্ব্বক আলিঙ্গনে সমর্থ, তিনিই আত্মানন্দ।

অনেকেরই বিশ্বাস যে, আত্মাবস্তু, সর্ব্বপ্রকার বস্তু ও রূপ গুণ শক্তি হইতে ভিন্ন এবং সেই আত্মাতেই যাহার আনন্দলাভ হয়, তাহার নাম আত্মানন্দ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আত্মানন্দের এরূপ ব্যবস্থা হইলে, আত্মানন্দ অবস্থা, অন্যান্য সুখাবস্থার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র হয়। এবং আত্মানন্দ পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু আত্মানন্দ পরিচ্ছিন্ন বা ক্ষণস্থায়ী নহে, ইহা নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন। অতএব, যাহা নিত্য অপরিচ্ছিন্ন, তাহা কখন এক-দেশী অর্থাৎ কাহাকেও ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব, যে কিছু রূপ, গুণ, শক্তি, ক্রিয়া, বস্তু বা অবস্থা আছে, সমস্তকে, কি ভিন্ন ভিন্ন রাখিয়া, কি অভিন্নভাবে, যে আনন্দ প্রকাশ পায়, তাহারই নাম আত্মানন্দ। আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ একই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ হয়।

এই আত্মানন্দে, কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া প্রকাশ পাইবার প্রয়োজন হয় না। কারণ আত্মা ব্যতীত, অপর কেহ বা কিছুই নাই। আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন ভাব দ্বারা বেষ্টিত করার জন্য, আত্মার পূর্ণ বিকাশ অলক্ষিত থাকে। এই ব্যষ্টিভাব, অন্তর্হিত হইলেই,

স্বতঃপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মাই আনন্দ আস্বাদময়রূপে প্রকাশ পান। এই অপ্রতিহত, নিরবলম্বন অস্তি মাত্রে বর্ত্তমান ভাবই আনন্দ, বা পরমানন্দ।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

নির্ভর।

পরমাত্মাতে, আত্মত্যাগ বা তাঁহারই উপর সর্ব্বপ্রকারে নির্ভর করা মনুষ্যের প্রয়োজন। ইহা করিতে পারিলে, মনুষ্য কৃতার্থ হইতে পরে। এই ভাবের কতকাংশ অন্তরে রাখিয়া, পরমার্থ সাধন বা যে কার্য্যে বিশেষ প্রবৃত্তি নাই, সেই সকল কার্য্যে, পরমেশ্বর যাহা করেন, তাহাই হইবে বলিয়া, আলস্য বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন এবং যাহা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বা ইচ্ছার অনুকূল, সে বিষয় কর্ত্তব্য শব্দের ব্যবহার রাখিয়া. প্রাণপণে উহা সিদ্ধির চেষ্টা পান। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, এতদুভয় ভাবই দূষনীয় ও আত্মপ্রতারণা ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

নিশ্চিত রূপে ভর করাই, নির্ভর করা। যাঁহার সহিত পরিচয় না থাকে, তাঁহার প্রতি নির্ভর অসম্ভব। এ কারণ যতদিন পর্য্যন্ত পরমাত্মা দয়া করিয়া, আত্মীয় ভাবে জীবকে দেখা না দেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি নির্ভর করা, জীবের পক্ষে দুরূহ। এই জন্যই প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজের এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরমাত্মার উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নির্ভরতা তাহারই নাম, যাহা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উভয় অবস্থাতেই সমান ভাবে জীবের পৃথক্ কর্ত্তব্য-রহিত হইয়া, ব্যবহৃত

হয়। আলস্যাদি বশতঃ, অনেক সময় আমরা, পারমার্থিক কার্য্যের ফলাফল বা জ্ঞানমুক্তির জন্য, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে চাহি, এবং অর্থাদি উপার্জ্জন বা স্বাস্থ্যরক্ষাদির জন্য, নিজ কর্ত্তব্যের বিষয়, যাহাতে কোন প্রকার ক্রটি না হয়,সে বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল থাকি। যেন ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, বলিবার জন্য আর্থিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্য, পরমেশ্বরের অধীন বলিতে হইবে। অথচ আর্থিকাদি বিষয় জীবেরই আয়ত্তাধীন ও পরমার্থ—যাহা অন্ধকারের মধ্যে রহিয়াছে, উহা যদি বাস্তবিক থাকে, তাহা পরমেশ্বরের হাতে আছে বলাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ ভাব, অন্তরে পোষণ করিলেই, তবেই কার্য্যের ভেদে, পরমাত্মা ও জীবের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তৃত্বের আরোপ প্রয়োজন হয়। নচেৎ বাস্তবিক পক্ষে, সর্ব্বকার্য্যে, পরমাত্মার কর্ত্তৃত্বের সহিত, তাঁহাতেই নির্ভর রাখিয়া, জীবের কর্ত্তব্য পালন, ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যের অন্তর্গত হইতে পারে।

সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া, ভাব, অবস্থা ও ফলাফল, সূক্ষ্ম ও স্থূলে প্রকাশ হইয়া থাকে। সূক্ষ্মে ভাব, ও স্থূলে ক্রিয়া বা অবস্থার বিকাশ; কারণভাব, সূক্ষ্মে প্রেরণা করেন, সূক্ষ্ম, স্থূলকে ক্রিয়ার অবস্থায় আনে। এই জন্য যাহা সূক্ষ্ম স্থূল উভয় রূপে প্রকাশ না থাকে, উহা জাগতিক ভাবেও সত্য নহে। এ কারণ পরমার্থ-বিষয় সকলও স্থূল সূক্ষ্ম ভাবে জড়িত। পরমার্থভাবের যে অংশ, কেবলমাত্র কারণে অবস্থিত বলিয়া ধারণা করা যায়, উহা সম্পূর্ণ রূপ ব্যর্থ কল্পনা। নির্ভরতা সম্বন্ধেও বুঝা প্রয়োজন যে, যে নির্ভরতা স্থূল সূক্ষ্ম ব্যবহারের সহিত সম্পর্করহিত, উহাও নির্ভরতা নহে। অতএব, আপন কর্ত্তব্য পালনের সহিত পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব রক্ষা ও তাঁহারই ইচ্ছায় বা শক্তিতে ও দয়ায় জীবের

সিদ্ধি, এই ভাব অন্তরে রাখিয়া সর্ব্ব বিষয়ে, অশান্তি-রহিত হইয়া, নিরালস্যভাবে, যাহার দ্বারা যে কার্য্যের সম্ভাবনা, তাহার দ্বারা সেই কার্য্য করাই, পূর্ণরূপ নির্ভর বা আত্মত্যাগ। এইরূপ নির্ভর বা আত্মত্যাগেই জগতের হিত। বিপরীত ব্যবহারে অমঙ্গল অনিবার্য্য।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

কর্ত্তব্য।

যাহা কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার নাম কর্ত্তব্য। যে ক্রিয়ায়, জীবের অহিত উৎপন্ন হয়, তাহা কুকর্ম্ম সংজ্ঞায় অভিহিত। অতএব হিতকর ক্রিয়াই, কর্ম্মনামের যোগ্য। এই হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য শব্দের ব্যবহার। এই ভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, জীবের হিতের জন্য, জীবশরীরে যে শক্তির ব্যবহার, তাহারই নাম কর্ত্তব্য।

স্থূলই ক্রিয়ার পূর্ণ বিকাশ; এ কারণ স্থূলে প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, কর্ত্তব্যেরও পূর্ণ অবয়ব লাভ হয় না। জীবের সর্ব্ব প্রকার সুখদুঃখ ও ব্যবহার, স্থূলে সূক্ষ্মের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ঘটে। এক জনের কোন ব্যবহার গ্রহণকালেও যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় রূপের প্রকাশ থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ ব্যবহার প্রদানের সময়ও সূক্ষ্ম স্থূল উভয় ভাবই প্রকাশ পায়। নচেৎ অনুভব নাস্তি। যাহাতে এই দুই ভাবই জীবাত্মার হিতকর হয়, তাহাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে, কর্ত্তব্যও দুই প্রকার; প্রথম—জীব যে স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ রহিয়াছেন, যাহাতে ঐ

জীবশরীর, জীবের বাসোপযোগী হয়, ও অপর জীবের অহিত-কর না হয়, সে জন্য যে সকল ক্রিয়ার আবশ্যক উহা করা। দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার অন্তঃকরণের প্রকাশ, যাহা অপরের আনন্দদায়ক হয় এবং নিজেও আনন্দে থাকিতে পারেন, সেই ভাব রক্ষা। এই উভয় প্রকারে, স্থূল সূক্ষ্ম প্রকাশ থাকিলেই, একটী মনুষ্যের প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন হয়। সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানই, কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। অতএব জীবের হিতানুষ্ঠান না হওয়া পর্য্যন্ত, কর্ত্তব্য পালন নিবৃত্ত থাকে। সূক্ষ্ম ভাবের উদয় না হইলে, জ্ঞানকৃত ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। যে ক্রিয়া জ্ঞানকে অবলম্বন না করিয়া প্রকাশ, উহা কারণের আনন্দভাব হইতে লক্ষ্য চ্যুত। যেহেতু, কারণ বা ব্যক্তিভাব জ্ঞানকেই অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষ। জ্ঞানের প্রকাশ অপ্রকাশ, কারণস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছাধীন। অথবা যে ভাব প্রকাশ হইলে, জীবের পক্ষে ক্রিয়ারূপে প্রকাশ হইবার আশা, উহা পরমাত্মার দয়া-সাপেক্ষ। আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত দয়ার ব্যবহার নাই; অতএব যাহা, জীবশক্তির বাহিরে রহিয়াছে, উহা জীবে প্রকাশ পাইবার জন্য, পরমাত্মার মুখাপেক্ষী হইয়া জীবের হিতের জন্য উহা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখা মনুষ্যের পক্ষে একটী মহৎ কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যই, সর্ব্ব কর্ত্তব্যের মূল বা কারণস্বরূপ।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

———

মুক্তি ও স্বর্গলাভ।

অনেকানেক পণ্ডিতগণ বেদের মুক্তিপ্রসঙ্গ স্বীকার করেন, আর কেহ কেহ বলেন, বেদে মুক্তিপ্রসঙ্গ নাই। মনুষ্য শরীরে বা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া, বহুকাল স্বর্গে সুখভোগ করতঃ ফল-সমাপ্তিতে পুনরায় জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও তাহার ফলস্বরূপ, পুনরায় স্বর্গসুখভোগ ঘটিবে। এইরূপে, অনন্তকালই, জন্ম মরণ এবং পৃথিবী ও স্বর্গলাভ মনুষ্য-জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। উপনিষদাদি শাস্ত্রে মুক্তিরই সুখ্যাতি ও স্বর্গাদি ভোগের, তুচ্ছতাই দৃষ্ট হয়—এইরূপ একটী সন্দেহ পণ্ডিতগণের মধ্যে আছে। কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, যে, কে স্বর্গভোগ করে, আর কেই বা মুক্তি লাভ করে, এবং স্বর্গ ও মুক্তি কাহার নাম, তাহা হইলে, এ মীমাংসা, সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে।

কি স্বর্গ নরক, কি বন্ধন মুক্তি, জীবাত্মা বা মনেরই লাভ হয়। পরমাত্মাভাবে স্বর্গ নরক, ভোগ বা বন্ধন মুক্তি নাই। যে জীবাত্মার পক্ষে নরক আছে, তাহার পক্ষে স্বর্গ। যাহার বন্ধন-ভাব, তাহার জন্য মুক্তির উল্লেখ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি, সত্য বা ব্রহ্ম বা যৎতদ্‌ভাবে, অবস্থান করেন, তাঁহার পক্ষে, এই সকলের কোন ভাবই নাই। অথচ সকল ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাবুকদিগের জন্য, আপনাতেই অবস্থিত রাখিয়াছে বলিয়াই দেখেন। কারণ যাহা আছে, তাহা সত্যেই স্থিত। যদি বাস্তবিক পক্ষে কেহ আপনার পক্ষে স্বর্গ নরক, বা বন্ধন মুক্তি না দেখেন, তাহা হইলে তিনি অপরের পক্ষে উহা আছে, ইহা কেন দেখিবেন? তিনি ত

জানেন যে, বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র পরমাত্মাই নিত্য বিরাজমান; তাহা ছাড়া দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই। তবে তিনি, কাহাকে ও কি বস্তুকে, স্বর্গ, নরক বা বন্ধন মুক্তি বা ভোগ্য ভোক্তা বলিয়া দেখিবেন? আরও যদি তিনি একমাত্র আপনাতে বা পরমাত্মাতে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে বলিয়া বলেন বা ভাবেন, তাহা হইলে, ঐ ভাব তাহাতেই রহিয়াছে। এমত অবস্থায় অপরের পক্ষে যাহা আছে, অথচ তাঁহার পক্ষে নাই, এরূপ ভাব রাখিবার প্রয়োজন কি? তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, যে ব্যক্তি বন্ধনকে কষ্ট বলিয়া ভাবিয়াছেন, তিনি মুক্তির প্রয়াসী এবং যিনি কষ্টকে নরক বলিয়া ধরিয়াছেন, তিনি কষ্টের উপশমকেই স্বর্গ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভাবের পার্থক্য এই যে, এক জনের ভাব, একবার আসিবে, আবার যাইবে; আর এক জনের ভাব আর আসিবে না। এতদুভয়ের ভাব ও অবস্থা, বাস্তবিক পক্ষে একই। কারণ বাস্তবপক্ষে পরমাত্মা ব্যতীত কি আছে, যেখানে, আসা যাওয়া সম্ভব, বা যেখানে না থাকিবার বা যাইবার অনিচ্ছা? পরমাত্মার অস্তিত্ব অদ্বিতীয় অর্থাৎ পরব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নাই, এই ভাব রাখিয়া উভয় ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে, একজনকে আশা যাওয়া এবং আর একজনকে না আসিবার ভাব, রক্ষা করিতে হয় না। বাস্তবিকপক্ষে, এই আসা যাওয়া, বা, না আসা, স্থানকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান নহে। ভাবকে ভিত্তি রাখিয়াই উল্লেখ। মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকারীর, না আসিবার প্রবৃত্তি, কষ্টেরই চিরনিবৃত্তি লাভের ইচ্ছা এবং স্বর্গকামীরও আশা-কষ্টের নিবৃত্তি। তবে স্বর্গকামীতে চিরনিবৃত্তির আশা নাই। কিন্তু কাহার ভিতর কোন ভাব, বর্ত্তমান থাকিলে বা না থাকিলে কি আসে বা যায়।

যদি দেখা যায় যে মুক্ত পুরুষগণও পৃথিবীতে আগমন করেন; বা স্বয়ং ভগবান্, জীব মূর্ত্তিতে, সুখ দুঃখ ভোগ করেন, তখন জীবাত্মার যে স্বর্গ বা মুক্তি কল্পনা উহা কষ্টের বিরাম ব্যতীত আর কি হইবে? যে ব্যক্তি মুক্ত হইলেন, পরমাত্মার ঐ শক্তি চিরকালের জন্য কখনই নষ্ট হইয়া যাইবে না, পরমাত্মাতেই থাকিবে। পরমাত্মাতে থাকিলে, পরমাত্মাই যখন স্বয়ং প্রকাশ, অথবা অবতার মূর্ত্তিতে ব্রহ্মব্যক্তিভাবেও প্রকাশ হন, তখন মুক্ত পুরুষের পুনঃপ্রকাশের নিষেধ দেখা যায় না। ইঁহাদের উভয়ের ভাব যদি পূর্ণমাত্রায় সত্য হয়, অর্থাৎ স্বর্গভোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, যদি সত্য সত্যই অবগত হয় বা প্রত্যক্ষ অনুভব করে যে, তিনি ব্যক্তি, একবার স্বর্গে সুখভোগ করেন এবং আবার কর্ম্মক্ষয়ে পৃথিবীতে আসিয়া কর্ম্মফল সঞ্চয় করেন, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি আপনাকে চিরমুক্ত, অথচ শরীরী অবস্থায় শরীরি-ভাবে, ভোগ, করিলেও, কখনও ভোগাভোগ নাই ইহা বুঝিয়াছেন, তাঁহার সহিত একই মত বা ভাবাপন্ন।' কেবল পার্থক্য এই যে, একজন আত্মাহঙ্কার ও নিজশক্তির অধিকার বোধ করিয়া কর্ম্মফলাফল স্বর্গ নরক প্রভৃতি ভাব রাখিয়াছেন, আর একজন ব্রহ্মাহঙ্কার রাখিয়া সেই সকল ভোগাভোগ ও সুখ দুঃখই ভোগ করিতেছেন। মুক্তিকামী ও যেমন সুখ দুঃখ ভোগ সহ্য করিবার জন্য অন্তরে একটী ভাব রাখেন। স্বর্গকামীর উপাসনার ব্যবহারও তাহাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, কেহই প্রকৃত সত্যকে জানিয়া বলিতেছেন না। এইজন্যই বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। নচেৎ উভয়কেই আপন আপন মত বা ধারণা ত্যাগ করিয়া উভয় প্রকার ধারণার সাম্যাবস্থায় আসিতে হইত।

স্থূল শরীর ধারণ করিলে, কেহই সম্পূর্ণরূপ কষ্টের হাত হইতে এড়াইতে পারেন না। এজন্য মুক্ত পুরুষ বা অবতারগণও কষ্ট লইয়া থাকেন। এই কষ্টকে নরক ধরিলে, অশরীরী বা ভাবময় অবস্থায় যে কষ্টের নিবৃত্তি, তাহার নাম স্বর্গ; এবং যাবতীয় সুখভোগ, আত্মাতেই অবস্থিত বলিয়া, মুক্ত পুরুষও স্বর্গভোগ বা সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে আত্মা আপনাকে মুক্ত দেখেন, তিনি সকলকেই মুক্ত পুরুষ বলিয়াই জানেন। তিনি আরও জানেন যে, জীব আপনা হইতে বিমুখ হইয়াই স্বর্গ নরক ও বন্ধন মুক্তি শব্দ রাখিয়া, ইহার এক একটী ভাব কল্পনা করতঃ জাগতিক সর্ব্বপ্রকার ভিন্নতা রক্ষার সহিত নানাপ্রকার সুখ দুঃখ বন্ধন মুক্তির আস্বাদ ভোগ করিতেছেন মাত্র। এই স্বর্গ নরক বা বন্ধন মুক্তি জগতেরই বিষয় রূপ। জগদতীত ব্রহ্মে বা আত্মায় স্বর্গ নরক বা বন্ধন মুক্তি নাই।

স্বর্গ ও মুক্তি ভাবের মধ্যে, বিশেষত্ব এই যে, যাহার কল্পনায় স্বর্গ, তাহার পক্ষে কষ্টের বিরাম ও সুখের প্রকাশ আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। আর মুক্তিকামীর পক্ষে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত থাকিয়া কেবল কষ্টের উপশম প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মুক্তিকামীও শান্তি নামক একজাতীয় ভোগ লাভের আশা রাখেন, কিন্তু ঐ ভোগ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ হইবে, ইহা মনে করেন না। আত্মার স্বভাব আনন্দ, এই জন্য আত্মা একাকী থাকিলে ঐ আনন্দ আত্মাতেই প্রকাশ থাকে মাত্র। পরমাত্মা অদ্বিতীয় অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ বা কিছু নাই, এই ভাব রাখিয়া স্বর্গ কল্পনা করিলে, মুক্তি ও স্বর্গ একই ভাবে দাঁড়ায়; অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে, সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন

ভোগ আছে বলিয়াই স্বর্গাদি ভোগ ঘটে। স্বর্গ অপর কিছুই নহে, পরমাত্মারই আনন্দ বা সুখরূপ আস্বাদ মাত্র; এবং ইন্দ্রিয়াদি ও পরমাত্মা হইতে অপর কিছুই নহে। পৃথক্ ভাব ব্যতীত ভোগ ঘটে না বলিয়াই, পরমাত্মার আত্মভোগের জন্য, পার্থক্য ভাব বা শক্তিই ইন্দ্রিয়রূপ। এই ভাবে দেখিলে, স্বর্গ ও মুক্তির বিশেষত্ব অতি অল্প। আরও মুক্তির কামী, মুক্ত পুরুষ নহেন এবং তাঁহার ভাব সত্য ভাব হইতে, দূরেই অবস্থিত। একারণ মুক্তি-কামনাও অন্যান্য কামনার ন্যায় অজ্ঞানতাপূর্ণ। এজন্য কথিত আছে যে, মুক্তি প্রার্থনা করিলেও, পুনরায় জগতে আসিয়া পরে মুক্ত হইতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে জীব কোন কামনা রাখুন আর নাই রাখুন, যাহাতে সৎ অর্থাৎ জীবাত্মার হিতকর কার্য্যে রত হন ও হিত-কার্য্যে, আপনার ও অপর সকলেরই প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার জন্য, জ্ঞান লাভের চেষ্টাই মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন করিলে, যাহা জীবাত্মার প্রাপ্তব্য আছে, তাহা অপ্রাপ্ত থাকে না। অজ্ঞানতা বশতঃ ইহা চাহি, বা উহা চাহি না, এরূপ ভেদ রাখিয়া কোন কার্য্যই করা উচিত নহে। কারণ যিনি অন্ধ হইয়া, নিজের দর্শন জ্ঞানের বর্ণনা করেন, তাহার পক্ষে, উহা যেমন বাতুলতা মাত্র, সেই প্রকার অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব আপনার মঙ্গল জানিয়াছেন, মনে করিয়া কার্য্য করিলে, ইহা অপেক্ষা অবোধতার কোন অংশে খর্ব্বতা দেখা যায় না। এইজন্যই সর্ব্ব বিষয়, সর্ব্ব কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞাদির ফলাফল পরমাত্মাতে অর্পণ করিবার বিধি। অর্থাৎ সৎ বা জীবহিতকর কার্য্য করিয়া উহার ফলাফল পরমেশ্বরে ন্যস্ত রাখিয়া, তাঁহার প্রতি, প্রীতিনিষ্ঠাযুক্ত হইলে, জীব সর্ব্ব সৎকার্য্য ও সর্ব্ব যজ্ঞের ফলস্বরূপ যজ্ঞেশ্বরকেও লাভ

করিতে পারেন। যজ্ঞাদির ফললাভ করা ত তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ বিষয় বলিয়াই বোধ হয়।

বেদে জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা আছে; এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বদুঃখনাশন, বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এমত অবস্থায়, মুক্তি প্রসঙ্গ না থাকিলেও, ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব বা সর্ব্বদুঃখের অবসানকে মুক্তি বলিয়া উল্লেখ করিবার, কোন আপত্তি দেখা যায় না। কারণ, যদি, অমুক্ত অবস্থাই, জীবাত্মার দুঃখের অবস্থা হয়, তাহা হইলে, সর্ব্ব দুঃখ-নিবারণের অবস্থাই, জীবাত্মার মুক্তি অবস্থা। ভাষা বা শব্দের ভেদ রক্ষার জন্য, যত্ন রাখিলে, অনেক সময় সত্য ভাব, অন্তঃকরণ হইতে দূরে চলিয়া যায় এবং স্বভাবতঃ জীব অহঙ্কার মূর্ত্তি বলিয়াই, ভেদ রাখিতে সত্বান্। এইরূপই ভাবের মিলনের দিকে লক্ষ চ্যুত হইয়া, শব্দের ভেদ রক্ষার সহিত, আত্মারও ভাবের ভেদ, রক্ষা করিয়া, বৃথা তর্কজালে পড়িতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে, ব্রহ্মানন্দই স্বর্গ সুখ বা স্বর্গভোগ এবং ব্রহ্মভাবে অবস্থানই মুক্তি। স্বর্গ ও মুক্তি উভয়ই এক মাত্র পরমাত্মার আনন্দের বিকাশ। এবং পরমাত্মা কি স্বর্গ, কি মুক্তি, উভয়েরই অতীত বস্তু যাহা, তাহাই। কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, ইন্দ্রিয়াদি সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বন্ধনরহিত অবস্থার সহিত, পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশের সুখাস্বাদের নাম স্বর্গ এবং ইন্দ্রিয়াদির অতীত ভাবে, আসক্তির দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, ব্রহ্মের এক আনন্দ আস্বাদ ভাবের নাম, মুক্তি রাখা হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যতক্ষণ না, এই দুই জাতীয় ভাব, একত্র জীবাত্মায় প্রকাশ হয়, ততক্ষণ মুক্তিও মুক্ত নহেন, স্বর্গ ও নরক বলিয়া বুঝা প্রয়োজন। অর্থাৎ যাবৎ পরমাত্মার এক নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় আস্বাদ ভাবের সহিত,

তাহারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে, সুখ দুঃখের আস্বাদ একত্র, এক ও ভিন্নভাববর্জ্জিত হইয়া জীবাত্মার প্রকাশ না হয়, তাবৎ স্বর্গ বা মুক্তি, শব্দ মাত্রেই থাকে। যাহা আছে, সমস্ত লইয়াই ব্রহ্ম! যিনি ব্রহ্মভাবে বিরাজ করেন, তিনি যথার্থ মুক্ত বা স্বর্গীয় ব্যক্তি। অতএব যিনি, যে শব্দকে গ্রহণ করিয়া, দুঃখবর্জ্জিত হইতে ইচ্ছা রাখুন না কেন, পরমাত্মা ব্যতীত দুঃখ নিবারণের সম্ভাবনা নাই। এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই, সর্ব্ব ইচ্ছার চরিতার্থতা বা দুঃখের উপশম হয়।

মোক্ষ ও স্বর্গের পার্থক্য ও একতা এইরূপে ধরিলেই, সর্ব্ব বিবাদের শান্তি হইতে পারে। যেমন আত্মা ও ইন্দ্রিয়, বস্তু ও প্রকাশ, ভাবে এক, কিন্তু ক্রিয়া পরস্পারের পৃথক্। অথচ আত্মা ও ইন্দ্রিয় উভয় ভাব, একত্র না হইলে, মন ও বুদ্ধি প্রকাশ হয় না ও সর্ব্ব ভোগাভোগ অপ্রকাশ থাকে। যেমন ক্রিয়ার আস্বাদের জন্য, এ দুয়েরই মিলন প্রকাশ আবশ্যক হয়, সেইরূপ, কি মোক্ষ আস্বাদ কি স্বর্গ-আস্বাদ উভয়, আস্বাদের মধ্যে একই আনন্দ আস্বাদ রহিয়াছে। এই আনন্দ আস্বাদ লাভের জন্যই, কি মুক্ত ভাব, কি স্বর্গ অর্থাৎ সুখভাব, উভয়ই প্রয়োজন। দুঃখের উপশম ও শান্তির আশা, উভয়ের মধ্যেই, সমান ভাবে আছে। তবে লোকপ্রচলিত স্বর্গ, ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা এবং মোক্ষ, সর্ব্ব কষ্টের উপশম ও আনন্দরূপে প্রকাশ বা অবস্থানকে বুঝা আবশ্যক। এই ভাবে স্বর্গ ও মুক্তির পার্থক্য সহস্র যোজন। এইজন্য ব্যর্থ শব্দ জাল ভেদ করিয়া, পরমাত্মাতে নিষ্ঠাযুক্ত অন্তরে তাঁহার আজ্ঞা পালন বা জীবহিতে রত থাকিলে, যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা পরমাত্মা হইতেই, সহজে পুরণ হইতে পারে। এবং ইহা করা জ্ঞানী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

কিসে মনুষ্য সৎ হয় ?

জ্ঞানী, বিজ্ঞানী প্রভৃতি ব্যক্তিমাত্রেরই বুঝা প্রয়োজন যে, যতদিন পর্য্যন্ত, মনুষ্যগণ সৎ না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সাধনার দ্বারা, লক্ষ লক্ষ সুখশান্তিকর বিষয় আবিষ্কৃত হইলেও, মনুষ্যকুল দুঃখ এড়াইতে কখন, কোন মতে, সমর্থ হইবেন না। অতএব যেমন সুখকর বিষয় আবিষ্কারের চেষ্টা রহিয়াছে, সেইরূপ, মনুষ্যগণকে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী, দৈহিক সামর্থ্যশালী ও সহিষ্ণু করিবার জন্য, উহার অপেক্ষাও সহস্র গুণ অধিক প্রয়াস পাওয়া প্রয়োজন।

মানব স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়া যাবৎ থাকিবে, তাবৎ পৃথিবীতে যতপ্রকার ভোগ আছে, ঐ সকল ভোগ. স্থূল শরীরকে ভোগ করিবার বা দিবার জন্য আকর্ষণ করিবেই করিবে। কারণ, স্থূলভাব লইয়াই মনুষ্যের জীবন্ত অবস্থা। যাহা মনে ভোগ হয়, উহাও শরীরস্থ অবস্থাতে এবং শরীরী ব্যক্তি বা পদার্থাদি হইতেই ভোগ হইয়া থাকে। স্থূল শরীর যে একমাত্র অগ্নিরূপ, ইহা বুঝা কষ্টসাধ্য হইলেও, ইন্দ্রিয়গণকে অগ্নিরূপে অনুভব করা জ্ঞানিগণের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য। এবং বায়ু পদার্থই যে গতি ঘটাইয়া, স্থূল শরীরকে রক্ষণ. নাশ, উঠান, ফিরান, থামান প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন, ইহাও বুঝিবার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা নাই। এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, এই অগ্নি ও বায়ুশক্তি, শরীরে প্রসন্ন বা শান্তভাবে না থাকিলে, কি প্রকারে শরীরীর দ্বারা, শান্ত বা প্রসন্নতাজনক কার্য্যের আশা করা যাইতে পারে। কাঁটা বুনিয়া ধান্যের আশা যেমন নিষ্ফল,

এবং নিরাশা ও দুঃখ উৎপন্নই করে, সেইরূপ শরীরের অগ্নি ও বায়ুকে শান্ত না রাখিলে, ঐ শরীরী ব্যক্তি হইতে সৎকার্য্যের প্রত্যাশা, নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ও তাহাতে আশাভঙ্গজনিত কষ্টই উৎপন্ন হয়।

অগ্নি ও বায়ুরূপ, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া সকলকে নিয়মিত করিতে হইলে, আহারের প্রতি প্রথম দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ আহার্য্য পদার্থই, শরীরের রক্তমাংসাদি ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ হয়। এমন দ্রব্য বা এত পরিমাণ আহার করা উচিত নহে, যাহাতে শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ বর্দ্ধিত হইয়া, মনকে আন্দোলিত করে; এবং এত অল্প আহার ও ন্যায়বিরুদ্ধ, যাহাতে শরীরে, কষ্ট বা রোগ উৎপন্ন করিয়া মনের বিক্ষেপ জন্মায়। যেমন আহার সম্বন্ধে নিয়ম রক্ষার প্রয়োজন, সেইরূপ, পরিশ্রমের বিষয়েও বিশেষ নিয়ম রক্ষা হওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, স্থূল শরীরে অগ্নিশক্তির আধিক্যভাব প্রকাশ পায়। যেমন অতিরিক্ত কার্য্য করিবার জন্য, ইন্দ্রিয়শক্তি অস্বাভাবিকরূপে অতিরিক্ত পরিমাণ প্রকাশ হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়, অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত পরিমাণ ভোগের জন্যও আকাঙ্ক্ষা করে। এই আকাঙ্ক্ষা, বিশেষরূপ প্রবল হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পক্ষেও, অজ্ঞানীর অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়া, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব মনুষ্যগণকে সৎ ও স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন রাখিবার জন্য, আহার ও পরিশ্রমের বিষয়ে, বিশেষ লক্ষ্য রাখা ও নিয়ম পালন করা আবশ্যক। যাঁহারা মনুষ্যের হিত চাহেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে জীব অনায়াসে প্রয়োজনীয় পবিত্র দ্রব্য আহার ও পরস্পরের ব্যবহারে পরস্পর তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা রাখেন। কেবলমাত্র আহারের সামঞ্জস্যেও পূর্ণ

মঙ্গলজনক ফললাভ অসম্ভব। পরিশ্রম এমন পরিমাণ থাকা প্রয়োজন, যাহাতে শারীরিক বায়ু অতিরিক্ত চঞ্চল,জড়ীভূত বা স্থূলশরীর অধিক পরিশ্রান্ত হইয়া, উহার দাবী শোধরূপ, অতিরিক্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা না করে। যদিও, এবিষয়ে সাধারণের লক্ষ্য অতি অল্প এবং অনেকেই হয়ত এবিষয় ভাবিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াও, মনে করেন না, কিন্তু বিচার করিলে দেখিবেন, পরিশ্রমের নিয়ম রক্ষাও সৎ হইবার পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আমাদের মধ্যে যে, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূলশরীর ও ইন্দ্রিয়াদি রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে যে শরীর যত পরিমাণ পরিশ্রম করে, সেই শরীর তত পরিমাণ সুখের আকাঙ্ক্ষাও রাখে। সুখের আশা ব্যতীত, শরীরে কোন শক্তিই, স্পন্দিত হইতে চাহে না। এমন কি ভয় ভাবনার দ্বারাও যে মনের স্পন্দন, তাহাও সুখভোগের জন্য বা দুঃখ নিবারণার্থ চেষ্টায় উদ্ভব। অতএব জ্ঞানিগণের বুঝা প্রয়োজন যে, যদি কোন ব্যক্তির কোন শক্তি অধিক থাকায়, তাহার ও অপরের ক্ষতি বা অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে, কেবল মাত্র, তাহার সেই শক্তির প্রকাশের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, যে কারণে, বা যে জাতীয় আহার ও পরিশ্রম বা ভয় ভাবনায় জন্য, উক্ত শক্তি অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সুনিয়মের ব্যবস্থা করেন। নচেৎ কেবলমাত্র শক্তির প্রকাশ, আহত হইলে, ঐ শক্তি কখনই সম্পূর্ণরূপ নিরস্ত হইবে না; বরং অপরাপর শক্তির সাহায্য লইয়া, আঘাতকে অতিক্রম করিবার চেষ্টাই, তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে। শক্তির প্রতি, প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া জীবকে সৎ করিবার চেষ্টা পাওয়ায়, বিপরীত ফলের আশঙ্কাই পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে।

মনুষ্য যাবৎ জীবিত থাকিবেন, তাবৎ তাঁহার সুখ-চেষ্টা রহিবে। এই সুখের ভাব অন্তরে রাখিয়া, ইহাকে শব্দে বা ভাষায় এবং নানাপ্রকার ভদ্রতা ও সাধুতা রক্ষার সহিত, নানা লোকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেন মাত্র। কিন্তু উহা, সুখ-চেষ্টা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এমন কি, যাহাকে নিষ্কাম হইবার ইচ্ছা বলা হয়, তাহাও, সুখেরই চেষ্টা মাত্র। যাহা একজনের পক্ষে সুখ, তাহা সকলের পক্ষে সুখ, নাও হইতে পারে, এবং যাহা অদূরদর্শীর পক্ষে প্রার্থনীয়, তাহা দূরদর্শীর পরিত্যাজ্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুখ বা শান্তি, চেতনা মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষনীয়। তবে ভাষার কৌশল রাখিয়া পূর্ণমাত্রায় চাহিয়াও, যেন চাহি না, এরূপভাব অজ্ঞানীর চক্ষে প্রতিফলিত করা অসম্ভব নহে। যাঁহাদের স্থূল শরীরে, এবং ক্ষণস্থায়ী জাগতিক অবস্থান কালে মাত্র, আপনার স্থায়িত্ব বোধ আছে, তাহারা তাহার উপযুক্তও সেই কাল পরিমাণের সুখাকাঙ্ক্ষা রাখেন। আর যাঁহারা আপনার সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মভাব অবগত হন, তাঁহারা সেই জাতীয় ও যিনি যত কাল নিজ স্থায়িত্ব ধারণা বা বিশ্বাস করেন, তিনি তত কালই সুখশান্তির প্রার্থী হন। যেমন জ্ঞানী অজ্ঞানীর সুখের চেষ্টা ও প্রবৃত্তি, ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সুখাকাঙ্ক্ষা একই এবং একজন দরিদ্রের যাহাতে সুখ, একজন রাজার পক্ষে, উহা বিশেষ কষ্টকর অবস্থা; সেইপ্রকার শরীরাভিমানের তারতম্যে, সুখদুঃখের বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, যাহা সুখ, তাহা চিরকালই সুখ, সুখের বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সুখের ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদভাব নহে; এবং সুখ জ্ঞানী অজ্ঞানী, ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রার্থনীয়।

জীবশরীরের বা ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক রাজা মন। যেমন

ইন্দ্রিয়াদি শান্ত না থাকিলে. মনের চঞ্চলতা আইসে, সেইরূপ মনের অশান্ত অবস্থায়, ইন্দ্রিয়াদি চঞ্চল হইয়া পড়ে। একদিকে ক্রিয়া বা পরিশ্রম দ্বারা, যেমন অগ্নি ও বায়ুর নানাপ্রকার গতি ও প্রকাশ হয়, অপর দিকে, অন্তরের ভাবের প্রকাশ হইলেও, ঐ প্রকাশ, ইন্দ্রিয় বা স্থূলশরীরের প্রতি সম্পূর্ণরূপ আধিপত্য করে। আবার ঐ শরীরের বিকৃতি অবস্থা, শরীরীতে আহত হয়। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত, শরীর হইতে মনে ও মন হইতে শরীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারে কি শুভ কি অশুভ, উভয় প্রকার ভাব ও কার্য্য, স্থূলশরীর হইতে মনে এবং মন হইতে স্থূল শরীরে বিস্তার পাইয়া, ক্রমে এক সময়, কি মনে কি স্থূলশরীরে উভয় অবস্থাতেই একই তানে একই সুরে গাহিতে থাকে। স্নেহ পদার্থ মনকে যেমন ও যত শীঘ্র, আর্দ্র ও কোমল করিতে পারে, এরূপ অন্য কোন শক্তিই মনকে তত শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে না, এবং চেতন পদার্থ হইতে এই ভোগলাভ হয় বলিয়াই, ইহা একটী পরম উৎকৃষ্ট ভোগ্য মধ্যে গণ্য। অতএব যাহাতে মনুষ্যের অন্তঃকরণ প্রীতিলাভ করত শান্তভাবে থাকিয়া, মানসিক ও শারীরিক যথোপযুক্ত কার্য্য করিয়া, পবিত্র আহার, বাস, সংসর্গ ও ভাবলাভে সমর্থ হয়, ইহা করা, জগৎহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

জীবশরীরে অগ্নি ও বায়ুর জন্য,যেমন কতকগুলি কর্ত্তব্য দেখা গেল,যাহা না হইলে জীবের পবিত্রতা রক্ষার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, সেইরূপ বাহ্য জগতেও কতকগুলি বিষয়ের পবিত্রতা অর্থাৎ জীবের মঙ্গললাভের উপযুক্ত অবস্থা না ঘটিলে শান্তির আশা দুরাশা মাত্র। দুর্গন্ধ ও রুক্ষ পদার্থ শরীর ও মনকে রোগগ্রস্ত করিবার

একটী প্রধান সহায়। অপরপক্ষে সুগন্ধ এবং স্নিগ্ধ পদার্থ শরীর এবং মনের সুখ ও স্বচ্ছন্দতাদায়ক। যাহাতে সুগন্ধের বিস্তার এবং দুর্গন্ধের বিনাশ ঘটে, তাহা লোকালয়ে রক্ষা করিতে পারিলে, জীবের শরীর ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা ও ঘটান সহজসাধ্য হয়। যেমন জীবে মন হইতে ভাবের প্রকাশ হইয়া গতি বা ক্রিয়াদি বা ব্যবহারে উপস্থিত হয়, সেইপ্রকার জগতের প্রকাশ পদার্থ বা চেতনায় ভাবের উদয় হইয়া, জাগতিক ক্রিয়া বা অবস্থা উৎপন্ন হয়। যেমন জীবের মধ্যে প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা রহিয়াছে, সেইরূপ পরমাত্মার প্রকাশভাবে, প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা আছে। এ কারণ প্রসন্নময় পরমাত্মাকে, প্রকাশে প্রসন্ন রাখিবার জন্য, প্রকাশের সহিত প্রীতি ভক্তি ও যতপ্রকার সদ্ব্যবহার সম্ভব, তাহা মনুষ্য মাত্রেরই করা প্রয়োজন। ইহা হইলেই সর্ব্বজগতের হিতের জন্য, কি জীব শরীরগত, কি বিরাট ব্রহ্মের নিকট মনুষ্য বা সর্ব্বজীবকেই সৎ করিবার অনুষ্ঠানের, ত্রুটি থাকে না। নচেৎ সর্ব্বতোভাবে জীবের হিত বা জীবকে সৎ পবিত্র করিবার চেষ্টা নিরস্ত থাকে। অতএব কেবলমাত্র মনুষ্যকে সদুপদেশ দিয়াই জ্ঞানিগণের পক্ষে সৎ করিবার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। ইহা বুঝিয়া যাহাতে সর্ব্বজীব পরমানন্দে থাকিতে পারেন, তাহা ব্যক্তি মাত্রেরই করা কর্ত্তব্য।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

পরিশিষ্ট।

সাংখ্য ও সাংখ্যাতীত জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা পরমাত্মা, পরব্রহ্মই সাংখ্যরূপ ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানভাবে প্রকাশ হইয়া, সংখ্যা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও বিষয়জ্ঞানরূপে অনাদি কাল হইতে স্বতঃ প্রকাশ আছেন। যাবৎ সাংখ্যরূপ জ্ঞান, তাবৎ সংখ্যা বা বিষয়ের ভিন্নতা। এ কারণ, এক বা প্রথম সংখ্যার ব্যবহার, তাঁহার প্রতি সাধনার জন্য প্রয়োজন হইলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত, সাধক সংখ্যা ও সাংখ্যবর্জ্জিত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য অপ্রকাশ থাকে। একারণ সংখ্যা ও সাংখ্যের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ যেখানে এই দুই ভাব অভেদে নাম, রূপ শক্তি, প্রভৃতির ভিন্নতারহিত ভাবে অবস্থান করেন, তাহাই ব্রহ্মভাব। যাবৎ এই ভাব প্রকাশ না হয়, তাবং সংখ্যা ও সাংখ্য, বিষয় ও বিষয়ী ভোক্তা ও ভোগ পৃথক্ থাকিবেই থাকিবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ জগদ্ভাবে, ব্রহ্ম আস্বাদ লুপ্ত বা সুপ্ত ভাবেই অবস্থিত করিবে। এইজন্য সংখ্যার ও সাংখ্যের প্রথম প্রকাশরূপ একমাত্র চৈতন্যময় প্রকাশের ধ্যান ধারণার অবিশ্যক। যেমন বিষয় ও বিষয়ী এক, সেই প্রকার চেতনা ও প্রকাশ একই বস্তু পদার্থ ও রূপ। অহঙ্কার বা ব্যক্তিভাবের প্রবলতায়, চেতনা, এবং নিরহঙ্কার ও ব্যক্তি-বর্জ্জিত ভাবের আধিক্যের প্রকাশে, নাম, রূপ প্রকাশাদির আস্বাদ লাভ হয়। একারণ জগদ্ব্যাপারে সৃষ্টি ও স্রষ্টা নাম একই অবিনাশী ব্রহ্মেরই হইয়াছে। যেখানে দৃষ্টি বা জ্ঞান

ভিন্নতার উপর সংস্থাপিত, সেখানে সৃষ্টি নাম বা শব্দের ব্যবহার ; আর যেখানে অভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য, সেইখানে আপনার বা পরমাত্মারই উপস্থিতি বা ব্রহ্মভাবের অনুভূতি বর্ত্তমান। লক্ষ্যই, সংখ্যাতীত পরব্রহ্মে, এক ও এক দুই প্রভৃতি সংখ্যা জীবভাবে প্রতিফলিত রাখিয়াছে, যাবৎ জীব থাকিবে, তাবৎ লক্ষ্য অলক্ষ্য হইবে না, একারণ ব্রহ্মভাবে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত, সংখ্যা ও সাংখ্যের মাহাত্ম্য জীবহৃদয়ে রাজত্ব করে। দর্শন ও বেদাদির সম্বন্ধেও এইরূপে বুঝা প্রয়োজন।

বাস্তবিক পক্ষে যাহার অন্তরে যে আস্বাদ নাই, তাহার পক্ষে যেমন, সে আস্বাদের কল্পনা, অসম্ভব, সেইরূপ, ব্রহ্মাস্বাদ বিহীন অবস্থায়, সমস্ত ব্রহ্ম বলিলেও, তাহার পক্ষে, অব্রহ্মই ভাসিতে থাকে।

জীবভাব ব্রহ্মভাব নহে। এ কারণ জীবের লক্ষ লক্ষ চেষ্টাও জীবভাবেরই অন্তর্গত বলিয়া, উহার দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রকাশ অসম্ভব। এ কারণ, ব্রহ্মপ্রসাদ বা ব্রহ্মের ইচ্ছা বা দয়া ব্যতীত, ব্রহ্মলাভের কোন, উপায়ই, উপায় নহে। অথচ তাঁহার ইচ্ছায়, তিনি, তৎপ্রাপ্তির যে নিমিত্তক, দয়া করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার দ্বারা সহজে তাঁহার দর্শন লাভ সম্ভব। এ কারণ, ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধাযুক্ত কার্য্য ও নিরহঙ্কার ভাবে, তাঁহার শরণাগত না হইলে, কোন সাধনক্রিয়াই, সাধনা নামের উপযুক্ত নহে, এবং তাহাই সাধনা, যাহা দ্বারা, এই সকল ভাব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া, সরল অন্তঃকরণে পরমাত্মার দয়া মাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়া, তাঁহার জন্য, তাঁহারই মুখ তাকাইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি জন্মে। এই প্রবৃত্তিই পরমাত্মার দয়াকে মানবহৃদয়ে প্রত্যক্ষ করায়। বাস্তবিক পক্ষে

তাঁহার দয়া, সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ রহিয়াছে। যত পরিমাণ নির্দ্দয়তা-ভাব আমাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয়, তত পরিমাণই তাঁহার দয়া, প্রত্যক্ষ হয়। সেইজন্য, পরমাত্মার দয়া-শক্তিকে লাভ করিবার প্রয়াসে, আপন হৃদয়কে দয়ায় ভিজাইয়া রাখার প্রয়োজন। কারণ আমাদের হৃদয়ে যে যে শক্তি প্রকাশ থাকিবে, আমরাও পরমাত্মাতে সেই সেই শক্তির বিকাশ দেখিব। এ কারণ সর্ব্ব বিষয়কে, এক পরমাত্মা বিষয়ে, এবং সর্ব্বশক্তিকে, এক চিৎশক্তিতে ও সর্ব্ব আস্বাদকে, এক আনন্দমূর্ত্তিতে ভাবনা বা ধ্যান ধারণার বিধি।

যাবৎ জীব, তাবৎ অহঙ্কারযুক্ত চেষ্টা বর্ত্তমান। এ কারণ, যৎতদ্‌ভাবে স্থিতি লাভের জন্য, প্রথমতঃ, বহু ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাকে তিনি (অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়) এই তিনকে একে (অর্থাৎ আনন্দময় বস্তু মাত্রে প্রকাশে) আনিলে, একেরই অবিচলিত অবস্থাই, যৎতদ্‌ভাবে প্রকাশ থাকে। এইজন্য অদ্বৈত জ্ঞানের সহিত, আনন্দময় ব্রহ্মের আস্বাদই, সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লাগাইবার জন্য অস্তি মাত্রে বা সমস্তই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম কিছুই নহেন এই ভাব, ও শব্দের ব্যবহার; এবং এইজন্যই সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভাবের ও শব্দের প্রকাশ। নচেৎ সৃষ্টি কোন কালেই হয় নাই। পরব্রহ্ম আপনিই একমাত্র বিরাজমান আছেন।

এক ও এক দুই না থাকিলে, যেমন কোন গণনাই হয় না, সেইরূপ চৈতন্য ও জড়, চেতনা অথবা ব্যক্তি ও ভোক্তা, ভোগ্য না থাকিলে, জগৎ নাম হয় না। পদার্থের আস্বাদ জড়তা, এবং ব্যক্তির আস্বাদে, চেতনার আনন্দভাব অনুভূত হয়। ব্রহ্ম আনন্দময় এবং ব্যক্তিভাবের মধ্যে আনন্দ আছে বলিয়াই, ব্যক্তি-

গণ, জড় পদার্থ অপেক্ষা, চেতনা ব্যক্তির সম্মান ও জড় অপেক্ষা, ব্যক্তিচেতনার ভোগের আসক্তি রাখে। এই আসক্তিই, অহঙ্কার, স্নেহ, দয়া, প্রীতি, ভক্তি ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার মনের প্রবৃত্তির উদ্বোধক। যাবৎ, এই সকল ভাব, চেতনায় নিষ্পন্দ ভাবে অবস্থান না করে, তাবৎ ব্যক্তিচেতনা, ব্যক্তিচেতনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণই জগৎস্রোত। নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি দুইটী ভাব না থাকিলে, স্রোত থাকে না। এই জন্য, সাধকের পক্ষে, শান্ত অবস্থায় স্থিতিলাভের প্রয়োজনে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়কেই নিবৃত্ত করার বিধি।

বস্তু থাকিলেই শক্তি। এবং শক্তির প্রকাশই, অবস্থার ভেদ রক্ষা করে। এ কারণ, বস্তুর সর্ব্ব অবস্থাতেই, বস্তুভাব স্থির থাকা সত্ত্বেও, গুণ শক্তি ও অবস্থা বশতঃ অবস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বস্তুর ধারণা না হইলে, বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাকে, অবস্তু বলিয়াই বোধ হইবে, কিন্তু বস্তুর ধারণা ঘটিলে, সমস্তই বস্তু বা বস্তুরই প্রকাশ বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। এই জন্য, সত্য উপলব্ধির আশায়, ভিন্ন ভাবের পরিহার ও এক ভাবের ধ্যান-ধারণ আবশ্যক। এই এক ভাব, স্থির হইলেই বস্তু মাত্র বর্ত্তমান থাকে। প্রকাশ ব্যতীত ধারণা নাই। অথচ প্রকাশ ধারণার মধ্যেও অপ্রকাশ ভাব আছে। ব্যক্তভাব বা ব্যক্তত্ব প্রকাশই, প্রকাশ ও অপ্রকাশকে, একে আনিয়া ফেলে। এ কারণ ব্যক্তিহীন প্রকাশ ধারণা, বিপরীত দিকেও লক্ষ্য আনে। পক্ষান্তরে ব্যক্তি-প্রকাশ, সর্ব্ব ভাব ভাবকে, চক্ষের আড়াল করিয়া, চেতনার আস্বাদ দানে সমর্থ। এই আস্বাদ দ্বিতীয়রহিত হইলেই, সাধক, আপনিই যাহা তাহাই বর্ত্তমান থাকেন বা ব্রহ্ম অভেদে স্থিত হন।

জগৎ, ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদময়। এই আস্বাদের মধ্যে, আত্মপর ভাবই, মুখ্য ভাবে, অবস্থান করে। যেখানে বা যে আস্বাদে, প্রীতি সংযুক্ত হয়, উহা আপন বা আপনার নিকট হয়। এবং অপ্রীতিই ভিন্নতার পোষকতা করিতে যত্নবান্। অতএব আপন হৃদয়, প্রীতিরসে ভিজাইয়া রাখিলে, সর্ব্ব আস্বাদই আপন বা প্রীতিময় হইয়া আসিবার সম্ভাবনা অধিক। জগৎময় আপনারই আত্মা বা পরমাত্মারই রূপ, এই ভাব, রক্ষা করিলে, সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার সুবিধা হয় বলিয়াই, সাধন অবস্থায়, ইহার আস্বাদ ভাব লইয়া, সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে, আপনার সহিত এক করিয়া, প্রকাশ থাকিবার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য তখনই সিদ্ধ হয়, যখন সুখ, দুঃখ ও হর্ষ বিষাদকে, প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার শক্তি প্রকাশ পায়। এই শক্তি প্রকাশ হইলে, আত্মা, আনন্দ-মাত্রে অবস্থিতি করে। এই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। ইহার জন্য সর্ব্বপ্রকার সাধনা ও সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবকে একে আনিবার প্রয়াস।

জ্যোতিঃই ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব বা আদি প্রকাশ। এই জ্যোতিঃ, আস্বাদ ও অহঙ্কারময়। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হইলে, চেতনা ও জড় অথবা অহঙ্কাররূপ জীব ও আস্বাদরূপ বিষয় ভাবে প্রত্যক্ষ হয়। অস্তি ও নাস্তি, অথবা প্রকাশ ও অপ্রকাশকে ভিত্ত করিয়াই, বিভেদ স্থিত। কারণ, যদি সর্ব্বপ্রকার অস্তিভাব প্রকাশ থাকে, তাহা হইলে নির্ণয় করিবার কিছুই বা কেহ থাকে না। সর্ব্বপ্রকার অভাব-ভাবেও নাস্তি, নির্দ্দেশ অসম্ভব। অতএব যাহা কিছু আছে বা নাই বলা যায়, উহা কতক ভাবের প্রকাশ ও কতক ভাবের অপ্রকাশ দৃষ্টিতেই বর্ণিত হয়। এই দৃষ্টিই এক মাত্র প্রকাশে, বিভেদরূপ সীমা হইয়া রহিয়াছে। যাবৎ প্রকাশ

অপ্রকাশ ভাব, তাবৎ বিভেদ অবস্থিতি করিবে; এ কারণ ব্যক্তি ভাবের ধারণা না হইলে, বিভেদরহিত অপরিবর্ত্তনীয় ভাব অপ্রকাশ থাকে। বিভেদের নিবৃত্তিই, সর্ব্ব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের নিবৃত্তি বা সাম্যাবস্থা। সাম্যেই ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এবং ইহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ বিভেদ অবস্থাই জগৎ। • দ্বন্দ্বই, দুঃখ উৎপন্ন করে এবং বিভেদই দ্বন্দ্বরক্ষার ভিত্তি। অতএব দুঃখই জগৎ রূপ এবং এই দুঃখ বা জগৎ হইতে পার হইবার জন্য, বিভেদ ভাবকেই অপসারিত করা প্রয়োজন। এ কারণ, জগদ্ব্যাপারেও, যেখানে যত ভেদ, সেখানেই তত দুঃখ এবং যেখানে ভেদ যত অস্তগত, সেইখানেই তত সুখ দৃষ্ট হয়। ব্যক্তিভাব, জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই দুই ভাবে প্রকাশ থাকিয়া, সর্ব্ব ভাবের উদয় অস্ত ঘটায়। উদয় অস্তকে; এবং অস্ত উদয়কে, অপেক্ষা করিয়াই বর্ত্তমান। একারণ এক-রসস্বরূপ নিত্য প্রকাশভাব, অন্তরে প্রকাশ না হইলে, উদয় অস্ত, বা জ্ঞান অজ্ঞান ভাব, তিরোহিত হয় না বলিয়াই, এক রস বা আস্বাদময় অপরিবর্ত্তনীয় ব্যক্তি চেতনা বা প্রকাশকে ধারণা করিয়া, সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ অপ্রকাশ বা জ্ঞানাজ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিবার প্রয়োজন। শুদ্ধ চেতনাময় ব্যক্তি প্রকাশই, এই জ্ঞানাজ্ঞানের এবং বস্তু ও রূপ, গুণ, শক্তি, জড়চেতনার, সাম্যাবস্থা। এ জন্যই ব্রহ্মে, উপনীত হইবার জন্য, ব্যক্তি চেতন বা প্রকাশের ধারণার প্রয়োজন। এই ধারণার অচলত্ব অবস্থাই, ব্রহ্ম বস্তু সংতৎ।

জ্ঞান বা প্রকাশেই সর্ব্বপ্রকার ধারণা; অজ্ঞান বা অপ্রকাশে ধারণার অভাবকেই বোধ করায়। অথচ এই বোধাবোধ বা

জ্ঞান, প্রকাশেই স্থিত। একারণ, প্রকাশ-অপ্রকাশাতীত বা জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত হইতে হইলেও প্রকাশ বা জ্ঞানকেই ভাবনা করিতে হয়। নচেৎ ধারণা অসম্ভব। এজন্য, যেখানে প্রকাশ বা জ্ঞান, স্পন্দনরহিত ভাবে প্রকাশ, তাহাই ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া উল্লেখ আছে।

• ইন্দ্রিয় সকল বাহ্য বিষয় সকলকে গ্রহণ করে। কিন্তু মনবুদ্ধি না থাকিলে, উহা ব্যক্তির পক্ষে, গ্রহণ করা হয় না। অতএব মনবুদ্ধি বা অন্তঃকরণই ধারণ করিবার আধার। এই আধার স্থির না থাকিলে, ইহাতে যে প্রকাশ অবস্থিতি করে, তাহাই প্রকাশ অপ্রকাশ রূপে প্রতীয়মান হইয়া, জ্ঞানাজ্ঞান বা ভাবের উদয় অস্ত ঘটায়। অতএব 'এই আধার অর্থাৎ অন্তঃকরণকেই স্থির রাখিতে পারিলে, তবেই প্রকাশ স্থিরভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ অন্তঃকরণ ভাব, এক ব্যক্তিভাবে প্রকাশ হইলে, তবেই ব্রহ্মব্যক্তিত্ব আস্বাদ লাভ হয়। এই জন্যই নিত্য প্রকাশ অনুভূতির জন্য, অন্তঃকরণের স্থিরতা আবশ্যক।

ইন্দ্রিয় বা জগৎই, অন্তঃকরণের প্রকাশের নিমিত্তক। এজন্য যাবৎ ইন্দ্রিয় বা জগদ্ভাব, তাবৎ অন্তঃকরণ স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দন নিবারণের জন্যই, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকলকে নিত্য ব্যক্তি ব্রহ্মেরই উপস্থিতি বলিয়া ধারণার আবশ্যক। নচেৎ স্পন্দনরহিত ভাবে, অন্তঃকরণের অবস্থান অসম্ভব। অন্তঃকরণের স্পন্দন অহরহ বর্ত্তমান। এইজন্যই ব্রহ্মবস্তুই জগৎ বলিয়া প্রতীতি হইতেছেন, একেই বহু; এই সত্যভাব ধারণায়, অন্তঃকরণের শান্ত অবস্থা ঘটে। শান্ত অবস্থায় যিনি থাকেন, তাহারই নাম ব্রহ্ম বা যৎতৎ।

ক্রিয়াই, ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ বা ইন্দ্রিয়রূপ। অর্থাৎ ক্রিয়া

ভাবই, আত্মার ইন্দ্রিয় অবস্থা বা স্থুলজগৎরূপ সুখ দুঃখ। যাবৎ ক্রিয়া, তাবৎ জগৎ। এই জগদ্ভাব মুছিবার জন্যই, ক্রিয়ারূপ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশকে নিষ্ক্রিয়রূপে রাখিয়া, জগতের বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টায়, ব্রহ্মেরই, একমাত্র উপস্থিতি চিন্তনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করিবার ব্যবস্থা। এই ইন্দ্রিয়ের সংযমে, মনের স্থিরতা, মনের স্থিরভাবস্থায়, বুদ্ধির প্রকাশ, বুদ্ধির প্রকাশে, আত্মার অনুভূতি জ্ঞান, আত্মানুভাবে, সত্য বা ব্রহ্মই প্রকাশ থাকেন।

সত্যকে বুঝিবার জন্যই, সত্যের সত্য ও মিথ্যা উভয় ভাব জানিলে; তবেই সত্যকে সত্য-মিথ্যার অতীত অথচ সত্য-মিথ্যা রূপে প্রকাশ, বলিয়া বুঝা যায়। একই বস্তু আছেন, ইহা একবার অনুভব না হইলে, সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা পদার্থ, রূপ গুণ, শক্তি রূপে, যে, একই বস্তু বা ব্যক্তি প্রকাশ রহিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না। এ কারণ, প্রথমতঃ,সর্ব্বপ্রকার ভিন্নতাকে ত্যাগ করিয়া, একে, উপস্থিত হইবার প্রয়োজনে, সর্ব্বপ্রকার প্রকাশকে আপনাতে বা ব্রহ্মে লয় করা আবশ্যক; এবং পরে, এই এক হইতে, বহু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, প্রকাশ হইলে, তবে একেরই যে বহু রূপ, গুণ, শক্তি, তাহা প্রত্যক্ষ হয়। এইজন্য শাস্ত্রে একবার সমস্তকে মিথ্যা, আবার সমস্তকে সত্য, একবার সকলের কর্ত্তৃত্বের লোপ, আবার ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তৃত্ব ভাব, প্রকাশ আছে। ইহার যথার্থ ভাব, বস্তু ও ব্যক্তি একমাত্র পরমাত্মাই আছেন। তিনিই জগৎরূপে, অনন্ত ব্যক্তি, পদার্থ, রূপ, গুণ, শক্তি, ক্রিয়া রূপে বর্ত্তমান। ভিন্নতার দিক্ হইতে প্রকাশ হইলে, ভিন্নতারই বৃদ্ধি হয়, এজন্য ভিন্নতার দিকে লক্ষ্যত্যাগের প্রয়োজন বা ঔদাসীন্য ভাব রক্ষার নিমিত্ত, ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে, বলিবার

আবশ্যক, এবং এক দিক হইতে, প্রকাশের দিকে গতি হইলে, সর্ব্ব ভিন্নতাই একেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে বলিয়া, বস্তু বা ব্রহ্ম ভাবের দিক হইতে প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য, ব্রহ্মই সর্ব্ব, দ্বিতীয়বর্জ্জিত বলিবার উদ্দেশ্য। এই ভাবে, বহু হইতে এক, ও এক হইতে বহু অনুভবে আসিলে, তবেই ব্রহ্মের যৎতদ্‌ভাবের আস্বাদ লাভ ঘটে। এই আস্বাদই ব্রহ্মানন্দ বা পরমানন্দ, স্বর্গ বা মুক্তি। ইহাই, এ জগতের চরম উপাদেয় লভ্য। মনুষ্যজীব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব, একারণ যে মনুষ্য এই লভ্যকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহার পক্ষে, মনুষ্যজীবনের ব্রহ্ম প্রাপ্তি রূপ উৎকৃষ্ট প্রাপ্তির অভাব থাকিয়া যায়। এইজন্যই ইহাতে, মনুষ্যজীবনের চরিতার্থতা হয় বলিয়া জ্ঞানিগণের উল্লেখ। পরমাত্মাই এক মাত্র আছেন। তাঁহাকে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বলিলেও তাঁহার নীচত্ব ঘটে না। এবং বৃহৎ বা বৃহৎ বলিলেও, তাঁহার কিছু মাত্র মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায় না। এই জন্য তাঁহার কোন ভাব বা অবস্থার প্রতি লক্ষ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ হইতে ভিন্ন ক্ষুদ্র বলিয়া অথবা জড় বলিয়া ধারণা বা ব্যবহার করিলে, তাঁহার রুষ্ট হইবার সম্ভাবনা, না থাকিলেও, ধারণা কারীর পক্ষে নিজ ধারণার অনুরূপ বা ব্যবহার লাভ হয়। এই জন্য পরমাত্মা যে, প্রকাশ ও পদার্থরূপে, অনুভবে আসিতেছেন, ইহাতে যিনি যেরূপ ভাবনা রাখেন, তিনি সেইরূপই ফল বা ব্যবহার লাভ করেন। অর্থাৎ যাঁহারা ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করেন, তাহাদের নিকট ক্ষুদ্র দেবতা এবং যাঁহারা একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম ভাবে দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট পূর্ণরূপেই প্রকাশ হইয়া, অভেদে সাধককে যৎতৎ ভাবে স্থিত করেন। ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র হতের ভেদ, সাধকের অন্তঃকরণের কল্পিতভাবমাত্র নচেৎ অদ্বিতীয় পূর্ণে, ভিন্নতা বা ক্ষুদ্রতা নাই।

সত্য এক। ইনি জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সত্য। ইনি কখন কোন কালে বা অবস্থায় মিথ্যা বা নাস্তি হন না। এই সত্যকে সত্য বলিলেও সত্য, মিথ্যা বলিলেও সত্য, সত্য মিথ্যার অতীত বলিলে বা না বলিলেও সত্য। এই সত্যই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। ইঁহার কোন কালে, ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। ইনি আনন্দময় সৎ চিৎ অর্থাৎ জাগ্রত বা জীবন্ত স্বরূপ। ইনি প্রত্যেক জীবমাত্রেরই, মাতা পিতা গুরু আত্মা, পরমাত্মা হন। জগৎ বলিয়া যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, তাহা এই ব্যক্তি। জগৎ ইঁহাতে আছে, কিন্তু জগতে ইনি থাকেন না। অর্থাৎ ইঁহাকে জানিলে, ইঁহার লীলারূপ জগৎকে পরমাত্মারই রূপ বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু জগৎরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ, গুণ, শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে, পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য হয় না সর্ব্বপ্রকার প্রকাশই ইঁহার, কিন্তু কোন এক প্রকাশ, ইঁহাকে অধিকার অর্থাৎ সীমাযুক্ত করিতে পারে না। ইনি সকলই, কিন্তু কেহ ইনি নহেন, অর্থাৎ ইঁহাকে দেখিলে বা বুঝিতে পারিলে, সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপেও, ইহারই উপস্থিতি বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপস্থিতিতে, কোন এক ভিন্নের জ্ঞানলাভে, পরমাত্মা, অদৃশ্য থাকেন। এই সত্য পরব্রহ্মই একমাত্র আছেন, আর কিছুই নাই। যাহা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নানা-রূপ গুণ শক্তি, নাম পদার্থাদি বোধ হইতেছে, উহা তাঁহারই মায়ায় প্রকাশ অর্থাৎ যে ভাবে, তিনি প্রকাশ থাকিলে, তাঁহাকে তিনি বলিয়া চেনা না যায়, সেই ভাবে প্রকাশ আছেন বলিয়া বলা হয়। এই মায়া, শব্দ ও ভাবের দ্বারা ইহাই বলা হইল, যে, যিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন, যাহা স্বভাবতঃ দেখা শুনা যায়, তাহার অতিরিক্ত ভাবসমন্বিত পরমাত্মা রচিয়াছেন, বলিয়াই তিনি

দেখিবেন। নচেৎ যাহা সকলেই বোধ করিতেছেন, উহা মায়াময় জগৎ। তাহাতে ব্রহ্মভাব সম্পূর্ণ অপ্রকাশ। ব্যক্তি ও বস্তুভাবই স্বাভাবিক জগদ্ভাবের অতিরিক্ত ভাব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি অর্থাৎ চেতনার ব্যক্তভাব ও বস্তু অর্থাৎ জীবন্ত সত্তা, মনুষ্যের অনুভূতিতে না আইসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, সে ব্যক্তির নিকট, জগৎ অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল জড় পদার্থ ও তাহারই রূপ, গুণ, শক্তি, বলিয়াই বোধ হইবে। ব্রহ্মপ্রকাশে সর্ব্বভাবেরই অবসান হইয়া, যৎতদ্ভাবে অবস্থিতি হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে, জগৎকে মিথ্যা ও ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া বর্ণনা করা আছে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ভিন্নতার পরিহার ও একেই পর্য্যবসান করিবার উপদেশ। ভিন্নতাই, দুঃখ উৎপন্ন করে, পক্ষান্তরে অভিন্নতাই সুখ-শান্তি। এই সুখ-শান্তির জন্য, যেমন জ্ঞানে, জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সংহরণ আবশ্যক, সেই প্রকার ব্যবহারকার্য্যেও, কাল্পনিক ভিন্নতা ব্যবহার পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। নচেৎ জ্ঞান বা শান্তি অপ্রকাশ থাকে। যেরূপ, স্থূলে যাহার যে ইন্দ্রিয় কার্য্য করে না, উহা সূক্ষ্মে আছে বলা আর না বলা, উভয়ই সমান, সেইরূপ কার্য্যে কাল্পনিক ভিন্নতা, পরিত্যক্ত না হইলে, জ্ঞানে কল্পনার নিষেধ হইয়াছে, মনে করাও ব্যর্থ। অতএব স্বভাবের ভেদভাব মন বুদ্ধি-জ্ঞান হইতে উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে, কাল্পনিক, ভেদভাব, উঠাইবার চেষ্টা আবশ্যক; নচেৎ স্বভাবের ভেদ, মন হইতে বহিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব। কারণ জীবের কল্পনা, যাহার উপর, জীবেরই আধিপত্য রহিয়াছে, উহা যদি, জীব ত্যাগ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্মের কল্পিত যে জগৎরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব, তাহা জীব আপন মন হইতে কি প্রকারে ত্যাগ করিবে? জীবের যে ভিন্ন

অহঙ্কার, উহাও জাগতিক কল্পিত অবস্থার অন্তর্গত। এই আপন ভিন্নতার কল্পনা উঠিবার পূর্ব্বেই; কল্পিতের কল্পনা ত্যাগ আবশ্যক; নতুবা সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কারণ, সত্য অকল্পিত সংশয়রহিত যাহা, তাহাই।

নির্দ্দেশরহিত, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, পরব্রহ্ম, আপন মায়াশক্তির প্রভাবে, অনন্ত-নামরূপাত্মক জগৎরূপে প্রকাশ। পরভাব, না থাকিলে, আপন বলিয়া কোন ভাবই থাকে না। এই আপন ভাব রক্ষার জন্য, ব্রহ্মে, যে শক্তি, আপন ও পর, দুই ভাব প্রকাশ থাকে, তাহারই নাম মায়া। মায়া, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছুই নহেন, ব্রহ্মেরই রূপ বা আত্মপরভাবরক্ষয়িনী প্রকাশ বা শক্তি। এই মায়াশক্তিই, বহু ও এক ভাব রক্ষা করিয়া, জগৎ ও ব্রহ্মভাবের জ্ঞাপন কারিণী। এই মহাশক্তি প্রকাশে, সূর্য্যনারায়ণরূপা ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রী। ইঁহার আশ্রয়লাভ করিলে, সর্ব্বপ্রকার ভেদজ্ঞানরূপ,অজ্ঞানতা দূর হয়। এই জন্যই, এই প্রকাশে, চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের ধ্যানধারণা বিধি। এ বিধি, সকলের পক্ষেই সমান। যেমন, ব্রহ্মচৈতন্য, ব্যক্তিমাত্রেরই ধ্যান ধারণা বা উপাসনার জন্য প্রয়োজন, সেইরূপ, তাঁহারই মূলপ্রকৃতি ভাব বা চৈতন্য প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বা প্রকাশকে বর্জ্জন আবশ্যক। এইরূপে, একবার সর্ব্ব প্রকাশকে, বর্জ্জন করিয়া এক অখণ্ড প্রকাশে, উপস্থিত হইতে পারিলে, তবেই একেরই সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া, অনুভূতি ঘটে। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত জগৎ বলিয়া, আর কিছুই থাকে না। সমস্তই ব্রহ্মময় ভাবিতে থাকেন। এই অবস্থা লাভের জন্যই, মুমুক্ষুর ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজন এবং ইহা একমাত্র ব্রহ্মকৃপা-সাপেক্ষ। ইহা ভিন্ন, অন্য কোন উপায়ই,

উপায় নামের যোগ্য নহে। বিচার পূর্ব্বক, সত্যে নিষ্ঠা রাখা প্রয়োজন। বিনা বিচারে, কাহার কথা, গ্রহণ করা উচিত নহে। যেমন একজন জটাজুটযুক্ত বা কৌপিনধারি, কোন বিষয় বলিতেছে বলিয়াই উহা গ্রাহ্যনীয় বা পরিতাপের কারণ নহে, সেইরূপ একজন ঐশ্বর্য্যশালী বিদ্বান বা রাজাধিরাজ হইলেও তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের পারদর্শী ইহা মনে করাও অনুচিত। সৎ ব্যবহার বা ক্রিয়ার সহিত, জীবের যথার্থ হিত লাভের উপযুক্ত করিয়াই, বিচার প্রয়োজন ও সর্ব্বপ্রকার ভাব, বিচার করিবার পূর্ব্বে, নিজেকে বিচারপতির উপযুক্ত করা আবশ্যক। নচেৎ বিচার করিতে গিয়া, অবিচার করাই হয়। উপনিষদের একটী আখ্যায়িকায়, যাহাতে ইঙ্গিতে, ভক্ত সাধকগণের, সাধন ও ভক্তি, উভয়ই রক্ষিত হইয়া, ব্রহ্মলাভে সামর্থ্য জন্মে, এইরূপ উপদেশ দেওয়া আছে। ইহার সত্য ভাব অবগত হইলে, মনুষ্যের মঙ্গল হইবে, এই আশায় সে বিষয়টী এখানে সন্নিবেশিত হইল।

কোন সময়ে দেবতা এবং অসুরদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইয়া, উভয় দলের মধ্যে, যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে অসুরদল পরাজিত হইলে, দেবগণের মনে অহঙ্কার জন্মে এবং অহঙ্কার প্রযুক্ত তাঁহারা আপনাদিগকে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে, পৃথক্ শক্তিমান্ পুরুষ বলিয়া মনে করিলেন। এইরূপ ধারণাবশতঃ দেবগণের অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া, আসুরিক প্রবৃত্তি উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া পরমাত্মা দয়াবশতঃ অহঙ্কার নিবারণার্থে, ইহাদিগের নিকট প্রকাশরূপে আবির্ভূত হইলেন। এইরূপ প্রকাশ, দেবতারা পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই বলিয়া, তাঁহারা মনে করিলেন, আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ ব্যক্তি কে, উপস্থিত

হইলেন। ইহার তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য অর্থাৎ এই ব্যক্তিকে, জানিবার জন্য দেবতাদিগের ইচ্ছা হওয়ায়, তাঁহারা, প্রথমে অগ্নিদেবকে, এই ব্যক্তির সম্বন্ধে বুঝিবার জন্য পাঠাইলেন। অগ্নি, শ্রেষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, তিনি অগ্নিকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে? অগ্নি উত্তর দিলেন যে, আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। মহান্ কহিলেন হে অগ্নি, তোমার এমন কি গুণ আছে, যে জন্য তুমি জগতে খ্যাতনামা? অগ্নি উত্তর করিলেন, আমি ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারি। শ্রেষ্ঠ বলিলেন, দেখ, এই আমি একটী তৃণ তোমার নিকট রাখিলাম, তুমি ইহাকে ভস্ম কর। অগ্নি বহু চেষ্টায়, তৃণকে ভস্ম করিতে না পারিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, যাঁহার তত্ত্ব লইতে গিয়াছিলাম, তাঁহার কোন তত্ত্বই পাইলাম না। তখন বায়ুদেব, অন্য দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে জানিবার জন্য, গমন করিলেন। বায়ুদেব শ্রেষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র শ্রেষ্ঠ, পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বায়ুদেব নিজেকে গ্রহণকর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিলে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে একটী তৃণ গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বায়ুদেব বহু চেষ্টায় গ্রহণ করিতে না পারিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠকে চিনিতে পারিলেন না। তখন অন্যান্য দেবতাদিগের প্রার্থনায় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির সত্য অনুসন্ধানের জন্য, দেবরাজ স্বয়ং গমন করিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, ঐ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন। দেবরাজ ফিরিয়া না আসিয়া তথায় রহিলেন এবং কিছু পরে, তাঁহার পরিচিত মহাশক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইলেন যে, যাঁহাকে দেবতারা জানিতে পারেন নাই,

তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। দেবরাজ এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অগ্নি ও বায়ুর নিকট প্রকাশ করেন, এই জন্য ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু অন্যান্য দেবতাগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এই আখ্যায়িকার প্রথম অর্থ, দেবতা বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন সত্তা বা শক্তি নাই। ব্রহ্মই সর্ব্ব দেবতাদিগের শক্তি ও রূপ। এখানে এই একটী বুঝিবার প্রয়োজন যে, শক্তি ও রূপ ভিন্ন পৃথক্ অহঙ্কারের প্রকাশ সম্ভব কি না। এবং যে দেবতা বা যে প্রকাশ, যে গুণবিশিষ্ট বলিয়া জীবের নিকট প্রত্যক্ষ, ঐ রূপ-গুণ শক্তির অভাবে, কোন পদার্থ বা ভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কি করিয়া বোধ হইবে। যদি পদার্থের ধারণা ত্যাগ করিয়া, ব্যক্তির ধারণা করা যায়, তাহা হইলে, এই পর্য্যন্ত ধারণা হইতে পারে যে, একটী ব্যষ্টি অভিমানভাব, যাহাতে ভস্ম করিবার অভিমান প্রকাশ থাকে, অন্য অহঙ্কার নাই, তাহারই নাম অগ্নিদেব। সেই অগ্নিদেবের ভস্ম করিবার শক্তি নাই, তাঁহাতে, যে শক্তি দেখা যায়, তাহা ব্রহ্মের। ' এখানে ইহা বিচার করা প্রয়োজন যে, অগ্নির সত্তা ও অহঙ্কার কি অগ্নির নিজস্ব? যদি তাহা নিজস্ব না হয়, পরব্রহ্মের হয়, তাহা হইলে অগ্নি প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও রূপ গুণ শক্তি, তাহা অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের কেমন করিয়া হইবে? বাস্তবিক পক্ষে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য, এ আখ্যায়িকা নহে। ইহার যথার্থ ভাব এই যে, যদি কেহ অগ্নি ও অগ্নির শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ধারণা করেন, সে ধারণা সত্য নহে। সর্ব্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সত্তা ও শক্তি পরব্রহ্মেরই। পরব্রহ্মই একমাত্র আছেন। তাঁহারই অনন্ত শক্তি, বা তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, এই জন্যই তাঁহাতে কি

ভিন্ন ভিন্ন ভাব কি অভিন্নভাব, কি রূপ, গুণ, শক্তি, নাম, আর কি রূপ গুণ শক্তির অভাব ভাব, যাহা বলা যায়, এবং তাহা, আর যাহা বলা যায় না, তাহা, বলিলে বা নির্দ্দেশ করিলেও যিনি বাক্যের নির্দ্দেশের মধ্যে আসেন না, এবং সর্ব্ব বাক্য ও নির্দ্দেশ্য, যাঁহার অতিরিক্ত পদার্থে, গুণে বা রূপে সংস্থাপিত হয় না, তিনিই ব্রহ্ম, এই ভাব বুঝাইবার জন্যই, এইরূপ আখ্যায়িকা—যাহাতে, ভক্ত সাধক, কোন প্রকারে অহঙ্কার না রাখেন এবং কোন প্রকারে সীমা দ্বারা, ব্রহ্মকে গণ্ডীবদ্ধ না করেন। ব্রহ্মকে গণ্ডীতে আবদ্ধ করিলেই, সেই জীব, আপনাকেই বন্ধনযুক্ত করিবেন। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার, বন্ধন মুক্ত হওয়া যায়, সেই জন্যই এই আখ্যায়িকা।

দ্বিতীয়ত, অগ্নি প্রথম গমন করেন, তাহার পর বায়ু এবং সর্ব্ব শেষে ইন্দ্র, গমন করিলেন। ইহার ভাবার্থ, ইন্দ্রিয় ও জাগতিক পদার্থ মাত্রেই অগ্নিরূপ, তাপই এক ভাব হইতে অন্য ভাবে প্রকাশ হন, একারণ কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে, তাপেরই প্রয়োজন, প্রথম আবশ্যক। তাহার পর গতি না থাকিলে, গ্রহণকার্য্য হয় না, এই জন্য, কোন প্রকার, ধারণা বা এক ভাব হইতে অপর ভাবে প্রকাশ হইতে হইলে, গতির প্রয়োজন। তাহার পর চেতনা ভাবের প্রকাশ না থাকিলে, কোন অহঙ্কারই থাকে না, এইজন্য চেতনা অহঙ্কাররূপ ইন্দ্রিয়ের রাজার আবশ্যক; এবং ইন্দ্রিয়ের রাজা যেমন বুদ্ধি, সেও আপনা হইতে ধারনা আনিতে পারে না। ব্রহ্ম হইতে চিৎশক্তি, প্রকাশ হইয়া, ভাবরূপে উপদেশ দিলে বা জ্ঞাত করিলে, তবে, সত্যের অনুসন্ধান লাভ হয়। এই ভাব বুঝাইবার জন্য, অগ্নি ও বায়ুর প্রত্যাগমন ও ইন্দ্রের অবস্থান করা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অগ্নিরূপ ইন্দ্রিয় এবং

প্রাণরূপ গতি বা আকাঙ্ক্ষা, ইহাদের অনবরত প্রকাশ অপ্রকাশ হয়। ইহার স্থিরতা মনেই ঘটে। ইন্দ্রিয় বা ভোগ ভাব এবং আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইলে পর বুদ্ধির প্রকাশ, কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বুদ্ধি; আপনার স্থিরতা ঘটান ব্যতীত, অপর কোন ভাবে প্রকাশ হইতে পারে না; পরমাত্মা দয়া করিয়া; ঐ স্থির বুদ্ধিতে, কোন ভাবের উদয় করিলে, তবেই বুদ্ধি বুঝিয়াছি এই ভাব লাভ করে। নচেৎ ব্রহ্মপ্রসাদ ব্যতীত কোন জ্ঞানই নিঃসন্দেহ হয় না। এই ভাব বুঝিয়া, যাহাতে ভক্ত সাধক, জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা পরমাত্মার কৃপার উপর নির্ভর রাখিয়া, তাঁহার সাধনজ্ঞানাদি, তাঁহারই প্রদত্ত শক্তি, ইহা বুঝিয়া তাঁহারই শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছেন, এই ভাবে তাঁহার শক্তি বা ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া, যাহাতে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই জন্য, এই আধ্যাত্মিকা, ইহা বুঝিলে, ভক্তগণের ও জগতের মঙ্গল ও হিত মনে করি। সাধনা বা ভগবন্নিষ্ঠা ব্যতীত, বেদ উপনিষদ বা ধর্ম্ম শাস্ত্রের যথার্থ ভাব বুঝা যায় না। কারণ,যাহা জাগতিক ভাবে সত্য, তাহা ব্রহ্মভাবে মিথ্যা; এবং যাহা ব্রহ্ম ভাবে সত্য, তাহা জাগতিক ব্যাপারের বিপরীত। এমত অবস্থায়, ব্রহ্মপ্রসাদকে উপেক্ষা করিয়া, যিনি ধর্ম্মশাস্ত্র বা ব্রহ্মবিষয় অবগত হইতে চেষ্টা পান, তাহার পক্ষে নিরাশ হওয়া ও ভ্রমে পড়িবার আশঙ্কাই পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে। এই জন্য, যাহাতে, দয়াময় পরমাত্মা দয়া করিয়া, সর্ব্ব মনুষ্যের অন্তরে, সৎপ্রবৃত্তি ও, নিরহঙ্কার ভাব দিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা সত্য, তাহা বুঝাইয়া, জগৎকে কল্যাণময় করেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারই নিকট শান্তিঃ প্রার্থনা করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।